কৈশোর ও তার সমস্যা

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

কৈশোর ও তার সমস্যা

মনস্তত্ত্ব ও মনোরোগ

COMPLIMENTARY

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সৌজন্য সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

KAISOR O TAR SAMASYA

[Adolescents and its Problem]

Dr. Dhirendra Nath Gongopadhaya

© West Bengal State Book Board
© পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

প্রকাশকাল—সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক ঃ
রূপলেখা.
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ দুর্গা রায়

Acc no- 15575

মূল্য ঃ ষোল টাকা

Published by Professor Ladli Mohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

উৎসর্গ

রাজদ্বার ও শ্মশানে'র আকৈশোর বন্ধু
বিজ্ঞ ও প্রখ্যাত চিকিৎসক
ডাক্তার সন্তোষকুমার দাসকে
সমর্পিত

ভূমিকা

কৈশোর ও তার সমস্যা নিয়ে সব দেশেই নানা দিক থেকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও শিক্ষক (যাঁরা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আগ্রহী) সকলেই নিজেদের দৃষ্টিভংগী দিয়ে কৈশোরের স্বাভাবিক বিকাশ, অস্বাভাবিক দিক ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মনোরোগবিদ্যায় আগ্রহীরা কিশোরদের মানসিক অসুস্থতা নিয়ে সাম্প্রতিক কালে চর্চা, চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। এ-ছাড়া কিশোর-অপরাধ নিয়ে অপরাধ বিশেষজ্ঞরাও অতিমাত্রায় সচেতন। বোধ হয় সেটা ১৯০৪, ষ্ট্যানলী হলই প্রথম বললেন বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর মানবপ্রজাতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে (neo-atavism) বিকাশ ও পরিণতি ধীরে সুস্থে ঘটে না। আকস্মিক বন্যার মত কৈশোর তরঙ্গ এসে জীবনকে তোলপাড় করে। বয়ঃসন্ধির কাব্যিক বর্ণনাতেও প্রায় এই রকম কথাই আছে। অনেক আদিম সমাজে, কৈশোরের মধ্য পর্ব শেষ হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে বড়দের সমাজে গ্রহণ করা হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে কৈশোর সমস্যা আধুনিক সমাজের সমস্যা। শৈশবের উষ্ণ নির্ভরতা নেই, আবার আদিম কালের কিশোরের মত স্বনির্ভরও নয় আজকাল অধিকাংশ দেশের কিশোর। কৈশোরের দৈহিক পরিবর্তন, বয়ঃসন্ধির যৌন পরিণতি, ইত্যাদির দরুণ কিছু কিছু সমস্যা আদিম সমাজেও হয়তো ছিল, কিন্তু শৈশব থেকে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তির—যখন সামাজিক দায়দায়িত্ব ও নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব চলে আট, নয় বছরের সমস্যা তাঁদের মধ্যে ছিল না। এই সমস্যা প্রধানত সামাজিক ঃ—প্রতিফলিত হয় পরিবারে, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে। আবার এই সমস্যা সৃষ্টি এবং সমাধানের দায়িত্বও ঐ সব প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের, যাঁরা কিশোরকে সমাজের ভবিষ্যৎ দায় দায়িত্ব নেবার শিক্ষা দান করেন ও তাদের সামাজিকীকরণের বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উল্লেখ করা উচিত, বয়ঃসন্ধি হঠাৎ আসে না,

শৈশব থেকেই প্রস্তুতি চলে। এই প্রস্তুতি কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক নয়। এই প্রস্তুতির ধারায় জোয়ার ভাঁটা আছে।

কৈশোর সমস্যা এবং তার সমাধান-পরিকল্পনা বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানী-দের কৌতূহল ও আকর্ষণের বিষয়; কাজেই সমস্যার গুরুত্ব নির্ধারণ ও সমাধান পদ্ধতিও বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

কৈশোর সমস্যাকে প্রধানত দুভাবে ভাগ করা চলে: (১) কিশোরদের ব্যক্তিগত সমস্যা বা সমষ্টিগত সমস্যা—একটি নির্দিষ্ট ও বিশেষ অন্য কিশোরের সেই সমস্যা না থাকতে পারে, অন্যটি অনেক কিশোরের এক ধরনের সমস্যার সামান্যীকৃত রূপ;—এই সব সমস্যা আবার দেশকাল ও সংস্কৃতি ভেদে আলাদা। (২) কিশোরকিশোরী কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা—যা নিয়ে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কিশোরদের নিজস্ব সংগঠন ব্যতিব্যস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত। কৈশোরের সমস্যা কেবলমাত্র জৈব-সমস্যা নয়, পাড়া-প্রতিবেশীর সমস্যা নয়, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা অভিভাবকদের সমস্যা নয়। আবার শুধু মনোরোগ-চিকিৎসক বা মনস্তাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিকদের সমস্যাকে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা চলে না। কৈশোর সমস্যা বহুমুখী। সব কিছু নিয়ে কোনো বই লিখতে হলে অনেক বছরের পরিশ্রম ও অধ্যয়ন দরকার। তাছাড়া, আজকে যে-সমস্যাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি, কিছুকালের মধ্যে হয়তো তার আর গুরুত্ব থাকবে না; সমস্যার রূপ বদলে যাবে। কাজেই কোন সমস্যাগুলোর প্রাধান্য দেওয়া উচিত,—এ বিষয়ে সব লেখক কোনোদিন একমত হবেন বলে মনে হয় না।

যৌন-সমস্যাকে অতি-গুরুত্ব দেওয়া যেমন আমাদের মতে ঠিক নয়, তেমনি আবার এ-একটা সমস্যাই নয়—এরকম মনে করাও অসমীচিন। যৌনশিক্ষা দেওয়া নিয়ে এখন খুবই আলোচনা চলছে। কিভাবে দেওয়া হবে—এ নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। জীববিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকে এই শিক্ষা স্বাভাবিক ও সহজভাবে, অন্যশিক্ষার সংগে দেওয়া হবে; না যৌনশিক্ষাকে একটি পৃথক শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে? এ-নিয়ে শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাদের বিশেষ আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা বোধ হয় যুক্তিসংগত। অপরাধ সমস্যাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা কিশোর অপরাধীদের ঠিকমত সংশোধন, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না

করলে, এরাই পরিণত বয়সে বয়স্ক অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। অপরাধের কারণ যদি সমাজেই নিহিত থাকে, তাহলে সমাজের দুর্নীতির কারণ সম্পর্কে কিশোরদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্নীতি বা অপরাধ যে মানুষের স্বভাব প্রবণতা নয়, এই শিক্ষা কিশোরদের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি। মাদকাসক্তি এক গুরুতর সমস্যা, অপরাধীর সংশোধন, মাদকাসক্তের চিকিৎসার—নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে; কিন্তু আমাদের মনে হয় তার থেকে অনেক বেশি দরকারী এই সম্পর্কে সুচিন্তিত, প্রয়োগসাধ্য প্রতিষেধক-ব্যবস্থা অবলম্বন। এ দিকে বে-সরকারী ব্যবস্থা যথোপযুক্ত ও যথেষ্ট নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

যুবকদের নিয়ে আমরা যতটা চিন্তাভাবনা করি, কিশোরদের নিয়ে ততটা করি না। যুবকরা বৃহত্তর সমাজের অন্তর্গত, তাদের বক্তব্য, আন্দোলন, বিদ্রোহকে বয়স্ক সমাজ ও প্রতিষ্ঠান যতটা সমীহ করেন, তাদের দাবী দাওয়া পূরণ ও সমস্যা সমাধান নিয়ে যতটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন;—তাদের দাবী দাওয়া পূরণ ও সমস্যা সমাধান নিয়ে যতটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন, কিশোরদের ব্যাপার নিয়ে ততটা করেন না। কারণ, সোচ্চার হবার সুযোগ থাকলেও, তাদের ক্ষমতা যুবকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য কোনো কোনো সময় কৈশোর সমস্যাও যে-বয়স্ক সমাজ ও প্রতিষ্ঠানকে বিচলিত করতে পারে, এ কথা আমরা জানি। শিল্পোন্নত দেশে কিশোর অপরাধকে ও কিশোর সমস্যাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আজকাল। আমাদের এ বিষয়ে আরো মনোযোগী হওয়া উচিত; কেননা কিশোর সমস্যা, বিশেষ করে কিশোর অপরাধ নিয়ে আমরা আরও মনোযোগী না হলে, অদূর ভবিষ্যতে সমস্যা উৎকট আকার ধারণ করতে পারে।

আমরা সামান্য কয়েকটি মাত্র সমস্যা এই পুস্তকে তুলে ধরেছি। প্রাক কৈশোরের বিকাশ ও বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়েছি; এবং তরুণ কর্মীদের জন্য ঐ অধ্যায়ে শিশু ও কিশোর মনস্তত্ত্বের কয়েকজন খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তির মতামত এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর অভিমত পরিবেশন করেছি। মনোবিদ্যার, সকলেই জানেন, প্রকৃতি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, এখনও পুরোপুরি না হোক, কিছু মাত্রায় দর্শনশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই অনেক ব্যাপারেই মনোবিদ্যার পণ্ডিতদের মতভেদ বর্তমান। তরুণ বিজ্ঞানীরা যাতে প্রায় সকলের সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা করতে পারেন

এবং নিজে পড়াশুনো করে নিজের মত গড়ে তুলতে পারেন—এই আমাদের অভিলাষ।

কিশোর মনোরোগী সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্যান্য দিকের চেয়ে বেশি; কিন্তু কিশোরদের মানসিক রোগকে একটা বড়দরের সামাজিক সমস্যা মনে করিনা বলে, ঐ-বিষয়ে আমি গুরুত্ব দিই নি: প্রসঙ্গক্রমে মাত্র দু চারটি রোগীর ইতিহাস উল্লেখ করেছি।

অনেকে এই বই লেখার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত ডঃ পৃথা সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অমিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। ডাঃ শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যও অকিঞ্চিৎকর নয়।

৬।৮।৮২

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ঃ

কৈশোরের সংজ্ঞার্থ ও বয়ঃসন্ধির কাল নির্ণয় ... ১

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

বংশগতির প্রভাব ঃ জীনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ... ৮

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

পরিবেশের প্রভাব ... ৪২

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

সামাজিকীকরণ ও চরিত্র গঠনের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ... ৭১

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

প্রাক কৈশোর ... ৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

ক্রমবৃদ্ধি : স্তর ও অনুক্রম ... ১৩৯

সপ্তম অধ্যায় ঃ

সাধারণ ও স্বভাবী ... ১৫৪

অষ্টম অধ্যায়

অস্বভাবী সমস্যা ... ১৮৮

পরিশিষ্ট ... ২৪১

প্রথম অধ্যায়

কৈশোরের সংজ্ঞার্থ ও বয়ঃসন্ধির কাল নির্ণয়

শৈশব থেকে যৌবন প্রাপ্তির কালকে কৈশোর বলা হয়। প্রধানতঃ দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক বৃদ্ধি এবং আনুষংগিক মানসিক ও আচরণভিত্তিক পরিবর্তন কৈশোর বিকাশের বিশেষত্ব। দেশ, কাল, পরিবেশ, জনগত (ethnic), সংস্কৃতিজাত বৈশিষ্ট্য এবং জীনভিত্তিক সংকেতলিপি এই পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশকে প্রভাবিত করে। দেহমনের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও পরিবর্তন, কৈশোরের পারিবারিক আবহাওয়া, পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার সংগেও বিশেষভাবে সম্পর্কিত। ব্যক্তিগত, জনগত, সংস্কৃতিগত, দেশগত ও আরো নানাবিধ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কৈশোরের উন্মেষ, গতিপ্রকৃতি ও যৌবন প্রাপ্তির একটা সাধারণ নকশা বা প্যাটার্ন আছে। সব দেশের কিশোর কিশোরীর একই ধরনের কতকগুলো চাহিদা ও সমস্যা আছে।

কৈশোরের বয়ঃসীমার কোনো সঠিক নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। একই আবহাওয়া ও একই ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লালিত কিশোরদের বৃদ্ধি ও পরিণতি কালক্রমানুগামী হয় খুব কম ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে এগারো থেকে পনেরো বছরের ছেলেদের কিশোর বলা হতো। ষোলো বছরে পড়লে পুত্রকে মিত্রবৎ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন চাণক্য অনেককাল আগে। সেকালে ষোলো বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন ও শিক্ষা-লাভের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে গার্হস্থ্যাশ্রম প্রবেশ মানেই বয়ঃপ্রাপ্তি হওয়া। আজকাল শিল্পোন্নত দেশে তো বটেই, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশেও 20/21 বছর বয়স না হলে বয়ঃপ্রাপ্ত (Adult) বলা

হয় না। জৈবিক দিক থেকে ঐ বয়সের আগেই পরিণতি ঘটলেও, কোনো বৃত্তিশিক্ষা করে সংসার বা সমাজের কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নেওয়ার মত ক্ষমতালাভ করতে 21/22 বছরের বেশি সময়ই লাগে। প্রযুক্তি বিদ্যার সম্প্রসারণ ও জটিলতা বৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতালাভের বয়ঃসীমা বেড়েছে। যৌবন প্রাপ্তি বলতে যদি আমরা পুরুষের সুস্থ সন্তান উৎপাদন ও নারীর গর্ভধারণের ক্ষমতাপ্রাপ্তি বুঝি তাহ'লে অবশ্য পুরুষের পক্ষে 16/17 ও নারীর পক্ষে 13/14 বছর পর্যন্ত কৈশোর বলা চলে। আর যদি সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্বভার গ্রহণ করা বয়ঃপ্রাপ্তমাত্রেরই কর্তব্য বলে মনে করি, তাহলে কৈশোরের বয়ঃসীমা আরও বাড়াতে হয়। আমাদের দেশে আইনগত দিক থেকে পুরুষ 18 বছরেই সাবালক কিন্তু নির্বাচনে ভোটাধিকার ঐ বয়সে কেউ পায়না। এই পুস্তকে কৈশোরকাল 11 থেকে 19 বছর পর্যন্ত ধার্য করে আমরা কৈশোর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো। এই ন' বছরকে আদি, মধ্য, অন্ত,—এই তিন পর্বে ভাগ করে নিলে অনেকক্ষেত্রে বিচারবিশ্লেষণের সুবিধা হবে।

কৈশোর বৈশিষ্ট্যের জন্য আপাতদৃষ্টিতে দায়ী করা হয় যৌনগ্রন্থি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির, বিশেষ করে. পিটুইটারী (Pituitary) ও এ্যাড্রেনাল (Adrenal) গ্রন্থির পরিবর্তনকে। এর ফলে সহজেই চোখে পড়ে এমন সব দৈহিক পরিবর্তন ও মানসিক পরিবর্তন যা ঘটতে থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে কৈশোরের আদি পর্বে মাসিক রজঃস্রাব শুরু হয়, বুকের দুপাশে স্তনযুগল রেখায়িত ও পীনোন্নত হতে থাকে ও চেহারা শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে ; ছেলেদের কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন ঘটে, পেশীগুলো বাড়তে থাকে ও দৃঢ়বদ্ধ হয়, শুক্র বা বীর্য উৎপন্ন হতে থাকে ; সংগে সংগে ছেলে ও মেয়েদের বগলে ও যৌনাংগ ঘিরে কেশোদ্গম হতে থাকে। ছেলেদের উপরন্তু গোঁফ ও দাঁড়ির রেখা দেখা দেয়। মনে রাখা দরকার এই সব দেহগত পরিবর্তন সামাজিক উপাদান, পুষ্টিকর খাদ্য ও মানসিক উদ্দীপনা দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। এই সময়ে দেহের ওজন ও উচ্চতা বাড়তে থাকে। কৈশোরের আদি পর্বের শেষে মেয়েদের উচ্চতার পরিমাণ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছয়। ছেলেরা যৌনতা উন্মেষের ও পরিপক্কতার দিক থেকে মেয়েদের চেয়ে দু বছরের মত পিছিয়ে থাকলেও ওজন ও উচ্চতার দিক থেকে এই বয়সে মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে যায়। শৈশবকালীন বৃদ্ধির চেয়ে আদি কৈশোরের

বৃদ্ধির হার অনেক বেশী, তাই পরিবর্তন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; উচ্চতা বৃদ্ধির কারণ মূলত মেরুদণ্ডের বৃদ্ধি।

আগেই বলা হয়েছে কৈশোরকালীন পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের জন্য দায়ী বয়ঃবৃদ্ধি ছাড়া আরও অনেক কিছু। আর্থ-সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, জনগত, জীনভিত্তিক কারণগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও আমাদের দেশের গবেষকরা পরিসংখ্যানভিত্তিক অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তার কিছু কিছু এখানে পরিবেশিত হচ্ছে।

কৈশোরের উচ্চতা বৃদ্ধির বাৎসরিক গড়পড়তা হার ছেলেদের ক্ষেত্রে 9·5 সে.মি. ও মেয়েদের ক্ষেত্রে 8·4 সে.মি.। শৈশবে (5-10 বছর) ছেলেদের ওজন মেয়েদের থেকে প্রায় 2 কি. গ্রা. বেশি থাকে। বয়ঃসন্ধির সাথে সাথে আদি-কৈশোরে (11-14 বছর) মেয়েদের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 13-14 বছরের মেয়েদের ওজন সমবয়সী ছেলেদের ওজনের চেয়ে 2 কি.গ্রা. বেশি থাকে। বয়ঃসন্ধির পর আবার (13/14 বছরের পর থেকে) ছেলেদের ওজন বৃদ্ধি মেয়েদের তুলনায় বেশি হতে থাকে ; 15-16 বছরের ছেলের ওজন ঐ বয়সী মেয়ের তুলনায় 3 কি.গ্রা. বেশি হয়। বয়স বাড়ার সংগে সংগে ছেলেদের ওজন আনুপাতিক হারে আরও বাড়ে।

ছেলেদের কৈশোরের আদিপর্ব শুরু হয় প্রায় 13 বছর বয়সে, 15 বছর পূর্ণ হবার আগে মধ্যপর্ব শেষ হ'য়ে যায় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই 16 বছরের মধ্যে যৌনতার দিক থেকে তারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এদিক থেকে 16 বছরকে কৈশোরের শেষ পর্ব বলা চলে, যদিও অন্যান্য দিক থেকে তাদের পূর্ণতা প্রাপ্তির দেরী থাকে। মেয়েদের বেলায় যৌনতা প্রাপ্তির আদি পর্বের শুরু 11 বছরের আগে, মধ্যপর্ব শেষ হয়ে যায় 12 বছরে এবং সাধারণত যৌনতার পূর্ণতা ঘটে 13-14 বছরের মধ্যে। এই সব তথ্য দেশ, জাতি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ভেদে ভিন্ন হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই বিষয়ে গবেষকদের তথ্যাদি খুব বেশি না থাকলেও সামান্যীকরণের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হয়।

কৈশোরে হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত, প্লীহা, বৃক্ক ইত্যাদি দেহের ভিতরকার সব যন্ত্রপাতিতেই আকস্মিক বৃদ্ধির তৎপরতা দেখা দেয়। হৃৎপিন্ডের স্পন্দন শৈশবে মিনিটে প্রায় 130/140 থাকে। হৃৎপিন্ডের পেশী ও অন্যান্য যন্ত্রাংগ দৃঢ় ও শক্তিশালী হওয়ার সংগে সংগে কৈশোরে

স্পন্দন কমে গিয়ে হয় 80-85। রক্তচাপ যা শৈশবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের কালে ছিল 80 ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে 16 বছরে 115 থেকে 120 পর্যন্ত ওঠে। একে বলা হয় সিসটোলিক (Systolic) চাপ। সংকোচনের পর প্রসারণের সময়কার রক্তচাপ (Diastolic) যা শৈশবে 55-60 থাকে বেড়ে গিয়ে 70-75 এ দাঁড়ায়। [Nag, Adolescents in India, 1920]*

শারীরিক পরিবর্তন ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঠিকমত ও নিয়মমত বৃদ্ধির সংগে কিশোরের ভবিষ্যতের বিশেষ সম্পর্ক আছে ; এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। বর্তমানে কিছু গবেষকদের তথ্য থেকে জানা গেছে যে, আদি কৈশোর পর্বের ব্যাপ্তিকাল ক্রমে কমে আসছে। মেয়েদের বেলায় এ ব্যাপারটা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হচ্ছে। ইংলন্ড-আমেরিকায় নাকি গত একশো বছরে মেয়েদের রজঃস্বলা হবার বয়স নেমে এসেছে ১২-৯ বছরে [Zacharies and Wurtman—Age at Menarchy New England M. Journal, P. 280, P. 868, 1969]। অনেকে তথ্য সমাবেশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের দেশে মেয়েদের ঋতুমতী হবার বয়স সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে বিশেষ বদলায়নি। আবার অনেকে এর বিপরীত অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রথমোক্ত গবেষকদের মতে আমাদের দেশে পশ্চিমী দেশের মত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটেনি, কাজেই বয়ঃ-সন্ধিকালের পরিবর্তন ঘটেনি। [Nag, Adolescents in India P. 32, 1982]

এই অভিমত অনেকে মেনে নিতে পারবেন না, তাঁরা বলবেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটলেও উন্নত ধরনের প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ আমাদের দেশে অনেক শিল্পে ঘটেছে এবং গণমাধ্যমের দৌলতে অন্যদেশের পরিবর্তনের খবর আমাদের সমাজের একাংশকে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া যুদ্ধোত্তরকালে অন্য দেশের সংগে যোগাযোগ অনেক বেড়েছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেলামেশা যুক্তরাষ্ট্রের মত অবাধ না হলেও আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক পার্টিতে সহপাঠী সহকর্মী ছেলে ও মেয়েরা একসঙ্গে বহু কাজে অংশ নিয়েছে। এর

---

* রক্তচাপের পরিমাপ দুই সময় করা হয় ঃ হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের সময়কার চাপকে বলা হয় সিসটোলিক ও পরবর্তীকালের প্রসারণের সময়কার চাপকে বলাহয় ডায়াসটোলিক।

দ্বারা যৌবনোদ্গম প্রভাবিত হবে না মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে না। আরও কিছু সামাজিক পরিবর্তনের কথা এখানে উল্লেখ করা চলে।

বিজ্ঞানসম্মত যৌনবিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে এখন ঢাকঢাক মনোভাবটা অনেক কম। আগের তুলনায় বিজ্ঞানসম্মত যৌনবিষয়ক আলোচনায় জ্ঞানীগুণীবৃন্দ অনেক বেশি অংশ গ্রহণ করছেন, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ছাড়াও গল্পে উপন্যাসে, নাটকে, যৌন উদ্দীপনার অনেক উপাদান থাকছে। আগের দিনের তুলনায় অনেক মার্জিত ও সূক্ষ্ম হওয়ার দরুণ এই সব আরও বেশি করে আজকের কিশোর কিশোরীদের প্রভাবিত করছে। আবার অন্যদিকে বাল্যবিবাহ অনেক কমেছে, অনেক বয়স অবধি ছেলে ও মেয়ে (মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে) লেখাপড়া শেখার জন্য পরিবারের উপর নির্ভরশীল থাকছে—এর ফলে বয়ঃপ্রাপ্তি সত্ত্বেও সাংসারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে না। এর দরুণও কিশোরকিশোরীর যৌবনোদ্গম প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা আছে। কৈশোরের শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন সমসাময়িক সমাজের ধ্যানধারণা ও মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপকের উপর বেশ কিছুটা নির্ভরশীল হবে—একথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থাৎ যে সব দেশে (আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে) উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত ও আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে অথচ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কোনো প্রস্তুতির কথা ভাবা হয়নি—যেখানে পুরোনো সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কোনো বিকল্প গড়ে ওঠেনি—সেখানে মেয়ে ও ছেলে উভয়ের ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধি খুবই সংকটাকীর্ণ হ'তে বাধ্য। যেখানে কিশোরকিশোরীরা দোলাচলের মধ্য দিয়ে চলেছে, সেখানে যৌবনোদ্গম সহজ ও মসৃণ হবে না এটাই স্বাভাবিক। সেখানে দোটানার মধ্যে পড়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তিক ও মানসিক পরিবর্তন উন্নতদেশের তুলনায় অনেক দ্রুতহারে হওয়ার দরুণ কিশোরকিশোরীরা অনেক বেশি উদ্দাম ও উচ্ছল হ'তে পারে। যৌনচেতনার বিকাশের অনুপাতে এ'সংক্রান্ত শিক্ষা (Sex-education) অনেক কম হওয়ার দরুণ তারা নিজেদের পরিবেশের সংগে মানিয়ে নিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে, পরিবারের স্নেহ শাসন থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে ভয় পাওয়ার জন্য কিশোরকিশোরীদের শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনে

বিলম্ব হয়; যৌনচেতনা অনেক দেরীতে বিকাশ লাভ করে। আত্ম-উপলব্ধি না হবার কারণে তারা সমাজের সংগে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। প্রথমোক্তরা বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের ভেতরে থেকে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হয় আর শেষোক্তদের বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ পায় সমাজ সম্পর্কে অনীহা ও আত্মকেন্দ্রিক অথবা সনাতনপন্থী চিন্তাভাবনায়।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণে খুব কম ক্ষেত্রেই আগের দিনের মতো নিঃশব্দে নিরুপদ্রবে ঘটেছে। অবশ্য এ'নিয়ে অন্য দেশের মতো কোনো মৌলিক গবেষণামূলক কাজ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমার এই সিদ্ধান্ত অনুমানভিত্তিক। তবে পরোক্ষ তথ্যপ্রমাণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার এ অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তে, অনেকেই, মনে হয়, সায় দেবেন।

উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির পরিমাণগত পার্থক্য

উচ্চতা ঃ কিশোরদের উচ্চতা বৃদ্ধির হার মেয়েদের থেকে বেশি। কিশোরদের গড়ে বছরে 9·5 সে.মি. (7—12) উচ্চতা বাড়ে, অপরদিকে কিশোরীদের বৃদ্ধির হার গড়পরতা 8·4 সে.মি. (6—11) [Tanner—1969.]

ওজন ঃ ওজনবৃদ্ধি প্রথম পর্বে কিশোরদের বেশি হয়, দ্বিতীয় পর্বে কিশোরীদের ওজন তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পায়; আবার অন্তকৈশোরে কিশোরদের কিশোরীদের চেয়ে ওজন বেশি হয়।

5—10 বছর পর্যন্ত ছেলেদের মেয়েদের চেয়ে প্রায় 2 কেজি বেশি ওজন থাকে। 11—14 বছরের মধ্যে কিশোরীদের ওজন কিশোরদের চেয়ে প্রায় 2 কেজির মত বেড়ে যায়। আবার 15—19 বছরের মধ্যে কিশোরদের ওজন কিশোরীদের চেয়ে প্রায় 3·5 কেজি বেশি হয়েছে দেখা যায়। [Sarma—1970]

মনে রাখা দরকার এ-সব সংখ্যাগত পার্থক্য নানাবিধ কারণের উপর নির্ভরশীল।

সারাংশ

শৈশব থেকে যৌবন প্রাপ্তির কালকে কৈশোর বলা হয়। এই সময় ছেলে-মেয়েদের দেহমনে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। দেশ, কাল, পরিবেশ, জনগত (ethnic), সংস্কৃতিজাত বৈশিষ্ট্য এবং জীনভিত্তিক সংকেতলিপি এই পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশকে প্রভাবিত করে। এই সব পার্থক্য সত্ত্বেও কৈশোরের উন্মেষ ও গতিপ্রকৃতির একটা সাধারন নকশা বা প্যাটার্ন আছে।

সব দেশের সব জাতির কিশোরকিশোরীর—একই ধরনের কতকগুলো চাহিদা ও সমস্যা আছে। এই পুস্তকে 11—19 বছর কৈশোর কাল বলে ধার্য করা হয়েছে।

কৈশোরে যে সব দেহগত ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে তার জন্য আপাত-দৃষ্টিতে দায়ী করা হয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থীর পরিবর্তনকে। এইসব পরিবর্তন কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য ও সামাজিক পরিবেশ দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। উচ্চতা ও ওজনবৃদ্ধির পরিমাণগত পার্থক্য এই অধ্যায়ের শেষে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন

কৈশোরে ছেলে ও মেয়েদের আঙ্গিক পরিবর্তন বর্ণনা কর।

উৎস ও সহায়ক পুস্তক

(1) Tanner, J. M.—Growth and endocrinology of adolescence, endocrina and genetic diseases of childhood, Ed Gardenar, W. B. Saunders, Phil & Lond, 1969.

(2) Sarma, J. C.—Physical Growth and Development of the Maharashtrians, Ed. Ethnographic and Folk Culture Society, Lucknow 1970.

উৎসাহী পাঠকদের জন্য অন্য কয়েকটি সহায়ক পুস্তকের উল্লেখ ঃ

(1) Davis, J. A. and Bobbling. J — Scientific Foundation of Pediatrics, Williams Heinemann Med. Books, 1974.

(2) Jones. Mary, C. The later careers of boys who were early or late maturing Child Developments 1957, 28,

(3) Payne, D. E.,& Mussen, P. H. Parent-child relations and father identification among adolescent boys—Inst. of Abnornal Soc. Psychol, 1956,52.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বংশগতির প্রভাব : জীনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বংশগতি বিদ্যা ও জীন সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান নিয়ে বিশদ আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নয়। সংক্ষেপে বংশগতি ও জীনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছি।

মানব জীবনের শুরু হয় ডিম্বকোষ শুক্রাণুদ্বারা নিষিক্ত হবার পরমুহূর্ত থেকে। নিষিক্ত কোষটি প্রথমে দুভাগ হয়ে দুটি কোষ হয়—(পরপৃষ্ঠায় চিত্র দ্রষ্টব্য) তারপর দুটি থেকে চারটি-চারটি থেকে আটটি—এইভাবে বিভাজন ক্রিয়া চলতে থাকে। ক্রমশ কিছু কোষ বিশিষ্টতা অর্জন করতে থাকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে এবং নির্দিষ্ট সময়ে দেহের বিভিন্ন সংস্থার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আভাস ফুটে ওঠে। আঠারো দিনের মাথায় ক্ষুদে হৃৎপিণ্ডের মৃদু স্পন্দন শোনা যায়—সপ্তাহ খানেকের মধ্যে শুরু হয় চোখ, মেরুদণ্ড, স্নায়ুসংস্থা, ফুসফুস ইত্যাদির প্রাথমিক বিকাশ, এগার সপ্তাহের মধ্যে দেহের প্রতিটি প্রত্যংগ ও সংস্থার বিন্যাস ও ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয়ে যায়। ন'মাসের পর শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং আমৃত্যু মাতাপিতার কাছ থেকে পাওয়া বংশগতির ধারা অনুসরণ ক'রে শিশুর বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এখানে বলে রাখা দরকার বংশগতির ধারা মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু পূর্বনির্ধারিত কোনো ছক বেয়ে চলতে পারে না। পরিবেশ—প্রাকৃতিক ও সামাজিক—এই ধারাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। এছাড়া ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে মানুষ তার শৈশব

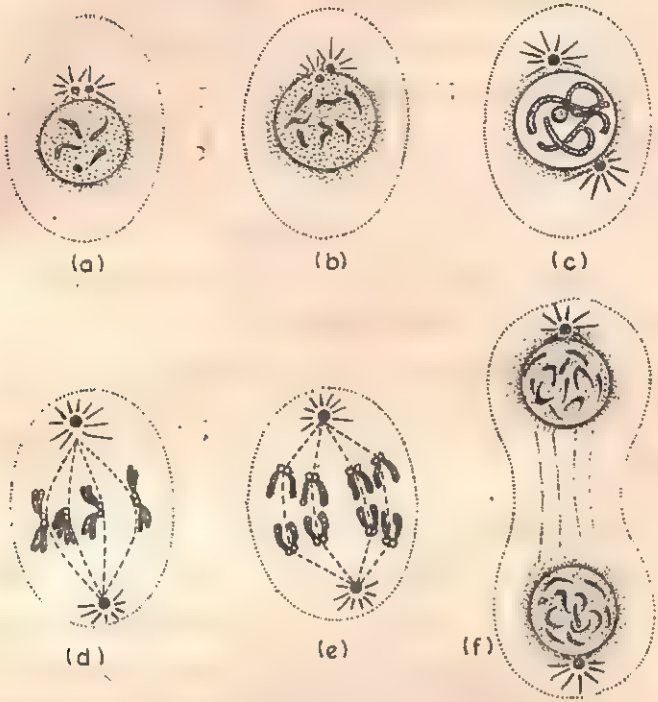

কোষ বিভাজনের পর্যায়ক্রম

(a) শান্ত অবস্থায় কোষ।

(b) বিভাজনের পূর্বমুহূর্তেই কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ডি. এন, এ গড়ে ওঠে এবং কেন্দ্রীনে 4C পরিমাণ (অর্থাৎ 4 ক্রোমোজোম পরিমাণ) থাকে।

(c) পরবর্তী পর্যায়—(Prophase) ঃ প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্রোমোজোম পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিটি ক্রোমোজোম ইতিমধ্যে দুইটি ক্রোমোটাইড-এ বিভক্ত হয়েছে।

(d) অধিপর্যায় (Metaphase) ঃ ক্রোমোজোমগুলি নিজেদের নিজস্ব সমকক্ষে চেটাল ভাবে বিন্যস্ত করে এবং তাঁতের মাকুর মত আকৃতি গড়ে ওঠে।

(e) এর পরের পর্যায় (Anaphase) ঃ ক্রোমাটাইড, এখন ক্রোমোজোম নামে অভিহিত, একে অন্য থেকে দূরে সরে যায়।

(f) শেষ পর্যায় (Telophase) ঃ এখন নতুন কেন্দ্রীন নতুন ভাবে গঠিত হয় এবং সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়ে দু'টি নূতন কোষ সৃষ্টি করে। নতুন সৃষ্ট প্রতিটি কোষে পূর্বতন ক্রোমোজোমের অনুরূপ মানানুযায়ী (2n member) 2 C পরিমান ডি, এন, এ থাকে।

থেকে বার্ধক্যের পথপরিক্রমায় পরিবেশকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে তার বংশগতির ধারাক্রমিক বৃদ্ধি ও পরিবর্তনকেও বদলায় ; কখনও বা পরিকল্পিত ভাবে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই।

বংশগতি, পরিবেশ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রভাব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা সবাই মানবজাতির বিশেষ কতকগুলো সাধারণ চিহ্নদ্বারা ভূষিত হয়ে যায় যা সহজেই সনাক্ত করা যায় ঃ আবার প্রত্যেকেই আমরা ব্যক্তিগতভাবে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। এই পরম বিস্ময়কর রহস্য সম্পর্কে আমরা আজ পরীক্ষামূলক অনেক তথ্য ও জ্ঞানের অধিকারী।

যে সব যন্ত্র ও পদ্ধতির দৌলতে আজ কোষ, নিউক্লিয়াস, ক্রোমোজোম; জীন ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, তার দু'একটি সম্পর্কে এখানে দু'চার কথা বলছি।

আল্ট্রা-সেনট্রিফিউজ (Ultra-Centrifuge) ঃ দেহের কোমল কলার (Soft Tissue) কোষগুলিকে হোমোজেনাইজার জাতীয় যন্ত্রে পেষা হয়, তখন অতি ক্ষুদ্র উপাদানগুলোকে পেষা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে, যদি যে তরল পদার্থে এরা নিক্ষিপ্ত হয়, তার লবনাংশ এই কোষের ভিতরকার লবনাংশের সমান হয়। এখন এগুলোকে অতি গতিসম্পন্ন সেনট্রিফিউজে রেখে যন্ত্রটি চালালে নিউক্লিয়াসের মত ভারী উপাদানগুলি টিউবের তলায় জমা হয়। উপরের জলীয় ভাগকে অন্য একটি টিউবে নিয়ে যন্ত্র আরো দ্রুতগতিতে চালালে অপেক্ষাকৃত হালকা উপাদান এই টিউবের তলায় জমে। এইভাবে জীবকোষের বিভিন্ন ধরনের উপাদানকে আজকাল পৃথক করে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাদের গুণাগুণ অধ্যয়ন করা যায়।

রেডিও-একটিভ আইসোটোপ (Radio-active Isotope) : ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত যৌগিকের সঙ্গে কারবন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদির রেডিও-একটিভ আইসোটোপ যুক্ত করে জৈব রসায়নের গবেষকরা জীবিত প্রাণীর মধ্যে এদের বিপাক-ক্রিয়ার (metabolism) ধারা অনুসরণ ও অনুধাবন করতে পারেন। গাইগার গণক (Geiger counter) যন্ত্রে বিপাক ক্রিয়ার কোনো উপাদানে রেডিও-একটিভ বস্তুটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে জানা গেছে যে জীবন্ত পদার্থ কখনই স্থির থাকে না, সব সময়েই চলমান ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। বাইরে থেকে কোনো প্রাণীর মধ্যে বিশেষ কোনো

পরিবর্তন লক্ষ্য করা না গেলেও জানা গেছে যে প্রাণীর ভিতরকার উপাদান ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে চলেছে।

লাইট-মাইক্রোসকোপি (Light microscopy) : জীবকোষের বহু উপাদান এই পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ, গুণাগুণ বিচার সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিসরণাংক (Refractive Index) বিশিষ্ট বস্তু, সাধারণ মাইক্রোস্কোপে (আলো শুষে নেওয়ার ক্ষমতার উপর গোচরীভূত হওয়া নির্ভর করে) যারা ধরা পড়ে না—এই লাইট মাইক্রোস্কোপিতে তাদের দেখা যায়।

ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোসকোপ (Electron Microscope) ঃ সাধারণ মাইক্রোস্কোপ ও লাইট মাইক্রোস্কোপিতে 0·5 মাইক্রন ((0·0005 মিলি মিঃ) এর থেকে ছোটো জিনিষ দেখা যায় না। আলোর রশ্মির পরিবর্তে এখানে ইলেক্‌ট্রন ব্যবহৃত হয় এবং তার ফলে 0·002 মাইক্রন আকারের বস্তুও দৃষ্টিগোচরে আসে।

এক্সরে বিচ্ছুরণ ঃ রঞ্জনরশ্মির বিচ্ছুরণে (diffraction) জীবকোষের বিন্যাস ও গঠনপ্রণালী সহজেই ধরা পড়ে এবং জীবন্ত প্রাণীর কোষের মধ্যেকার কার্যকলাপ ও তার দরুণ পরিবর্তনের প্রতিরূপ দেখা যায়। জীব-দেহের অণুর ভেতরকার সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও পরিবর্তন (যা ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোসকোপে ধরা পড়ে না) এই বিচ্ছুরণ পদ্ধতিতে অধ্যয়নের ফলে জানা যায়, এবং এর ফলে অনেক জৈব রসায়ন ক্রিয়াকলাপের সংগে সাংগঠনিক ব্যবস্থার সম্পর্ক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

কোষের (বেশির ভাগ) দুটি অংশ—মধ্যস্থিত 'নিউক্লিয়াস' ও সংগে তার চারদিকে জলীয় পদার্থ 'সাইটোপ্লাজম'—এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে অনেক বছর আগে। ছোট ছোট লাঠির মত দেখতে ক্রোমোজোমের অবস্থান ঐ নিউক্লিয়াসের মধ্যে। এরা জোড়া বেঁধে থাকে - কোনো প্রাণীর থাকে 4 জোড়া, কারো 10 জোড়া, মানুষের আছে 23 জোড়ো, বা 46টি ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোম আবার এক বিশেষ ধরনের বড় বড় ডি. অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের অণুর সমষ্টি—সংক্ষেপে ডি. এন এ. নামে পরিচিত। দুগাছা দড়ির মতো পাকানো এই অণুগুলি স্ক্রুর মতো পরস্পরকে পেঁচিয়ে আছে বলে মনে হয়। অনেকটা দড়ির মই-এর মতো এদের চেহারা। সব প্রাণীর বংশগতির সংকেত এই ডি. এন.এ-র মধ্যেই লিপিবদ্ধ। 23

জোড়া ক্রোমোজোমের প্রতিটি জোড়ার একটি আসে মায়ের কোষ থেকে অন্যটি পিতার। নতুন শিশু উৎপাদনে ও তার ক্রমবর্ধনের সবকিছুর নির্দেশ রয়েছে ঐ সংকেত লিপিতে। ক্রোমোজোমের এই জীন, এককভাবে বা অন্য জীনের সংগে মিলে দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সৃজন ও বর্ধনের নির্দেশ বহন করে। চোখের তারার রং, চুলের রং গড়ন ও রক্তের বিশেষ টাইপ (O, A, B, AB) : এই রকম প্রতিটি বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য আলাদা আলাদা জীন দায়ী। এছাড়া আমরা জানি মানুষের 'জীন' মানবিক গুণের ধারক ও বাহক। পিতামাতার সমানসংখ্যক ক্রোমোজোমের জীন নিষিক্ত ডিম্বকোষের মধ্যে থেকে সংকেতলিপির নির্দেশে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে, আর এই বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমও দ্বিগুণ হয় ; প্রতিটি বিভাজিত কোষে উৎস কোষের মতই 23 জোড়া ক্রোমোজোম তাদের নির্দিষ্ট জীনসন্নিবিষ্ট হয়ে সেই কোষটিকে সংকেতলিপির নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত করে। আগেই বলা উচিত ছিলো যে পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্ব-কোষে 23 জোড়ার পরিবর্তে 23টি করে ক্রোমোজোম থাকে। কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ে প্রকৃতির এই বিশেষ ব্যবস্থার দৌলতে ডিম্বকোষে 46 জোড়ার পরিবর্তে 23 জোড়া ক্রোমোজোম থাকার জন্য পরবর্তী বিভাজন ও ক্রমবৃদ্ধি সুশৃংখলভাবেই ঘটে। কোন ক্রোমোজোম বংশগতির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে, সেটা অনেকখানি আপাতনিক ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মাতাপিতার মিলনের ফলে ক্রেমোজোমের সংযুক্তি 80 লক্ষ বিভিন্ন রকমের যে কোনো একটি হবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই একই মাতাপিতার সন্তানদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য অজস্র রকমের হ'তে পারে। এছাড়া নিষিক্ত ডিম্বকোষে একই প্রলক্ষণদায়ী জীন (মাতাপিতার তরফের) জোড়া বাঁধে, চোখের রং নির্ধারণকারী দুরকমের জীন যদি দুরকমের (বাদামী ও নীল রং) হয়—তবে সন্তানের চোখের রং বাদামী হবে। কেননা এই জীনটি বেশি প্রভাবশালী। এদের বলা হয় 'ডমিনেন্ট' (Dominant) জীন। নীলরং প্রদায়ী জীনটি কিন্তু নবজাতকের ক্রোমোজোমের অঙ্গীভূত হ'য়ে আপাত নিস্তেজিত অবস্থায় থাকবে। এদের বলা হয় 'রিসেসিভ' (Recessive) জীন। পরে নীল রংয়ের কোনো ব্যক্তির সংগে এই জাতকের মিলনের ফলে তাদের সন্তানের চোখ নীল হবে। এইভাবে মাতাপিতার মধ্যে পরিদৃশ্যমান নয় এমন কোনো প্রলক্ষণ সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। তেজী ও নিস্তেজিত জীন সম্পর্কে এখনও আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

কিভাবে ডি. এন. এ-র সংকেতলিপি অনুযায়ী কোষবৃদ্ধি, বিশেষ ধরনের কোষ সৃষ্টি ও দেহের যন্ত্রপাতি ও বিবিধ সংস্থা গড়ে ওঠে, সে সম্পর্কে এখানে কিছু বলা দরকার। ডি. এন. এ. সম্পর্কিত বিশদ তথ্য অর্জনের অনেক আগে থেকেই প্রজনন বিদ্যার গবেষকরা পূর্বপুরুষের চেহারা থেকে ভিন্নাবস্থা বা পরিব্যক্তি (mutation) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁরা জেনেছিলেন পরিব্যক্তির জন্য বিশেষ কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবার ফলে প্রাণীর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। এন্‌জাইম জাতীয় কোন বৃহৎ প্রোটিন-অণুকে সংশ্লেষিত করবার অক্ষমতাই এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী। তখন ভাবা হ'ত একটি জীন একটি এন্‌জাইমের কার্যকলাপের জন্য দায়ী; এখন জানা গেছে যে বিশেষ বিশেষ জীন বিশেষ ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সংবাদবাহী আর.এন.এ.-র (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) মাধ্যমের প্রোটিন সংশ্লেষণের এই সংকেতবার্তা প্রেরিত হয়। প্রোটিন জীবের সংগঠক একক, অর্থাৎ ইমারতের বিল্ডিং ব্লক্‌স (building blocks)। আর. এন. এ.-ও ডি. এন. এ.-র মতো নিউক্লিওটাইডের একটি শিকল ; তবে এখানে ডি অক্সিরাইবোজের বদলে রাইবোজ থাকে। ডি. এন. এ.-তে দুটি শিকল পরস্পরকে জড়িয়ে আছে; আর. এন. এ.-তে থাকে একটি শিকল। নিউক্লিয়াসের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত নিউক্লিওলাস আর. এন. এ. উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে; বিজ্ঞানীদের এরকমই ধারণা। উৎপন্ন হবার সংগে সংগে আর. এন. এ. কোষের ভিতরকার তরল পদার্থ সাইটোপ্লাজমে চলে আসে। সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে বলা হয়ঃ ডি. এন. এ. থেকে আর. এন. এ. তৈরী হয়, আর. এন. এ. থেকে তৈরী হয় প্রোটিন (D. N. A. makes R. N. A. & R. N. A. makes Protein). 'জেনেটিক্ কোড' বা বংশগতির সংকেতবার্তা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন লাভ করেছি আমরা 1964 সালের পর। এই সময়ে প্রথম ভাইরাস-এর একটি ডি. এন. এ.-র সংশ্লেষণ সম্ভব হয়। দেখা গেল, এই সংশ্লেষিত ভাইরাস—ডি. এন. এ. প্রকৃতিজ ভাইরাসের মতো ব্যাক্‌টেরিয়াকে সংক্রমণে সক্ষম। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সূত্রপাত এই ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সাফল্যের পর থেকে। বিশেষ ঔৎসুক্য মেটাতে চান যাঁরা তাঁরা Helix বা Double

Helix-এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জানার জন্য Beadle (1964)-এর বইটা পড়তে পারেন।*

এখন আমরা জানি, পরিব্যক্তি (mutation) ডি. এন. এ-র মৌল রাসায়নিক উপাদানে পরিবর্তন ঘটায়—বাড়তি কিছু যোগ করে, কিছু বিয়োগ বা হ্রাস করে। যদি বংশগতির সংকেত লিপিতেই ত্রুটি থাকে অথবা সংকেতের কিছু অংশ হারিয়ে যায় কিম্বা পাঠোদ্ধারে ভুল হয়, তাহলে ফল প্রায়শই মারাত্মক। এক ধরনের রক্তাল্পতা রোগ ছাড়া আরো দুচার রকমের খারাপ অসুখ ঘটে পরিব্যক্তির ফলে। ভুল খবর পাঠানোর ফলে কোষবৃদ্ধি হয়তো আর থামলোই না ; গড়ে উঠলো না বিশেষ ধরনের কোষ বা সংস্থা ; একই ধরনের কোষ বাড়তে বাড়তে দেহের অন্যান্য অংশ ও যন্ত্রপাতিকে আচ্ছন্ন করে তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিলো। কর্কট-রোগ যে ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ.-র ভুল বোঝাবুঝি ও বিশৃঙ্খল আচরণের ফল এ অনুমান বোধ হয় শীঘ্রই পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

ডি. এন. এ. কোষ নিউক্লিয়াসের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যেতে চায়না। নিজের অণু থেকেই প্রায় দোসর সৃষ্টি করে জীবদেহের সব কাজকর্ম চালাবার ব্যবস্থা করে। এই দোসরই আর. এন. এ.। বার্তাবাহী বা দূত আর. এন. এ.র কথা আগেই বলেছি—যার কাজ প্রোটিন তৈরী করা। আর এক ধরনের আর. এন. এ. এই কাজের সহায়তা করে ঠিক ঠিক অ্যামিনো এ্যাসিডটি বাছাই করে প্রোটিন তৈরীর জায়গায় স্থানান্তরিত করে ; এদের নাম স্থানান্তকারী বা ট্রান্সফার আর. এন. এ.। সংকেতলিপি অনুযায়ী সঠিক নির্দেশ পাঠিয়ে ডি.এন.এ. জীব শরীর বৃদ্ধিরও নির্দিষ্ট ক্রিয়া-কলাপের উপযুক্ত প্রোটিন গড়ে তোলার কাজ এত সুন্দর ও নির্ভুলভাবে চালায় যে ললাটের লিখনে বিশ্ববাসীরা ডি. এন. এ.-কে অনায়াসে বিধাতা-পুরুষ আখ্যা দিতে পারেন। অতি জটিল ও আধুনিক গণক যন্ত্রের চেয়েও ডি.এন.এ.-র ক্ষমতা বেশি ও কার্যকলাপ অনেক বেশি জটিল ও বিস্ময়কর।

---

* Beadle, G. W. The New Genetics : Britannica Book of the year, Britannica, Chicago, 1964.

এই বিধাতাপুরুষ, এই গণক যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত রাসায়নিক পরিচয় জানানো

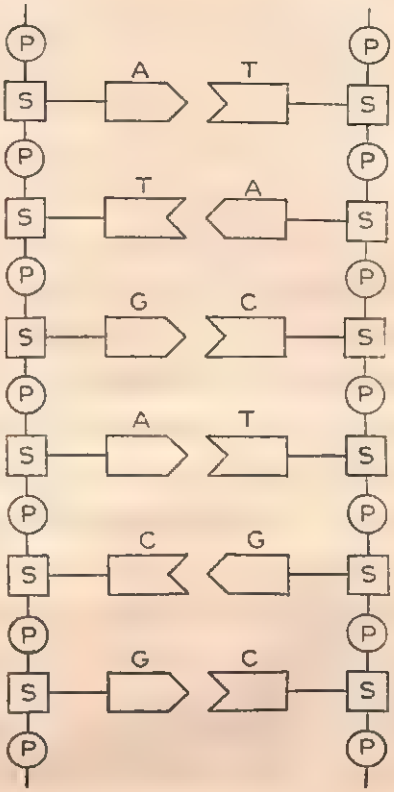

উচিত। ছোট ছোট নিউক্লিউটাইডের সমষ্টি নিউক্লিক-এ্যাসিডের নিজস্ব গঠন বেশ জটিল। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডের উপাদানের মূলে থাকে একটি এ্যাডেনিন (Adenine), থাইমিন (Thymine), গুয়ানিডিন (Guanidine) অথবা সাইটোসিন (Cytosine); তার সঙ্গে যুক্ত হয় হয় শর্করা জাতীয় উপাদান ডেসঅকিসরাইবোস—যার আবার সংযুক্তি ঘটে ফসফরিক এ্যাসিডের সংগে। বিভিন্ন নিউক্লিওটাইড ফস্‌ফেরিক এ্যাসিডের গ্রুপের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। মূলের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বন্ধনী দিয়ে বাধা থাকে শিকল দুটি। এ্যাডেনিনের সংগে বাঁধা পড়ে থাইমিন এবং গুয়ানিডিনের বাঁধনে পড়ে সাইটোসিন।

যৌন ক্রোমোজোম ঃ মেয়েদের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম একই

ধরনের, দুটিই 'X' ক্রোমোজোম। পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারক হয় দুই ধরনের দুটি ক্রোমোজোম—'X' ও 'Y' দ্বারা। নিষিক্ত হবার আগে সব ডিম্বকোষে শুধু 'X' ক্রোমোজোমই থাকে। অপরপক্ষে পুরুষের শুক্রাণুর আধখানায় থাকে 'X' আর আধখানায় থাকে 'Y' ক্রোমোজোম। যদি 'X' ক্রোমোজোম সমন্বিত শুক্রাণুর অংশ ডিম্বাণুর সংঙ্গে মিলিত হয়—তাহলে নিষিক্ত ডিম্ব থেকে স্ত্রীসন্তান, আর যদি 'Y' ক্রোমোজোম সমন্বিত শুক্রাণুর অংশ ডিম্বাণুর সংগে মিলিত হয় তাহ'লে নিষিক্ত থেকে পুরুষ সন্তান পাওয়া যাবে। স্ত্রী না পুরুষজাতীয় হবে—সেটা নির্ভর করে শুক্রাণুর উপর। মেয়েদের দুটি ক্রোমোজোম একজাতীয় হওয়ায় তাদের মধ্যে যৌন-জীনভিত্তিক জন্মগত ত্রুটি খুবই কম দেখা যায়। একটি ক্রোমোজোম যদি ত্রুটিপূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অপরটি সুস্থ থাকার দরুণ ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। অপরপক্ষে পুরুষের যৌনক্রোমোজোম দুটি দুজাতীয় হবার দরুণ, যে কোনো একটির ত্রুটি জন্মের পর ধরা পড়বে; ত্রুটি পূরণের কোনো সম্ভাবনা এখানে থাকছে না। বংশগতি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে লিঙ্গভেদে আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গুণাবলীর হেরফের ঘটতে পারে। সংস্কৃতিগত ও সমাজগত পার্থক্যের জন্য আমরা স্ত্রী পুরুষের কাছে স্বতন্ত্র ধরনের আচরণ, ব্যবহার প্রত্যাশা করি বলেই স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য বিশেষ করে নজর পড়ে।

মানুষের আকৃতিগত বিভেদের অনেকখানি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা থেকে উদ্ভূত—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চামড়ার রং, চুলের বৈশিষ্ট্য, চোখের রং ও চেহারা এবং রক্তের গ্রুপ জীননির্দিষ্ট বলেই মনে হয় আপাতভাবে। কিন্তু পণ্ডিতেরা মনে করেন বিশেষ পরিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থিতির ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের থেকে শারীরগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট হয়েছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য জীনকে প্রভাবিত করেছে। খররৌদ্রতাপে কয়েকশত পুরুষ আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করার ফলে ধীরে ধীরে চামড়ার নীচে ঘনকৃষ্ণ রঞ্জক পদার্থের সমাবেশ ঘটেছে, রৌদ্রতাপ থেকে দেহের অভ্যন্তরে থাকা যন্ত্রাদিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। অভিযোজনের জন্যই দৈহিক পরিবর্তন ঘটেছে—এই তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানের পর, পঞ্চাশের দশক থেকে শ্বেতজাতির পৌরুষ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করার মতো বিজ্ঞানসমর্থিত তথ্যভিত্তিক তত্ত্ব আর বিশেষ পরিবেশিত হচ্ছেনা। সাদা-

কালো, পীত, বাদামী সব বর্ণের বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন যে সব জাতির সব দেশের সব রং-এর মানুষের জীনবাহিত গুণাবলী ও শারীরবৃত্তিক ধর্ম একই ধরনের। প্রতিটি জাতি বা একই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য যতটা—জাতিগত বা অঞ্চলগত পার্থক্য ততটা নয়। প্রজননবিদ্যার অগ্রগতির সংগে সংগে পুরোনো ধ্যানধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে। কোনো জাতির বা ব্যক্তির (অস্বভাবীদের কথা বলা হচ্ছে না) মানসিক প্রবণতা জীনভিত্তিক বলে প্রমাণিত হয়নি। নৃবিজ্ঞানীরা আদিম জাতির মধ্যে নানাধরনের মনোভাবের সন্ধান পেয়েছেন। আক্রমনমুখীনতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্তর্মুখীনতা, পরিবেশ ও সংস্কৃতি-নির্ভর; জীননির্ভর নয়—এ বিষয়ে অনেকেই একমত হয়েছেন।

মানবশিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিবর্তনের ব্যাপারে বংশগতির প্রভাব, যাকে জেনেটিক সম্পদের প্রভাবও বলা যায়—ঠিক কতখানি তার সঠিক বিচার করা বর্তমানে অন্তত সম্ভব নয়। মানব প্রজাতির সংগে অন্যান্য প্রজাতির যে পার্থক্য বিশেষ করে আমাদের নজরে পড়ে সেটা হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন ও একেবারে নতুন পরিবেশের সংগে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা। পরিবেশের সংগে ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে নতুন গুণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা [পাভলভীয় (Pavlov)* পরিভাষায় যাকে বলে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ার ক্ষমতা] অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের অনেকগুণ বেশি। বাবুই পাখীর বাসা বাঁধার মতো জটিল প্রক্রিয়া শিখতে হয় না—এই ক্ষমতা নিয়েই তারা জন্মায়। পিঁপড়েদের জীবনযাত্রার প্রণালী মানুষের চেয়েও অনেক জটিল কিন্তু সেই বিধিবদ্ধ প্রণালী বজায় রাখার পদ্ধতি এদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে না। তাদের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে তারা তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী বজায় রাখতে পারেনা। বাবুই পাখী ও পিপীলিকা প্রজাতি এই সব জটিল ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক কাজের ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; তাদের জীনের মধ্যেই এই প্রোগ্রামের বিভিন্ন

---

* Pavlov, Ivan Petrovich (1849-1936) বিশ্ববিখ্যাত রুশ শারীরতত্ত্ববিদ নোবেল লরিয়েট ও ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। তার উচ্চমস্তিষ্ক ও স্নায়ুসংস্থার উপর মৌলিক গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে পাভলভীয় মনোবিদ্যা গড়ে উঠেছে।

দশার সংকেত লিপিবদ্ধ ছিলো। সংকেত লিখন (Transcription) পাঠনের (Translation) ও সেই অনুযায়ী শরীরের বিভিন্ন অংশ পরিচালনের ক্ষমতা নিয়েই এরা জন্মগ্রহণ করে। নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট কাজ করার ও সেই পরিবেশে নিজেকে টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা—যাকে বলে বিল্ট-ইন্ এ্যাডজাসটিভ প্যাটার্ণ' (Built-in adjustive pattern) – মনুষ্যেতর প্রাণীর সহজাত ধর্ম'। মানুষের ক্ষমতা এইভাবে সীমিত নয়। মানুষ নতুন অবস্হার মুখোমাখি হ'য়ে হতভম্ব হ'য়ে পড়েনা, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করে, যে পরিস্হিতির জন্য তার ডি. এন. এ.-তে প্রোগ্রাম তৈরী নেই, সেই পরিস্হিতিরও মোকাবিলা করতে পারে। অতিবড়-আপাত বুদ্ধিমান মনুষ্যেতর প্রাণীর সে ক্ষমতা নেই। বাক্শক্তি ও বাক্ভিত্তিক চিন্তাশক্তির অধিকারী মানুষ নতুন শিক্ষালাভের ক্ষমতার দিক থেকে উচ্চতম অন্য যে কোনো প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এছাড়া মানুষের প্রক্ষোভের ব্যাপ্তি ও গভীরতা অন্যপ্রাণী অপেক্ষা অনেক বেশি। এই সব বিশেষত্ব মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা দিয়েছে, দিয়েছে ইতিহাস গড়বার শক্তি আর দিয়েছে প্রাকৃতিক রহস্য ভেদ করে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের নৈপুণ্য। মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্তমানের পরিবর্তন করে—উত্তরসূরীদের জন্য ভবিষ্যত গড়তে চায়। মানুষের মধ্যে আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির চেয়ে অনেক সময়েই প্রজাতি সংরক্ষণ প্রবৃত্তি জোরালো হ'য়ে দেখা দেয়। মানুষ .ভালবাসে, তবে শুধু নিজেকে ভালবেসে সে তৃপ্তি পায়না, অন্যকে ভালবাসে, ভালবাসার জন্য জীবন দিয়ে থাকে মানুষ। এছাড়া মূল্যবোধ, আদর্শ, নিজের ও অন্যের আচরণের অর্থ অন্বেষণ ইত্যাদি বিশুদ্ধ মানবিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, মানুষ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে। ভালমন্দ বিচার, নৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা, জীবনের অর্থ খোঁজা' মৃত্যু নিয়ে চিন্তা' হোমোসেপিয়েনদের স্বভাবধর্ম'। মানুষ আবার কোনো কোনো অবস্হায় পশুর চেয়ে অবুঝ, নির্মম, নিষ্ঠুর। পশু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পশু হনন করে—মানুষ নিজের গড়া সংস্কারের দাস হ'য়ে প্রজাতি হননেও ইতস্তত করে না। এই জটিল ও বিচিত্র প্রজাতির অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপই তার ডি. এন. এ.-তে লিপিবদ্ধ প্রোগ্রাম বহির্ভূত। আকার, চুলের রং,, চোখের রং-এর জন্য নির্দিষ্ট জীন আছে, অবশ্য এই নির্দিষ্ট জীনও আমরা আগেই বলেছি—স্হানকাল পরিবেশের প্রভাব প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৌলতে তাদের বিশেষত্ব অর্জন করেছে। মানসিক বৈশিষ্ট্য—

যার বিবরণ আংশিকভাবে একটু আগেই দেওয়া হয়েছে, জীননির্ধারিত বা পুরোপুরি বংশগতি প্রভাবিত নয়। তবে মানবপ্রজাতির সাধারণ গুণ, ধর্ম ও শারীরিক—বিশেষ করে স্নায়ুসংস্থার বৈশিষ্ট্য—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের ফলে যা সে আয়ত্ত করেছে, প্রজাতির মানসিক ধর্ম উন্মেষের জন্য সেই মানবিক বিশিষ্টতার প্রয়োজন অপরিহার্য।—এই সব বিশিষ্টতা জীন নির্ধারিত। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবেই মানসিক বৃত্তি গড়ে ওঠে। শুধু মানসিক বৃত্তি কেন, দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো, হাঁটাচলা, কথা বলার মতো অতি সহজ মানবিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়াও অনায়াসলব্ধ বা জন্মদত্ত নয়। এই সব সাধারণ ধর্ম শিক্ষাসাপেক্ষ ও অর্জিত। মানব শিশু হয়ে জন্মালেই বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে পূর্ণবয়স্কের বিদ্যাবুদ্ধি বা অন্যান্য গুণাবলী আয়ত্তে আসেনা। মানবশিশুর মধ্যে কোন 'বিল্ট-ইন এ্যাড-জাস্টিভ প্যাটার্ণ' (**built-in ajustive pattern**) থাকেনা—আগেই উল্লিখিত হয়েছে। মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জীনের প্রভাবে দৌলতে মানুষ হবার পুরো সম্ভাবনা (**potentialities**) নিয়ে জন্মায় বটে, কিন্তু সে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন মানবিক সমাজ ও প্রশিক্ষণ। মানবশিশু অন্য প্রাণীর পরিবেশে বড় হ'লে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবেনা, কথা বলতে পারবেনা, স্বজাতিকে দেখে ভয়ে পালাবে, মানুষের খাদ্য সহজে গ্রহণ করবে না। আবার শিম্পাঞ্জি শিশু অনেক চেষ্টা চরিত্র সত্ত্বেও, সব বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ এবং অন্যান্য সব মানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও মানুষের গুণাবলী অর্জন করতে পারবেনা। আমাদের বংশানুক্রমিক মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে প্রাকৃতিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উদ্দীপকের প্রভাবে নতুন নতুন অভ্যাস বা শর্তাধীনে পরাবর্ত গঠিত হবার ফলে। পরাবর্ত গঠনে মস্তিষ্ক বল্কলের ভূমিকাই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ'।*

---

* প্রসঙ্গত নেকড়ের বাসায় মানুষ হওয়া কয়েকটা মানবশিশুর উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এদের অনেক চেষ্টা করেও মানবিক সাধারণ শারীরবৃত্তিক ও মানসিক ধর্ম আয়ত্ত করানো সম্ভব হয়নি। সংবাদপত্রের পাঠকদের 'রামু ও কমলার' কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। ফরাসী বিজ্ঞানী **Phillipe Pinel** অষ্টাদশ

জন্ম থেকেই যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তার কারণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। একই সমাজে, একই ধরনের সংস্কৃতির মধ্যে লালিত শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যর ব্যাখ্যায় জন্মগত পার্থক্যকে ও বংশগতিকে অনেকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। "প্রত্যেকটি ভ্রূণই স্বতন্ত্র ও অদ্বিতীয়। এই মৌলিক স্বাতন্ত্র্য দ্বারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তির জীবনচক্র আচ্ছন্ন থাকে। মানসিক গঠন, মেজাজ, আচরণ, ক্রমবিকাশের বিশেষ ধরন—সবের মধ্যেই এই স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত" (Gasell and Amatruda, The Embryology of Behaviour New York, 1945, p 248)।—এই উক্তির মধ্যে এই ধারণাই প্রকাশ পাচ্ছে। আবার আরেক দল বিজ্ঞানী মনে করেন, যে শুধু জন্মদত্ত জীনকে আদি-শৈশবের প্রলক্ষণ বা বিশিষ্টতার জন্য দায়ী করা চলে না। শিশুর আদিতম প্রলক্ষণটিও জীন ও পরিবেশ—দুয়েরই উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতে গঠিত। জন্মপূর্ব পরিবেশ ভ্রূণকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে। (Eiduson & Geller, American Journal of Psychiatry. 1962, p. 119, 342-350) তাছাড়া কোনো সময়ে ঠিক সমধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করে দুটি নবজাতক নিয়ে এধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। মনুষ্যেতর প্রাণিশাবকের উপর এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে মানব শিশুর পক্ষে সেই ফলাফল প্রযোজ্য হবে—একথাও বলা চলে না। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের নমনীয়তা ও নতুন অভ্যাস গড়ে তোলার (শিক্ষার) বিশেষ ক্ষমতার কথা আগেই বলা হয়েছে।

জন্মের পর থেকে শিশু মাত্রেই তার পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা সব শিশু একরকমভাবে করে না। পরিবেশের হেরফেরের সঙ্গে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে মারফি ও তাঁর সহকর্মীরা কিছু পরীক্ষা চালিয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বাচ্চাদের প্রতিক্রিয়া একেবারে প্রথম থেকেই বিভিন্ন ধরনের হ'য়ে থাকে। (Murphy and Associates, Widening World of Childhood, New York 1962). কর্মতৎপরতা, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া, সংবেদনশীলতা, অভিযোজন ক্ষমতা—এক এক শিশুর এক এক ধরনের। জন্মের পর প্রথম সপ্তাহ থেকেই

শতাব্দীর শেষভাগে এই রকম একটি শিশুকে মানবিকীকরণের বিশেষ চেষ্টা করেও সাফল্যলাভ করেননি।

দেখা যায় কোনো শিশু সামান্য শব্দ শুনলেই চমকে ওঠে, মুখে রোদ পড়লেই কেঁদে ওঠে ; অন্য একজন এ'রকমটি করে না। একই পরিবেশ সমানবয়সী, সমান ওজনের, শারীরিক দিকে কোনো অসুস্থ উপসর্গবিহীন—দুটি শিশুর সহনশীলতা ও স্পর্শকাতরতার মাত্রা কমবেশি হ'য়ে থাকে। মা বা ধাত্রীর মেজাজ, সহনশীলতা, উৎকণ্ঠাপ্রবণতা, ইত্যাদি মানসিক ধর্মের সঙ্গে শিশুর এই ধরনের ব্যবহারের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেও মারফি ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করেন যে বাচ্চাদের এইসব প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মূলত জীন প্রভাবিত, জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম। প্রক্ষোভিক তারতম্যের দিক থেকেও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যও এঁরা জীননির্দিষ্ট বলে মনে করেন। পরিবেশের সংগে জীবনধারার পরিবর্তনের—যথা, খাদ্যবদল ও মায়ের কাছ থেকে সাময়িকভাবে দূরে থাকা, ছোটোখাটো আকস্মিক দুর্ঘটনা, ইত্যাদির সঙ্গে মানিয়ে নেবার ব্যাপারেও শিশুদের মধ্যে যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য দেখা যায়, তার জন্য দায়ী জন্মসূত্রে পাওয়া জীনের বৈশিষ্ট্য। এই অভিমত পোষণ করেন যাঁরা তাঁরা একথা বেশ জোর দিয়েই বলেন যে সামান্য পীড়নে (stress), যে সব শিশু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, যাদের মধ্যে হজমের গোলমাল, শ্বাসকষ্ট, দেহের তাপমাত্রার তাৎক্ষণিক বৃদ্ধি ও অন্যান্য শারীরিক উপসর্গ অথবা অস্থিরতা, কান্নাকাটি, ভয়ের অভিব্যক্তি ইত্যাদি মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাদের ভবিষ্যতে প্রতিকূল পরিবেশে স্নায়ুচাপ বৃদ্ধির দরুণ অন্ত্রনালীর ক্ষত, রক্তচাপবৃদ্ধি, বৃহদান্ত্রের প্রদাহ প্রভৃতি মানস-শারীরিক ব্যাধি, খেদোন্মত্ত বাতুলতা (Manic-depressive Psychosis) অথবা চিত্তভ্রংশী বাতুলতার (Schizophrenia) মতো মনের রোগ দেখা দিতে পারে : যদিও এঁরা মনে করেন যে মানসিক রোগ বংশানুক্রমিক বা জীনবাহিত নয়। এই সব প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রায়শ দেহের কোনো সংস্থার অংশবিশেষে প্রকাশ পায় ; মাঝে মাঝে অবশ্য সামগ্রিক সত্তার প্রতিক্রিয়াও লক্ষিত হয়। ভবিষ্যত জীবনে পরিবেশ খুব বেশী প্রতিকূল না হলে যে সব শিশুর কর্মতৎপরতা, সংবেদনশীলতা, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া—সবই কম অথচ অভিযোজন ক্ষমতা ভাল তারা জীবনে মোটামুটি সাফল্য লাভ করে, জীবন তাদের মসৃণভাবেই চলে। আর যারা কর্মতৎপর, অতিমাত্রায় প্রক্ষোভাধীন ও সংবেদনশীল, এবং অভিযোজনক্ষম তারা জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে সফলতা লাভ করে এবং নিজেদের অবস্থায় তৃপ্ত থাকে। কিন্তু কর্মতৎপরতা প্রক্ষোভ ও সংবেদনশীলতা যাদের

Acc no- 15575

বেশি তাদের যদি অভিযোজন ক্ষমতা কম হয়, তবে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় এবং বহু রকমের অসুখকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়।

শিশুদের জীবনারম্ভে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য, প্রক্ষোভ, সংবেদন, কর্মতৎপরতার তারতম্য ইত্যাদির অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ না করেও এ প্রশ্ন তোলা যায় যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলি পুরোপুরি জীননির্দিষ্ট,—এ সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য প্রমাণ উপস্থিত আছে কি? প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার মূলে গর্ভিনীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবের (যা ভ্রূণের উপর ক্রিয়া করেছে) গুরুত্বকে অস্বীকার করা চলে কি? রুশবিজ্ঞানী পাভলভ বর্ণিত মস্তিষ্কের টাইপ প্রসঙ্গত এসে পড়ে। পাভলভের সময়ে জীনবিজ্ঞান পরিণতি লাভ করেনি। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্র্যাটিস* (460-377 B.C.) মানুষের মেজাজ অনুযায়ী তাদের চারভাগে বিভক্ত করেন। যারা আশাবাদী আর উচ্ছল তাদের নাম দিয়েছিলেন প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguinous); মনে করেছিলেন এদের দেহে বোধ হয় Sanguin মানে রক্তের ভাগ বেশি। দ্বিতীয় দল, যারা ঠাণ্ডা মাথায় সব সময়েই নিজের কাজে মন দিতে পারে ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে পারে—তাদের নাম দিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠ বা ফ্লেগম্যাটিক (phlegmatic)। মনে করেছিলেন এদের মধ্যে শ্লেষ্মা বা phlegma-র আধিক্য আছে। বেশি মাত্রায় অস্থির ও বদমেজাজি মানুষের দেহে বোধ হয় হলদে পিত্তের (chole) আধিক্য আছে ভেবে তাদের নাম দিলেন কোলেরিক (choleric)—রগচটা। আর ভাবলেন বিমর্ষ ভাবাপন্ন মানুষের মধ্যে বোধ হয় মেলাকোল (melachole)—নামের কালো পিত্তের আধিক্য—তাই তাদের নাম রাখলেন মেলান্‌কোলিক (melancholic) বা বিমর্ষ ভাবাপন্ন মানুষ। অনেক অনেক দিন আগে যখন ক্রোমোজোম, জীন ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরিচয় ছিলো না

---

* Hippocrates (460-377) BC—আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক। তাঁর আগে ইয়োরোপ রোগকে, বিশেষ করে মনের অসুখকে ঈশ্বরের অভিশাপ, ভর হওয়া, ভূতে পাওয়া 'ইত্যাদি' মনে করা হতো মধ্যযুগে আবার এই জ্ঞানের আলোক নির্বাপিত হয়। Renaissance, Reformation-এর পর হিপোক্রেটিস-এর মতবাদ পুনরুজ্জীবিত হয়।

তখনও কিন্তু মানুষের মেজাজ বা ধাত নানারকমের, একথা সাধারণ মানুষও বুঝতেন। তবে ঠিক বিশুদ্ধ টাইপ বা মেজাজের মানুষ গল্প নাটকেই দেখা যেত ; বাস্তব জীবনে তাদের দেখা মিলতো না। শেক্সপীয়রের সমসাময়িক বেন জনসন বিশুদ্ধ মেজাজের মানুষ নিয়ে দুখানা নাটক লিখেছিলেন ; নাটক দুটোর নাম "এভি ম্যান ইন হিজ হিউমর" ও "এভরি ম্যান আউট অভ হিজ হিউমর।"

পাভলভ কুকুর নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার সময় মাঝে মাঝে কতকগুলি অসুবিধায় পড়েছিলেন। কিছু কুকুরের বেলায় উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনায় নিয়ে আসা সহজসাধ্য ছিলোনা, জটিল ও যৌগিক পরাবর্ত, গঠন করতে গিয়ে এক একটা কুকুরের বেলায় স্নায়ুতন্ত্রে নিস্তেজনার আধিক্য দেখা যাচ্ছিলো। সেই অবস্থায় আবার কোনো কোনো কুকুরের বেলায় বিপরীত উপসর্গ দেখা যাচ্ছিলো। ব্যাপারগুলো ঠিকমতো বুঝতে না পারার দরুণ নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। এই সব তথ্যকে ভালো করে বোঝার জন্য, তথ্যগুলোর ব্যাখ্যার জন্য পাভলভ নতুন তত্ত্বের প্রয়োজন অনুভব করলেন। এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে 'টাইপ' তত্ত্বের জন্ম। খুব সংক্ষেপে পাভলভের বক্তব্য পেশ করছি।

"মৌলিক স্নায়ুপ্রক্রিয়া উত্তেজনা-নিস্তেজনার তিনটি বিশেষ ধর্ম—মাত্রা (strength), ভারসাম্য (balance) ও গতিময়তার (mobility) বৈশিষ্ট্য ও মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন টাইপের সৃষ্টি। কথাগুলোর ব্যাখ্যা বোধ হয় প্রয়োজন। মাত্রা বা শক্তি মানে মস্তিষ্ক কোষের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা। উত্তেজনা বা নিস্তেজনার প্রক্রিয়া থেকে আসে স্থিতিস্থাপকতা বা ভারসাম্য। গতিময়তা মানে উত্তেজনা—নিস্তেজনার তরঙ্গের বেগ। গতিময়তা উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনা অথবা নিস্তেজনা থেকে উত্তেজনায় রূপান্তরের মাপকাঠি।

শক্তিমাত্রার ভিত্তিতে পাভলভ প্রথমত সব প্রাণীকে সবল ও দুর্বল—এই দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করলেন। দুর্বল টাইপের মস্তিষ্কে সহ্যক্ষমতার বিশেষ অভাব থাকে ; পরিবেশের সামান্য চাপেই, উত্তেজনা বেশি বাড়লেই তাদের ক্রিয়াকলাপে বিশৃংখলা প্রকাশ পায়। উত্তেজনা সহ্য করার উপাদান মস্তিষ্কে কম, তাই আত্মরক্ষামূলক নিস্তেজনা সৃষ্ট হয় যখন উত্তেজনার মাত্রা বাড়ে এবং মস্তিষ্ক কোষের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণে চেষ্টা করে (এইটেই

মস্তিষ্কের সহজাত ধর্ম), এদের মস্তিষ্কে নিস্তেজনা প্রবাহ সহজেই ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে বলে এরা সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে। এই টাইপের ব্যক্তির বেলায় উৎসাহ উদ্দীপনা কম দেখা যায়। স্বভাবতই এরা বিষণ্ণ তাই এদের বলা হয় 'বিমর্ষ' বা 'মেলাংকোলিক' টাইপ। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে এই টাইপের আধিক্য দেখা যায়। অপর দিকে সবল টাইপের মস্তিষ্কে উত্তেজনার উপাদান বেশি থাকে তাই উত্তেজনার মাত্রা বাড়লেও, অনেকক্ষণ ধরে উত্তেজিত থাকলেও এরা ঘুমিয়ে পড়ে না; উত্তেজনার ফলে এদের মস্তিষ্কে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না।

সব সবল প্রাণী কিন্তু একধরনের নয়। সবল প্রাণীর একদলের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা বা ভারসাম্য থাকে, অপর দলের মধ্যে তা থাকে না। যাদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব তাদের বলা হোলো 'কোলেরিক'—এদের মধ্যে উত্তেজনা-নিস্তেজনার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। নিস্তেজনার ক্রিয়া এদের দুর্বল, নিস্তেজনার উপাদান এদের মস্তিষ্কে কম। 'কোলেরিক' টাইপের মানুষ সাধারণত অতিমাত্রায় উৎসাহী, আত্মশক্তিতে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী। প্রাণশক্তি, কর্মশক্তিতে সব সময় যেন টগবগ করছে। এরা সাধারণত অসহিষ্ণু, অসংযত, অস্থিরমতি। আত্মবিশ্বাসের আধিক্য এদের বেশির ভাগকে বিপজ্জনক কাজে প্রবৃত্ত করে, উচ্চাকাংক্ষা এদের সাধ্যের অতীত কাজে প্রণোদিত করে, তাই এদের জীবনের পরিণতি প্রায়ই ট্র্যাজিক হয়ে থাকে। বল্গাহীন কর্মপ্রেরণা থাকার জন্য এরা অনেক সময়েই যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না, নিজের খেয়ালখুশি মতো অপরিকল্পিত কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং সাফল্য লাভে অসমর্থ হয়। কিন্তু এদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক সাফল্য লাভ করে তারা নাদিরশাহ, চেংগিস খাঁ, আলেকজাণ্ডার, কলম্বাস, ড্রেকের মতো জগৎবিখ্যাত হয়। যারা সবল অথচ যাদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা নিস্তেজনার সমতা আছে, তাদের গতিময়তার তারতম্য অনুযায়ী দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্নায়ুপ্রবাহে গতিময়তা কম থাকলে, আগেই বলা হয়েছে যে উত্তেজনা-নিস্তেজনার রূপান্তরণ সহজে ঘটে না, বেশ একটু সময় লাগে। উত্তেজনা পরাবর্তের বদলে নিস্তেজনার পরাবর্ত গঠন এদের ক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষ বলেই এদের নাম দেওয়া হয়েছে স্থিতিস্থাপক বা ফ্লেগম্যাটিক টাইপ। এরা ঘাতসহ, অচঞ্চল, সংযমী, উদ্যমশীল, অধ্যবসায়ী ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। একই কাজে লেগে থাকার ক্ষমতা এদের মধ্যে বেশি। কারণ, একই উদ্দীপক এদের মস্তিষ্কে অনেকক্ষণ ধরে ক্রিয়া করলেও নিস্তেজনা নেমে আসে না।

এরা কাজ করতে করতে চট করে অন্য কাজে মন বসাতে পারে না বটে ; কিন্তু বিফলতা এদের উদ্যমকে কমাতে পারে না। ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে কাজ করাই এদের সহজাত ধর্ম। অনেকদিন ধরে একই ধরনের কষ্টসাধ্য কাজে লেগে থাকলেও এরা অস্থির বা হতাশ হয়ে পড়ে না, এদের স্বভাবধর্ম এদের গবেষণাধর্মী কাজে সাহায্য করে। রবার্ট ব্রুস গবেষক না হলেও বোধ হয় 'ফ্লেগম্যাটিক' টাইপের মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন।

'স্যাংগুইন' টাইপের সংগে কোলেরিকদের কিছুটা মিল থাকলেও, তফাৎটাই বেশী। এদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা নিস্তেজনার রূপান্তরণ সহজেই ঘটে। তাই এরা একই সঙ্গে একাধিক কাজে না হোক অল্প সময় অন্তর বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হতে পারে। এরা উচ্চাভিলাষী ও প্রাণচঞ্চল হলেও কোলেরিকদের মতো মাত্রাজ্ঞানহীন নয় ; আত্মবিশ্বাসী হলেও হঠকারী নয় ; নিজেদের ক্রোধাবেগ, উত্তেজনাপ্রবণতা দমন করতে পারে, স্থান কাল পাত্র বিচার করে আচরণ করতে সমর্থ। নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্চধারণা সত্ত্বেও বাইরের বাধাবিপত্তি সম্পর্কে এরা সজাগ ও সচেতন ; কোলেরিকদের মত অপরিকল্পিত বিপজ্জনক কাজে জড়িয়ে পড়ে অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা এদের খুবই কম। সফল শিল্পসংস্থার বড়কর্তা, রাষ্ট্রনায়ক, ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এই টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়।*

পাভলভের এই টাইপের সম্পর্কিত ধারণা প্রধানত কুকুরদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যভিত্তিক। পরবর্তীকালে মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসংস্থার গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিকে পাভলভের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর জানা নেই যে পাভলভ বহুদিন ধরে ক্লিনিকে রোগ ও রোগী নিয়ে অধ্যয়ন করার পর মানবমন ও পশুমনের গুণগত পার্থক্যের বাস্তব-ভিত্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। মানুষের মনোজগতের বৈশিষ্ট্যের মূলে তাঁর স্নায়ুসংস্থার নতুন ব্যবস্থার সংযোজন। বাক্‌শক্তি লাভ করার ফলেই মানুষ উন্নততর পৃথক সত্তার অধিকারী এবং এই বাক্‌ শক্তি লাভের পথেই তার

---

* উৎসাহী পাঠক এ-প্রসঙ্গে এই লেখকের পাভলভ পরিচিতি ১৯৭৬, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮–১২২ পড়ে দেখতে পারেন।

মস্তিষ্কে নতুন স্তর গঠিত হ'য়েছে। এই স্তরটির তিনি নাম দিলেন—দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর (second signalling system)। প্রথম সাংকেতিক স্তর হোলো পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংবেদনজাত স্তর—পশু ও মানুষ—দুই প্রজাতিই এর অধিকারী। দ্বিতীয় স্তরের আবিষ্কার মানবীয় চিন্তা-ভাবনা, চেতনা ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পথ খুলে দিয়েছে। মানবশিশুর মধ্যে এই দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের সংযোজনের ফলে তাদের আবার দুটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট টাইপে ভাগ করা যায়।

প্রথমে বংশগতির প্রভাবে ও পরে পরিবেশের প্রভাবে এই দুই স্তরের বিকাশ সবার ক্ষেত্রে একই রকম হয় না। তবে বেশির ভাগ মানুষের দুটি স্তরের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটি সাংকেতিক স্তরের প্রভাব সমান না থাকার দরুণ দুটি বিভিন্ন টাইপের সৃষ্টি হয়। যাদের মধ্যে প্রথম সাংকেতিক স্তর—ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তর—বেশি শক্তি-শালী, তাদের সংবেদনশীলতা, স্পর্শকাতরতা বেশি হবে। আর যাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তর বা বাক্‌তন্ত্রের প্রাধান্য বেশি তাদের চিন্তাভাবনা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা বেশি হবে। প্রথমোক্তদের 'আর্টিস্ট টাইপ' ও দ্বিতীয়োক্তদের 'দার্শনিক টাইপ' আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস ইত্যাদির অনুভূতির আধিক্যের জন্য 'আর্টিস্ট' টাইপের কাছে বাইরের জগৎ মূর্ত ও অখন্ড কল্পনায় প্রতিভাত, ভাবাবেগে জীবন্ত ও রঙ্গীন। আর দার্শনিক ব্যস্ত বিমূর্ত ধ্যানধারণা নিয়ে, তত্ত্ব নিয়ে; তথ্য থেকে তত্ত্বের উত্তরণ দার্শনিকের কাজ। ভ্যানগগকে যদি আর্টিস্ট টাইপের প্রতিনিধি বলা যায় তবে হ্যামলেট হোলো দার্শনিক টাইপের প্রতিনিধি।

উচ্চ প্রাণীর চার টাইপ, মানবিক এই দুই টাইপের মধ্যেও দেখা যায়। এই চার টাইপের আবার অন্তত দশ বারোটা সাব-টাইপ আছে। মানুষের দুই সাংকেতিক স্তরের যে কোনোটির প্রাধান্যের সংগে ঐ সব সাব-টাইপের যোগাযোগের ফলে সাব-টাইপের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যাবে নিশ্চয়ই। মানবশিশু জন্মাবার পর বাইরের উদ্দীপকে সাড়া দিয়ে থাকে বিভিন্নভাবে। বাক্‌স্ফুরণের সংগে সংগে উদ্দীপকে সাড়া দেওয়া ও নতুন পরাবর্ত গঠনের ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আরও বেশি করে দৃষ্টিগোচর হবে—এটাই স্বাভাবিক।

পাভলভ তাঁর টাইপ সংগঠনের ব্যাপারে বংশগতি, জন্মপূর্ব ভ্রূণের

পরিবেশ ও জন্মপরবর্তী শিশুর পরিবেশকে অনেকটা সমান গুরুত্ব দিয়েও মন্তব্য করেছেন যে—শিশুর বয়স বাড়ার সংগে সংগে পরিবার, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, প্রতিবেশী ও তার সামাজিক পরিবেশের বিশেষ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি থেকে আসা উদ্দীপকই মস্তিষ্কের টাইপকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে ও শিশুমনের ক্রমবিকাশকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে।

মনুষ্য প্রজাতির জীন যে মানবিক বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে' মানুষের সামাজিক পরিবেশে লালিত-পালিত না হ'লে শিশুর মধ্যে সেই বিশেষ মানবিক ধর্ম (শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক—দুইই) বিকাশের কোনো সম্ভাবনা থাকে না—এই কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

পাভলভীয় মস্তিষ্ক টাইপ আরো সহজে বোঝার জন্য একটি 'চার্ট" পরপৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করছি।

মার্ফি ও তার মতো অন্যান্য বিজ্ঞানকর্মীরা জন্মাবার পর থেকেই বাচ্চাদের কর্মতৎপরতা, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া, সংবেদনশীলতা, অভিযোজন ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে আমরা অনায়াসে উচ্চমস্তিষ্ক ও স্নায়ুসংস্থার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারি একই উদ্দীপক মস্তিষ্কের বিভিন্ন টাইপের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক।

ব্যক্তিত্বগঠনে বংশগতির প্রভাবকে কিছু বিজ্ঞানকর্মী অতিগুরুত্ব দান করেছেন ; কিন্তু বিশেষ বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্ব বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আলাদা জীনের অস্তিত্ব - এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বলেই আমরা জানি। আদি শৈশব থেকে বিভিন্ন শিশুর মধ্যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার যে পার্থক্য দেখা যায় তার মূলে আছে মেজাজ বা টেম্পেরামেন্টের পার্থক্য। এ বিষয়ে সব স্কুলের মনোবিদরাই প্রায় একমত। এই মেজাজ বা টেমপেরামেন্ট গঠনে যে সব মনোবিজ্ঞানী পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিদ্যা সম্পর্কে অনীহ তারাও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসরণ (hormonal secretion) ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থার প্রভাবকে দায়ী করেছেন। লালনপালনের বিভিন্ন রীতি ও ধরন থেকে শৈশবে পৃথক মেজাজ ও ও উত্তরকালে কৈশোর-যৌবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়—এই অভিমতের পৃষ্ঠপোষকরাই বোধ হয় বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের—সাধারণ ছাঁচে নিজেদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিশিষ্ট কিছু অলংকরণ বা নকসা মিশিয়ে পিতামাতা সন্তানদের জন্য যে স্বতন্ত্র পরিবেশ

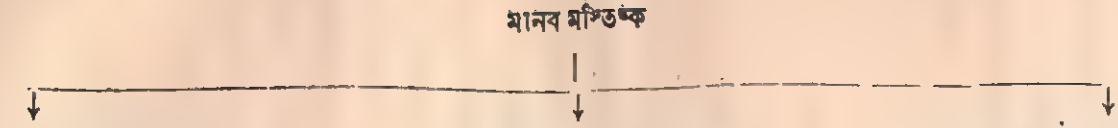

মানব মস্তিষ্ক

- প্রথম সাংকেতিক স্তর প্রাধান্য আর্টিস্ট টাইপে
- দুই সাংকেতিক স্তরের (প্রথম ও দ্বিতীয়) সমতাবিশিষ্ট সাধারণ টাইপ
- দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর—প্রাধান্য দার্শনিক টাইপে

	সবল			দুর্বল
মাত্রাশক্তি	সবল	সবল	সবল	দুর্বল
ভারসাম্য	সমঞ্জস	সমঞ্জস	অসমঞ্জস ও উত্তেজনা আধিক্য সমন্বিত	অসমঞ্জস ও নিস্তেজনা আধিক্য সমন্বিত
গতিময়তা	অনড়	গতিময়	গতিময়	অনড় / গতিময়
টাইপ	ফ্লেগম্যাটিক	স্যাংগুইন	কোলেরিক	মেলাংকলিক

সৃষ্টি করেন তার প্রভাবে শৈশবেই প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য অনেকটা নির্দিষ্ট হ'য়ে যায় ; এই কর্তব্য পালনের পদ্ধতি নির্ধারিত হয় ব্যক্তিবিশেষের জৈবধর্ম প্রদত্ত মেজাজ অনুযায়ী। শিশুর মানসিকতা গঠনে, শৈশব থেকে কৈশোরে উন্নীত হবার পথের প্রতিটি ধাপে ফ্রয়েডীয় লিবিডোর* প্রভাবে বিশ্বাসীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেলেও—এখনও প্রচুর। অপর দিকে, বস্তুবাদী বিশেষ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীদের সংখ্যা আমাদের দেশে কম হ'লেও—অন্যান্য দেশে এই শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিজ্ঞানীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। খুব সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে ফ্রয়েডের লিবিডো-ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব ও পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্বের পরিচয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করছি। মানসিকতার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় দুই ধরনের অভিমতই পরিবেশন করার চেষ্টা করবো। এদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু পাভলভীয় মনোবিদ্যার প্রচার এদেশে খুবই কম। পাঠ্যপুস্তকে পাভলভ সম্পর্কে তাঁর দুচারটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া অন্য কিছুর উল্লেখ নেই। সহায়ক পুস্তকে ও মনরোগ-বিদ্যার কেতাবে ভুল করে বা অজ্ঞতাবশত পাভলভকে ব্যবহার-বাদী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকদের অনেকেই তাই পাভলভীয় মনোবিদ্যা অনুযায়ী শিশু মনের ক্রমবিকাশ ও কিশোর মনের জটিলতা ও কৈশোর সমস্যা অনুধাবনের চেষ্টা করেন না—এই ধারণা বোধহয় ভুল নয়। এই কারণে, পাভলভীয় মনোবিদ্যার প্রাথমিক পরিচয় প্রদানে তুলনামূলকভাবে কিছু বেশি তথ্য পরিবেশনের প্রয়োজন আছে।

ঘণ্টা বাজানোর সংগে খাদ্যসংস্পর্শে কুকুরের লালা নিঃসরণকে যুক্ত করার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে শর্তাধীন পরাবৃত্ত গঠিত হয়—একথা আমাদের সকলেরই জানা। শর্তহীন উদ্দীপক (খাদ্য)-এর সংগে শর্তাধীন উদ্দীপক (ঘণ্টাধ্বনি) বা সংকেত কয়েকবার মস্তিষ্কে পৌছুলেই শর্তাধীন পরাবৃত্ত গড়েও ওঠে। (যেমন খাদ্য ছাড়াই ঘণ্টাধ্বনির শব্দে লালা নিঃসরণ)। "বহির্বাস্তবের ঘটনাবিশেষের সংগে স্নায়ুতন্ত্রের

---

* লিবিডো (libido) ঃ প্রথমে ফ্রয়েডবাদীরা 'লিবিডো' কথাটা কামেচ্ছা বোঝাতে ব্যবহার করতেন। আজকাল সাধারণ ভাবে 'Vital impulse' বোঝাতে কথাটা ব্যবহৃত হলেও কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে তিরোহিত হয়নি।

মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে জীবদেহের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে পরাবর্ত বলে। 'নির্দিষ্ট' কথাটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বহির্বাস্তবের বিশেষ উদ্দীপকটি যতবারই প্রয়োগ করা হোক না কেন, ততবারই একটি 'নির্দিষ্ট' প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে; অন্য কোনো উদ্দীপকে সেই নির্দিষ্ট সাড়া জাগবে না। এই প্রতিক্রিয়া বা সাড়া স্নায়ুতন্ত্রের এক নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফল। অর্থাৎ কার্যকারণ সব সময়েই নির্দিষ্ট।" এখানে জানানো উচিত যে পরাবর্ত বা রিফ্লেকস দুধরনের। কিছু পরাবর্ত বংশগত সূত্রে পাওয়া শর্তহীন পরাবর্ত। এগুলি প্রধানত প্রজাতিকে টিঁকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এগুলো ব্যক্তি নিরপেক্ষ। শর্তহীন পরাবর্তকে সাধারণভাবে সহজাত প্রবৃত্তি বলা হয়। এই সব পরাবর্ত নিয়ে জীব জন্মগ্রহণ করে। প্রাণীর বেলায় শর্তহীন পরাবর্তের দুটি প্রধান কাজ। এক—ব্যক্তি রক্ষামূলক পরাবর্তের সাহায্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে; দুই—প্রজাতি-সংরক্ষক পরাবর্ত, যার দরুণ বিশেষ বয়সে, বিশেষ ঋতুতে বা সময়ে পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণী মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়—মিলনের ফলে সন্তান জন্মায়, বংশধারা রক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই শর্তহীন পরাবর্তের অস্তিত্ব সম্পর্কে পাভলভ-পূর্ব বিজ্ঞানীরাও অবহিত ছিলেন। পাভলভ তাঁর পদ্ধতিতে পরীক্ষানিরীক্ষা করে শর্তাধীন পরাবর্তের বা নতুন অভ্যাস আয়ত্তের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে যুগান্তকারী এক আবিষ্কার করলেন। তিনি মানুষের পরিবেশকে দুদিক দিয়ে বিচার করলেন। একদিক আপেক্ষিকভাবে স্থানু, আর একটা দিক পরিবর্তনশীল। পরিবেশের এই দুই দিকের সংগে অভিযোজন দুই ধরনের রিফ্লেক্স বা স্নায়ু প্রক্রিয়ার কাজ। এরা, মানে এই শর্তহীন ও শর্তাধীন পরাবর্ত কিন্তু মোটেই নিরপেক্ষ নয়, পরস্পর সম্পর্কিত। শর্তহীন পরাবর্তকে ভিত্তি করেই শুধু শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে।

শারীর ক্রিয়া আর মনন ক্রিয়া—প্রাণীর সবরকমের ক্রিয়াকলাপই পরাবর্ত-ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স। পাভলভ-পূর্ববর্তী যুগের বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর ধারণা ছিলো যে মননক্রিয়া বিশেষ করে মানবমনের ক্রিয়াকলাপ জটিল রহস্যে ভরা। শেরিংটনের মত বিশ্ববিখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী মনে করতেন—নীচুর ধাপের প্রাণীদের সব কার্যকলাপ পরাবর্ত তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে, কিন্তু মানবমনের ব্যাপারে পরাবর্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা অচল। মানবমনের কোনো বাস্তব অধঃস্তর (material substratum) বা ভিত্তি আছে; একথা পণ্ডিতেরা

মানতে চাইতেন না। কাজেই মানুষের মানসিকতার ব্যাখ্যায়—আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিতেন। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়া যেন দুটি সমান্তরাল রেখা, তারা পরস্পরকে হয়তো প্রভাবিত করে, কিন্তু তাদের সঠিক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভবপর নয়। পাভলভ মননক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিলেন। শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়ার পার্থক্য ও সাদৃশ্য নির্ণয় করলেন। মস্তিস্কভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন ঘটলো।

শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়ার মধ্যে পাভলভ সীমারেখা টেনেছেন এই ভাবে ঃ

শর্তহীন পরাবর্ত শারীরক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট নিদর্শন, প্রাণী জন্মমুহূর্ত থেকেই এই শারীরক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম। এই ক্রিয়া স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট। একই জাতের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দীপক প্রতিবারই একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়। শর্তাধীন পরাবর্ত মননক্রিয়ার নিদর্শন। এই পরাবর্ত অস্থায়ী ও বহু শর্তের উপর নির্ভরশীল। শারীরক্রিয়া বা শর্তহীন পরাবর্ত উদ্দীপক পদার্থের মৌলিক বা মুখ্য গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল আর শর্তাধীন পরাবর্তের সঙ্গে উদ্দীপকের মৌলিক গুণের কোনো সম্পর্ক নেই। ঘণ্টাধ্বনি শুনে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছাড়া যে লালা নিঃসরণ-সেই প্রতিক্রিয়া প্রাথমিক মননক্রিয়ার উদাহরণ। এই ধর্ম নিয়ে জীব জন্মায় না। এ-ধর্ম জীবদ্দশায় অর্জিত। কোনো মননক্রিয়াই জাতির সকল প্রাণীর মধ্যে সমান ভাবে পরিদৃষ্ট হয় না শর্তাধীন পরাবর্ত মানেই ভঙ্গুর ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যসূচক। পরিবেশ পরিবর্তনের সংগে পুরোনো পরাবর্তের প্রয়োজন থাকে না, কাজেই পরাবর্তটি কিছুকালের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের প্রয়োজনে নতুন পরাবর্ত গড়ে ওঠে। পুরোনো পরাবর্তটি কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যায় না ; তার রেশ বা ছাপ (trace) থেকে যায়। পুরোনো পরিবেশ ফিরে এলেই আবার পুরোনো ধর্মটি অতি সহজেই গড়ে ওঠে। ছোটো প্রাণী থেকে শুরু করে বিবর্তনের উচ্চতম ধাপে অবস্থিত মানুষের সর্বপ্রকার মানসিকতা মস্তিস্কাশ্রিত। প্রায় ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই উত্তেজনা নিস্তেজনা ক্রিয়ার মাধ্যমে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে, ভেঙ্গে পড়ে। পরিবেশ পরিবর্তনের সংগে অভিযোজন ক্ষমতা বিকশিত হয়। এই ভাবে নতুন মানসিক ধর্মের উন্মেষ ও বিলোপ ঘটে।

মানবমন সম্পর্কে পাভলভীয় ধারণা কয়েকটি মৌলিক সূত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যায়। (ক) মন মস্তিষ্ক নামক বস্তুর ক্রিয়া শুধু

নয়, বাইরের বস্তুজগতের প্রতিফলন। (খ) মানবমন জৈবিক বিবর্তনের ফল মাত্র নয়, সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগে সংগে মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। মস্তিষ্ককিয়া ও মননকিয়া জটিলভাবে সম্পর্কিত পরস্পরের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও পরিব্যাপ্তি বিদ্যমান। মন ও মস্তিষ্ক দুইই সত্য; কিন্তু মন ও মস্তিষ্ক সমার্থবাচক নয়। মস্তিষ্ক বস্তুর বিবর্তনের ফল ও বাস্তব (material); মন কিন্তু মস্তিষ্কের মত 'মেটিরিয়েল' নয়। (গ) মনস্তত্ত্ব শুধু জীববিদ্যার অন্তর্গত নয়। সমাজবিদ্যা ও সামাজিক-ঐতিহাসিক বিদ্যার সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। (ঘ) মানবমন গুণগতভাবে পশুমন থেকে স্বতন্ত্র। মস্তিষ্কের দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশের সংগে এই পার্থক্য স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে। ভাষা মানুষকে দিয়েছে বাক্‌ভিত্তিক উচ্চস্তরের চিন্তাক্ষমতা ও কল্পনা-শক্তি আর সংকেতকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার ও প্রয়োজন-মাফিক সংশ্লেষণের ক্ষমতা। বাক্‌শক্তির মূর্তকে বিমূর্ত, বিশেষকে সামান্য করার ক্ষমতা প্রতিপদে আবার ইন্দ্রিয়ভিত্তিক প্রথম সাংকেতিক স্তরের সাহায্যে পরীক্ষিত হ'য়ে থাকে। তার ফলে বাস্তবের প্রতিফলন আরও বাস্তবানুগ হ'য়ে ওঠে। চৈতন্যে সত্তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। ইতিহাস শুধু মানসিকতার বিবর্তন ঘটায় না, মননকিয়ার নিয়মও পরিবর্তিত করে। মানুষের মস্তিষ্কে এই দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরে অস্তিত্বের দরুণ মানবীয় চিন্তাভাবনা, চেতনা ইত্যাদি উচ্চাংগের মানসিক ক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়েছে এবং ফলে রহস্যবাদের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত পড়েছে। এই কারণেই বোধহয় বেশিরভাগ বিদেশী লেখক পাভলভের এই বিশেষ মূল্যবান আবিষ্কার সম্বন্ধে নীরব। তাই তাঁদের চোখে পাভলভীয় মনোবিদ্যা ও ওয়াটসন-স্কিনারের যান্ত্রিক ব্যবহারবাদ সমগোত্রীয়। (ঙ) বাস্তব-জগতের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ ভাবনাচিন্তার আধেয় বা বিষয় (content) আহরণ করে। এই অভিজ্ঞতা আবার সামাজিক কিয়াকাণ্ডের সংগে জড়িত। মানব চৈতন্য শর্তাধীন পরাবর্তের ফলে উন্মেষিত হয়, শর্তাধীন পরাবর্ত আবার শর্তহীন পরাবর্ত বা সহজ প্রবৃত্তিভিত্তিক। কিন্তু তা বলে মানুষের আচরণ ব্যবহার মূলে নির্জ্ঞান বা অবদমিত কামনার কোনো ভূমিকা নেই। চৈতন্য অপরিস্ফুট থাকতে পারে, তার ব্যাপ্তি ও বিস্তারের সবদিক সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে

চৈতন্যের সম্যক উন্মেষ ঘটানো সম্ভব। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের বিচারে চৈতন্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ফ্রয়ডীয় নির্জ্ঞানের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। (Wortis, Soviet Psychiatry, Williams & Wilkins, Baltimore, U.S A.. 1950. Pp 23-24)।

পাভলভ মন সম্পর্কে কোনো পূর্বনির্ধারিত ধারণার বশবর্তী না হ'য়ে তাঁর বৈপ্লবিক 'ক্রমিক' পদ্ধতিতে স্নায়ুপ্রক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তারপর শর্তাধীন পরাবর্তের সাহায্যে মস্তিষ্কের কিছু সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম আবিষ্কার করেছেন। ক্লিনিকে মানব মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও পশু মস্তিষ্কের সংগে তার পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। নতুন ঘটনা বা তথ্য যখন তত্ত্ব বা সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়নি তখন সূত্র ও তত্ত্বকে আবার নতুন করে সংশোধিত করেছেন। পাভলভের অনুসন্ধান ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বিষয়-মুখীন বা 'অবজেক্টিভ।

এবার ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলছি। জীবনের শেষ কুড়ি বছর - ফ্রয়েড তাঁর 'সাইকোএ্যানালিটিক' বা মনোসমীক্ষণ তত্ত্বকে নানাভাবে সম্প্রসারিত করেছেন, নিজের মতবাদকে দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন : নাম দিয়েছেন, অধিবিদ্যা বা মেটাসাইকোলজি। (S. Freud, Beyond Pleasure Principles 1950)। মস্তিষ্ক বা স্নায়ুবিজ্ঞানের যথেষ্ট জ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠতে পারেনা,—এই ধারণা তিনি একসময়ে পোষণ করতেন। মানসিকতা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সংগে সম্পর্কিত—গবেষণা এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—এ কথা তাঁর লেখার মধ্যেই পাওয়া যায় (Freud, Collected Papers, vol. IV, London, 1953, P 107)। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, যেহেতু মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানিনা, সেহেতু মনস্তত্ত্বের বিকাশে মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের সাহায্য নেবার কোনো প্রয়োজন নেই, এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে আর্নষ্ট জোনসের লেখা (Life and Works of Sigmund Freud, 'New York, 1953) থেকে। শেষ জীবনে তিনি নির্জ্ঞান (The unconscious) অবচেতন (Preconscious), সংজ্ঞান (Conscious) বা চেতনার পরিবর্তে নতুন পরিভাষা ব্যবহার করলেন। পুরনো পরিভাষা অভিভাবক পাহারাদারের (Censorial guardian) নাম দিলেন 'সুপার ইগো', বিজ্ঞানকে 'ইদ' (Id) বলে অভিহিত করলেন। আর সংজ্ঞানের নাম দিলেন 'ইগো' (ego)। 'ইগো'

বা চৈতন্য যুক্তির আলো দিয়ে সবকিছুর বিচার করে। 'সুপার ইগো' বা অধিশাস্তা পুরোনো বিবেকের পোষাকী নাম। 'সুপার ইগো, গঠিত হয় 'ইগোর' ওপর ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধের প্রভাবে, আর ইদ্ বা অদস্ সেই আদিম যুগের অযৌক্তিক, অজ্ঞেয় অপ্রতিরোধ্য সহজাত প্রবৃত্তির ফ্রয়েডীয় পরিভাষা। ফ্রয়েডের মতে বিদ্যাবুদ্ধি, যুক্তিবিজ্ঞান মানুষকে পরিচালিত করে না, আসলে 'ইগো' বা অহং জানে না যে সে অদস্-এর প্রচ্ছন্ন অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হচ্ছে। ফ্রয়েডের সহজাত প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্ব মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। মন যে 'ইদ্' 'ইগো' ও 'সুপারইগো'—এই তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত—এর সমর্থনে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ উপাত্ত বা বিজ্ঞানানুমোদিত যুক্তি নেই। প্রকোষ্ঠভিত্তিক কল্পনাকে আশ্রয় করে ও অবদমন (repression) কে সবরকম মননক্রিয়ার জনক হিসাবে গণ্য করে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। ফ্রয়েড অনুগামীরা মনে করেন যে পরীক্ষানিরীক্ষা ভিত্তিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিতে স্নায়ুসংস্থার ক্রিয়াকলাপের জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু জটিল মননক্রিয়ার ব্যাখ্যা মেলেনা। ফ্রয়েডের সর্বরতিবাদ (pansexuality) অনুসারে শৈশবের সবকিছু ইচ্ছা ও আচরণ যৌনতামূলক—কিন্তু যৌনাংগের সঙ্গে সেই ইচ্ছার সম্পর্ক থাকতেই হবে—এমন নয়। যৌন প্রবৃত্তিমূলক শক্তিকেই ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় বলা হয়েছে—'লিবিডো'। বিজ্ঞানীরা যে সময়ে জড়জগতের তাপশক্তি, চুম্বকশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি যান্ত্রিক শক্তির সন্ধানে ও চর্চায় রত, সেই সময়ে ফ্রয়েড মানসলোক পরিচালক এই 'লিবিডো' শক্তিকে আবিষ্কার করেন। শৈশব যৌনতার বিকাশ ও ক্রমপরিণতির মাধ্যমে ফ্রয়েডের নক্সামাফিক ব্যক্তিমানস গড়ে ওঠে। এই ক্রমপরিণতির কয়েকটি স্তর নির্ণয় করেন ফ্রয়েড। প্রতিটি স্তরে লিবিডো বিভিন্ন প্রত্যংগের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্নভাবে তৃপ্তি লাভ করে। এই তৃপ্তি লাভই (Pleasure Principle) লিবিডোর প্রধান বা একমাত্র কাম্য। জীবনের প্রথম বছর মৌখিক স্তর (Oral stage); এই সময়ে লিবিডো চুষে আনন্দ পায়। জীবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে গুহ্যদ্বার পথে মল ত্যাগে লিবিডো আনন্দলাভ করে; এই স্তরকে পায়ু স্তর (Anal Stage) বলে। পরে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত লিংগ(Phallic) স্তর। এই সময়ে যৌনাংগ নাড়াচাড়াতেই লিবিডোর তৃপ্তিলাভ হয়। এরপর কয়েক বছর চুপচাপ থাকার পর কৈশোর অন্তে উদ্গত যৌন স্তরে

বিপরীত লিংগের সংগে মিলনে লিবিডোর আনন্দ। বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণের পূর্বে প্রায়ই সমকাম (homo-sexual) পর্বের আবির্ভাব হয়। সমকামিতা প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবে বিকশিত হতে পারে। লিবিডো আবার অবস্থা বিশেষে শিশুর সারাদেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই অবস্থা যদি পরিণত বয়স অবধি বিদ্যমান থাকে তা'হলে ব্যক্তি আত্মপ্রেমে নিমগ্ন হ'য়ে পড়ে। এই স্তরটিকে বলা হয় 'নারসিসিস্টিক' (Narcissistic) স্তর। এক স্তর থেকে অন্য স্তরের উত্তরণ যদি বাধা না পায়, স্বচ্ছন্দ ভাবে ঘটে যায়, তাহ'লে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। অন্যথায় মানসিক বিকার—বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

কৈশোর প্রাপ্তির ও কৈশোর সমস্যার আলোচনায় ও বিশ্লেষণে শর্তাধীন পরাবর্ত ভিত্তিক বিষয়মুখী ও লিবিডো ভিত্তিক বিষয়ীমুখীন অন্তর্দর্শন-বাদী—দুই পদ্ধতিরই প্রয়োগ দেখা যায়।

এই অধ্যায়ের কিছু অংশ ও পরবর্তী একটি অধ্যায়ে সামান্য অংশ 'মানব-মন' মুদ্রিত লেখকের একটি রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই রচনাটির অংশবিশেষ লেখকের 'পাভলভ পরিচিতি' (১ম পর্ব—দ্বিতীয় সংস্করণ) বইটিতেও মুদ্রিত হয়েছে। যাঁরা দুটি বইই পড়বেন তাঁরা লেখকের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করবেন।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে এই দশকে জীনের প্রভাব নিয়ে যে সব পরীক্ষানিরীক্ষা ও সমীক্ষা চালানো হয়েছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরো কিছু তথ্য পরিবেশন করা দরকার। মানসিক গুণ উন্মেষে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, এই দলের সমীক্ষকরা মনে করেন, পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত মানসিক ও চারিত্রিক সংগঠনে জীনের প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। এই মতাবলম্বী মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু সোভিয়েত পন্ডিতও আছেন। সাধারণভাবে লাইসেংকোর তত্ত্বকে জুলিয়ান হাক্সলী থেকে শুরু করে কিছু সোভিয়েত বিজ্ঞানকর্মীরা যখন একপেশে ও গ্রহণীয় নয় বলে মত প্রকাশ করলেন, তখন থেকেই মর্গান তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু সোভিয়েত পন্ডিতদের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিল (T. H. Morgan, The Scientific Bases of Evolution, New York, 1932)। মর্গানের উদ্ধৃতি পাওয়া গেল সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের লেখায়।[১] অবশ্য তাঁরা জীন-পরিবাহিত বৈশিষ্ট্যকে

[১] "There are, then, in man two processes of inheritance :

কোনো সময় অপরিবর্তনীয় বা শাশ্বত মনে করেননি। তাঁরা বললেন, দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের মাধ্যমে জীবন-অভিজ্ঞতা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরিবাহিত হয়েছে সেই আদিম যুগ থেকে যখন মানুষ প্রথম ভাষার সাহায্যে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করেছে ; এবং এখনও এই ভাবে ভাব বিনিময় অব্যাহত রয়েছে। এই ভাবেই সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে এই ভাবে অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞান প্রেরণকে একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী নাম দিয়েছেন—সংকেতবাহী বংশগতি বা signalling heredity।[১] আর একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, যৌন পদার্থ মাধ্যমে পরিবাহিত গুণগুলোকে 'বংশগতি প্রভাবিত' বলা উচিত আর শিক্ষা প্রভাবিত মানসিকতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিকে বলা উচিত 'অনুবৃত্তি প্রভাবিত'।[২] অথবা একে বলা চলে সামাজিক উত্তরাধিকার (social inheritance)।

মানব প্রজাতির জৈব-সামাজিক ক্রমোন্নয়নের পথে ক্রমশ সামাজিক সূত্রে পাওয়া উপাদানের প্রভাব বৃদ্ধি হতে থাকে। এই ধরনের আভাস আমরা আগেই পেয়েছি পাভলভের ল্যাবরেটরীতে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে। আমরা জানতে পারি যে, কোনো শর্তাধীন পরাবর্ত কয়েক প্রজন্ম ধরে গঠিত হলে ক্রমশ শর্তহীন পরাবর্তে রূপান্তরিত হতে পারে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ক্রমোন্নয়ন, মানসিকতার পরিবর্তন, ব্যক্তিগত দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশ পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের প্রভাব-সামাজিক বংশগতির উন্মেষের ফল। আর এই 'social inheritance'-এর মূলে আছে মানব-মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ ধর্ম নমনীয়তা ও সংযোজন-ক্ষমতা—এক কথায়, পরাবর্ত গঠনের প্রবণতা।

---

one through the physical continuity of the germ cells ; and the other through the transmission of the experiences of the generation to the next by means of example and by spoken and written word". (Morgan, The Scientific Bases of Evolution., New York, 1932, p, 215).

১ M. Lobashev, Genetics, Leningrad, (in Russian) p. 7, referred by Dmitri Lebayev in Social Sciences, Moscow, 1982 Vol. I, p. 75.

২ S. N. Davidenkov, Evolutionary & Genetic Issues of Neuropathology, Leningrad, 1947, pp. 109—Ibid.

জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যতই বেড়েছে, ততই সেই প্রাচীন কালে সামাজিক পরিবেশের উদ্দীপক মস্তিষ্ক ধর্মকে প্রভাবিত করেছে, অতি-নমনীয় ও সহজ সংযোজনক্ষম মস্তিষ্কের জেনেটিক প্রোগ্রাম প্রণয়নে সমাজ-সংস্কৃতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে (Social Sciences, Moscow, 1982, No. 1, p. 73)। অবশ্য এ কথাও মনে রাখা দরকার যে সামাজিক চেতনা ও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা গঠনে শুধুমাত্র সামাজিক পরিবেশের প্রভাবই কাজ করে ভাবলে ভুল হবে—বলেছেন আর একজন সোভিয়েতের বিজ্ঞানী।[১] সামাজিক ও জৈবিক বংশগতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জৈব ধর্মকে পুরোপুরি পরিহার করতে পারে না সামাজিক উদ্দীপক। প্রসঙ্গত বেলিয়ায়েভ বলেছেন, মানবসত্তা অধ্যয়নে এই কথা মনে রাখা দরকার যে, জৈব-সামাজিক মানবপ্রকৃতির উপর জৈবিক ও সামাজিক উদ্দীপকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, সামগ্রিকভাবেই বিচার করা উচিত।[২]

এই দশকের অন্য যে সব তথ্য দ্বারা এই কালের জীন-বিশেষজ্ঞরা প্রভাবিত হচ্ছেন, সেই সব তথ্যের বিশ্লেষণ, বিচার এবং তা থেকে নতুন তত্ত্ব বা প্রকল্প প্রণয়নের ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। একই সামাজিক পরিবেশে, আমরা জানি, বিভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায়। তাদের অনেকের থাকে পরার্থিতা (altruism), গোষ্ঠী

---

১ In analysing individual behaviour, there is need for a differentiated approach that would take into account both the social and biological (natural in general) conditions which in inseparable interaction determine that behaviour. (P. Fedosyev, The Problem of the Social and Biological in Philosophy & Sociology, 1977, Quoted by Belyayev, Ibid, p- 26).

২ To my mind, a major study in the essence of man and the prospect of his future is largely in realising the inseparability of the interaction of the social and biological in a common biosocial human nature, as well as the historical dynamics of this interaction and its concrete manifestations at various stages of human history, past and present.(Ibid).

ও সমাজের প্রতি আনুগত্য ও অনুগামিতা, আবার কিছু ব্যক্তির মধ্যে থাকে অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, অননুগামিতা, অসামাজিক নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার প্রতি আসক্তি ও হিংসাশ্রয়ী মনোভাবের প্রাধান্য। এ ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য সব কালের সব সমাজেই পরিলক্ষিত এবং সৃজনধর্মী ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা একই পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে বিকশিত। অতিমাত্রায় শোষণধর্মী ও বিষম সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত কিশোরদের মধ্যেও আমরা পরার্থবাদিতার উন্মেষ দেখতে পাই, আবার অনেক বেশি সুস্থ সামাজিক পরিবেশে অসামাজিকতা ও অননুগামিতার প্রকাশ দেখতে পাই কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে। কী ভাবে এর ব্যাখ্যা করা যায়? ইতর প্রাণী নিয়ে যে ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করা যায়, মানব শিশুর ওপর সে ধরনের [অন্য সমস্ত উদ্দীপককে বাদ দিয়ে, বিশেষ একটি উদ্দীপকের দরুণ আচরণ ও মানসিকতার বিকাশ] পরীক্ষানিরীক্ষা সম্ভব নয়; কাজেই জন্মগত জীন-বৈশিষ্ট্যমূলক ও পরিবেশনির্ভর গুণাগুণের পার্থক্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

এ-সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে যমজের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে জীন-প্রভাবিত মানসধর্মের অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় (Science, 1963, Vol. 142, No, 3598) দুজন লেখক এক ডিম্বকোষী (monozygotic) যমজদের নিয়ে প্রায় ৫০ জন গবেষকের তথ্য সন্নিবিষ্ট করে দেখিয়েছেন যে বংশগতি বুদ্ধ্যংককে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে একজন সমীক্ষক (L. Wellerman, American Psychology, 1979) এই ধারণাকেই সমর্থন করেছেন : তার মতে বুদ্ধ্যংকের মাত্র এক পঞ্চমাংশ পরিবেশ প্রভাবিত, বাদবাকী পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে বংশানুক্রমিক ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত। একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী ৫৭ জোড়া এক ডিম্বকোষী (monozygotic) যমজ ও ৬১ জোড়া দুই ডিম্বকোষী (dizygotic) যমজ নিয়ে (এদের বয়স ছিল ৭ থেকে ১৬) পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে কিছুটা একই ধরনের সিদ্ধান্তে এসেছেন (Constantinova, "A study of the Intellectual Activity of the Twins, Communication 11, Heredity and Environment", Genetika, 1980, Vol 16, No. 2. pp. 351-59—ref. Social Sciences, Moscow, 1982, Vol I, p 76)। মনে রাখা দরকার বুদ্ধ্যংক নির্ণয় পদ্ধতি দ্বারা মানসিকতার বহুমুখীন চরিত্রের একটি দিক মাত্র নির্ধারিত হয়ে থাকে।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালের সোভিয়েত মনস্তাত্ত্বিকদের একাংশ মনে করেন, মানসিকতার বহুলাংশেই জীন-প্রভাবিত বা বংশানুক্রমিক সূত্রে প্রাপ্ত। বিভিন্ন মস্তিষ্কের ইলেক্‌ট্রো-এনসেফালোগ্রাফের বৈশিষ্ট্য তাঁদের মতে জেনেটিক পার্থক্য-প্রসূত (Problems of Genetic Psychophysiology. Moscow, 1980, ref : Ibid)। যদিও তাঁরা মনে করেন, সামাজিক আদর্শ, অনুপ্রেরণা ও সামাজিক শিক্ষাই ব্যক্তিমানসিকতা ও চরিত্রের নিয়ামক ও নির্ধারক, তবুও বংশসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাঁরা মনে করছেন যে বিভিন্ন প্রবণতাবিশিষ্ট শিশুদের জন্য একই ধরনের পাঠক্রম বা 'স্ট্যাণ্ডার্ড' কোনো শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। আবার প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষাদান ব্যবস্থা গ্রহণ যে-কোনো সমাজব্যবস্থার পক্ষে খুবই কঠিন। এই সব জীনভিত্তিক নতুন তথ্য দিয়ে পাভলভ বর্ণিত মস্তিষ্কের টাইপ-এর ব্যাখ্যা বোধহয় সম্ভব, কিন্তু এ ধরনের কোন ব্যাখ্যা আমাদের নজরে পড়েনি। জীনভিত্তিক এইসব বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও ব্যক্তির আচরণ, প্রক্ষোভ ও অন্যান্য মানসিক ধর্মের আকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও পরিবর্তন সম্ভব বলেই অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক মনে করেন।

সারাংশ

মানবজীবনের শুরু স্ত্রীডিম্বকোষ পুরুষের শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হবার পর থেকে। নিষিক্ত কোষটি ক্রমশ বিভাজিত হতে থাকে। কিছুকাল পর থেকে বিভিন্ন সংস্থার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আভাস ফুটে ওঠে। মাতাপিতার কাছ থেকে পাওয়া বংশগতির নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে শিশুর বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এই ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। নেকড়ে দ্বারা কয়েক বছর পালিত মানবশিশুকে অনেক চেষ্টা করেও মানবিক করা যায়নি ; দুপায়ে হাঁটা, কথা বলা ইত্যাদি তারা শিখতে পারেনি।

গত কয়েক বছরে কোষ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। কোষের দুটি অংশ, নিউক্লিয়স ও সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেকদিনের। ছোটো ছোটো লাঠির মত দেখতে ক্রোমোজোমের অবস্থান ঐ নিউক্লিয়সের মধ্যে। বিভিন্ন প্রাণীর ক্রোমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন। মানুষের থাকে 23 জোড়া ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোম এক বিশেষ ধরনের অণু ডি. এন. এ-এর সমষ্টি। 23 জোড়ার প্রতিটি জোড়ায় থাকে

একটি মা ও অন্যটি বাপের কাছ থেকে পাওয়া ক্রোমোজোম। ডি. এন-এ. তে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সংকেত লিপিবদ্ধ থাকে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মাতাপিতার মিলনের ফলে ক্রোমোজোমের সংযুক্তি লক্ষ রকমের হতে পারে; কাজেই একই মাতাপিতার সন্তানদের মধ্যে অজস্র রকমের ব্যক্তিপার্থক্য দেখা যায়। সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে বলা হয়: ডি. এন-এ থেকে আর. এন-এ তৈরী হয়; আর. এন. এ. থেকে তৈরী হয় প্রোটিন। অতি জটিল ও আধুনিক গণকযন্ত্রের চেয়েও ডি. এন এ-র ক্ষমতা অনেক বেশি ও কার্যকলাপ জটিল ও বিস্ময়কর।

জন্মপূর্ব পরিবেশ নিঃসন্দেহে ভ্রূণকে প্রভাবিত করে। কিছু বিজ্ঞানী এই মত প্রকাশ করেছেন, যে, জন্মের পর প্রথম সপ্তাহ থেকেই শিশু পরিবেশের সঙ্গে ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। অভিযোজনক্ষমতা যাদের বেশি তাদের পক্ষে জীবনে মোটামুটি সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকে।

পাভলভীয় মনোবিদ্যা সম্পর্কে ইংরিজি ও বাংলা পুস্তকে খুব কম কথা লেখা আছে। এইজন্য এই অধ্যায়ে আমরা পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব নিয়ে একটু বেশি আলোচনা করেছি, তা বলে অন্যান্য মতবাদকে আমরা অবহেলা করিনি। সমাজতান্ত্রিক দেশের অতি-আধুনিক কিছু তথ্য পরিবেশন করতে পেরেছি। সেখানে যে অন্তত বর্তমানে মনোবিদ্যার আলোচনায় গোঁড়ামি নেই—এই ধারণা এই অধ্যায়ের শেষ অংশ পড়লে সকলেরই মনে জন্মাবে।

জীনভিত্তিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ব্যক্তির আচরণ, প্রক্ষোভ ও অন্যান্য মানসিক ধর্মের আকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব ও পরিবর্তন ঘটানো যায়: এই অভিমত আমরা পোষণ করি।

উৎস:—

(1) Beadle G.W., Britannia, Chicago, 1964.

(2) Gasell A. and Amatruda C., The embryology of behaviour, Newyork 1945.

(3) Eiduson S. & Geller E, American Journal of Psychiatry, 1962.

(4) Murphy & Associates., Widening world of childhood, Newyork 1962.

(5) Gangopadhyaya D. N., Pavlov Parichiti (Bengali) Calcutta 1976.

(6) Wortis, Soviet Psychiatry, Williams & Wilkins, Baltimore U. S.A., 1950.

(7) Freud S. Collected Papers, Vol IV, London, 1953.

(8) Jones, Life and works of Sigmund Freud ; Newyork 1953.

(9) Morgan, The Scientific Basis of Evolution, Newyork, 1932.

(10) Lobashev. M., Genetics, Leningrad (in Russian) referred by Dmitri Lebayev.

(11) Davidenkov S. N., Evolutionary and Genetic Issue of Neurophysiology, Leningrad, 1967.

(12) Fedosyev P., The Problem of the Social and Biological in Philosophy and Sociology, Moscow, 1977.

(13) Manob Mon (Beng) Calcutta. Oct-Dec, 1982.

সহায়ক পুস্তক :

(1) Piaget Jean, Genetic Approach to the Psychology of Thought ; Journal of Educational Psychology 1961, 52·275 281.

(2) Nancy Baylay. 'Individual Patterns of Devolopment' Child Development, 1956, 27. 45-74

(3) Murray, H. A. Thematic Apperception Test Manual Cambridge Mass, Harvard University Press, 1943.

(4) Kagan. J. & Moss H. A., The Stability of passive and dependent behavior from childhood through Adulthood ; Chiid Development, 1960, 31. 577-591.

প্রশ্ন

(1) ইতরপ্রাণীর বাচ্চার তুলনায় মানবশিশু কি বেশি অসহায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে এই অসহায়তা তার জীবনসংগ্রামে টিঁকে থাকার পক্ষে সহায়ক।

(2) জীন সম্পর্কে 250 কথার একটি রচনা লেখ।

(3) মানসিক গুণাবলী জীন-প্রভাবিত কিনা? এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য জানাও।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবেশের প্রভাব

সেকালের মত বংশগতি ও পরিবেশ, 'নেচার' বনাম 'নারচার' নিয়ে আজকালকার বিজ্ঞানীরা আর তর্কযুদ্ধে নামেন না। এই দুইয়ের একক ও মিলিত প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা আজ সচেতন। মানুষের বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত বা জন্মগত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই যে পরিবেশ প্রভাবিত, এ বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। জীন-প্রভাবিত রোগ ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে আগেই এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ মাত্রেই জন্মমুহূর্ত থেকে শৈশব, যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত। আমরা এই অধ্যায়ে পরিবেশ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশন করব।

পরিবেশকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়—প্রাকৃতিক ও সামাজিক। সামাজিক পরিবেশকে আবার আর্থসামাজিক (socio-economic) এবং সমাজ-সাংস্কৃতিক (socio-cultural)—দুই দিক দিয়ে বিচার করা চলে। পণ্ডিতেরা মনে করেন বিগত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানুষের শারীর-স্থানিক বা শারীরবৃত্তিক কোনো বড়রকমের পরিবর্তন ঘটে নি। আজকের মহাকাশবিজয়ী মানবসমাজের শিশু এবং বিশ হাজার বছর আগেকার কাঁচামাংসভোজী সমাজের শিশুর মধ্যে জীনগত বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। অতীতের বর্বর যুগের সেই পাহাড়ের গুহায়

জাত শিশুকে আজকের মস্কো এবং নিউ ইয়র্কে কোনো বিশেষ জ্ঞানীগুণীর পরিবারে রেখে যদি মানুষ করা যেত, তাহলে সে ১৯৮২ সালে মস্কো বা নিউইয়র্কে জন্মেছে যে শিশু, উত্তরকালে তার মতনই একজন পরমাণু-বিজ্ঞানী অথবা ব্যালেনর্তকী হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তখন জন্মেছিল বলে বর্বর যুগের শিশুটির শিকারী বা ঐ জাতীয় কিছু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আজকেও আফ্রিকার বনে জংগলে, মেরুদেশে বা উষর মরুতে অথবা ঐশ্বর্যশালী নগরীর কদর্য বস্তিতে জন্মালে আজকের সভ্যতা সংস্কৃতি সমৃদ্ধ যুগেও শিশু তার জন্মগত সম্ভাবনার ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী হতে পারে না। মানব প্রকৃতিজাত গুণ ও ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশে পরিবেশের ভূমিকাই প্রধান। এ্যালডুস হাক্সলি এই ভূমিকার কথা তাঁর একটি লেখায় খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন (**Human Potentialities – Science and Human Affairs, California, 1965, p. 64**)।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

প্রকৃতি সদয় না নির্দয়? অল্পায়াসে খাদ্য সংগ্রহ বা উৎপন্ন করা যে পরিবেশে সম্ভব, তাকে সদয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর বিপরীত পরিবেশকে নির্দয় বলা হত। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে সদয় নির্দয়ের মধ্যে আগেকার মত তফাৎ না থাকলেও সদয় প্রাকৃতিক পরিবেশের খোঁজে ভ্রাম্যমান মানবগোষ্ঠীর দেখা না মিললেও, এ কথা আজও বলা চলে মানুষের দেহের গঠন, গায়ের বা চুলের ও চোখের রঙ, তার হৃদ্‌পিণ্ড ও অন্যান্য অনেক কিছু প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। শারীরিক অনেক বৈশিষ্ট্য যে বাসস্থানের জলবায়ু, তাপাংকের ওঠানামা, উচ্চতা, জমির উর্বরাশক্তি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদির সংগে সম্পর্কিত—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শক্তি সামর্থ্য, কষ্ট সহ্য করা ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা ইত্যাদি কিছু কিছু মানবিক ধর্মও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে কমবেশি হয়—এ কথাও সকলেই মেনে নেবেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার, বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে মানবপ্রজাতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। মহাকাশ বিজয়ের সাফল্যই মানুষের চরম অবস্থার সংগে অভিযোজন ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু মানসিকতার উপর

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব খুব বেশি নয়—এ বিষয়ে অনেকেই প্রায় একমত। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে - যেখানে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি, সেখানকার লোক শ্রমবিমুখ হয়, তাদের মেজাজ সামান্য কারণেই বিগড়ে যায়; যেখানকার চাষের জমিতে পলি পড়ে ও জলের অভাব নেই, সেখানকার চাষীরা আয়াসপ্রিয় হয়—এইসব ধারণা একেবারে মিথ্যে নয় বলে মনে হয়। এইসব নিয়ে খুব কম কাজই হয়েছে। ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ডের "দ্য এ্যাচিভিং সোসাইটি (Mc. Clelland D C, The Achieving Society, Princeton N. J. 1961)-তে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে তাপমাত্রা খুব বেশি বা খুব কম হলে কাজ করবার প্রেরণা (motivation) বা উৎসাহ থাকে না; মাঝামাঝি মাত্রার তাপমাত্রা যেখানে, সেখানকার অধিবাসীরা কর্মঠ ও সফল। আবার এও বলা হয় যে শিশুরা যদি অল্পবয়স থেকেই চরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ হয়, তারা পরিবেশের সংগে মানিয়ে নেবার বেশি ক্ষমতা অর্জন করে। এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে শৈশব অতিবাহিত যে শিশুর, কৈশোরে পদার্পণ করার পর তার চরিত্রে তার মানসিকতায় এই কঠোর প্রতিকূলতার ছাপ পড়বে—এটাই স্বাভাবিক। অস্বাস্থ্যকর বস্তির পরিবেশে অথবা পাহাড়ে জঙ্গলে খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবের সঙ্গে নিত্য লড়াই করতে হয় যে সব কিশোরদের তাদের হাবভাব, স্বভাবচরিত্রের মধ্যে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত পরিবারের আদরে লালিত শিশুর নমনীয়তা না থাকারই কথা। কিন্তু বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ্, সমাজতত্ত্ববিদদের প্রতিবেদনে, প্রবন্ধে, পুস্তকে বিভিন্ন ধরনের মতামত দেখা যায়। যারা পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে থেকে কাজ করেছেন তাঁরা অনেকেই অতিকঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকা, প্রায় সব রকমের শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত, প্রাক্-কিশোর ও কিশোরদের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসমন্বিত মনোভাবের বিকাশ দেখেছেন। আবার দেখা গেছে ঐ একই রকম অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে মানুষ হওয়া কিশোরকিশোরীদের মধ্যে মানসিক বিকার ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব। কোলম্যান (Psychology and Effective Behaviour, Bombay 1971) এ বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। বলিভিয়ার এক প্রাচীন যাযাবর গোষ্ঠীর সম্বন্ধে (Science Newsletter 1950 : Hunger regulates lives) বলা হয়েছে যে খাদ্যের অভাবের দরুণ তাদের মধ্যে খাবার ইচ্ছা ও লোভ মানসিক বিকারের স্তরে বিদ্যমান। একজন অপরজনকে বঞ্চিত করে

গোপনে পরিবারের জন্য রাখা সব খাদ্য খেয়ে ফেলার প্রবণতা এই গোষ্ঠীর সকলের মধ্যেই নাকি দেখা যায়। স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হলে স্ত্রীর মনোভাব বিশেষ বদলায় না, কিন্তু প্রেমিকাকে কিছু খাদ্য দিলে স্ত্রী খাণ্ডাধারণ করে তেড়ে আসেন। এই প্রতিবেদনের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ বা সংরক্ষণের তাগিদের অভাব দেখে মনে হয় না তাদের খাদ্য সম্পর্কে এতখানি লোভ থাকতে পারে। তাছাড়া এস্কিমোদের মধ্যেও খাদ্যাভাব তীব্র, কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও লোভের পরিবর্তে দেখা যায় সহযোগিতা ও সম্প্রীতি (Coleman, Ibid)।

প্রসঙ্গত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীমনের উপর কঠোর ও নিষ্করুণ পরিবেশ প্রভাব সম্পর্কে একটি সোভিয়েত পত্রিকায় প্রকাশিত সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের অভিমত এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সকলের হয়তো জানা নেই যে মানুষ যখন সাহস ও উৎসাহের সংগে প্রতিকূল পরিবেশ যথা, শত্রুর আক্রমণ, অবরোধ, বড়রের যুদ্ধ ইত্যাদির মোকাবিলা করে, যখন সে অসহনীয় দুর্বিপাক ও দুঃসময়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, যখন তার মনের ওপর প্রবল চাপ পড়ে, তখন সে বহুরকমের মানসিক রোগ ও নৈতিবাচক প্রক্ষোভজনিত শারীরিক পীড়া (রক্তচাপবৃদ্ধি, আল্সিক ক্ষত, হাঁপানি ইত্যাদি) থেকে মুক্ত থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লেনিনগ্রাদের অবরোধের সময় নগরবাসীরা অমানুষিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। খাদ্যাভাব, জ্বালানীর অভাব, অবরুদ্ধ নগরের ওপর জল স্থল অন্তরীক্ষ থেকে অবিরত আক্রমণে লেনিনগ্রাদের মানুষকে একেবারে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা চলছিল। এই সময় প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মানুষের দেহমনের এই অতিপীড়নের দরুণ রক্তচাপ বৃদ্ধি ও অন্যান্য চাপা উত্তেজনাজনিত ব্যাধির (Stress syndrome) বিস্তার হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল তা ঘটেনি, রক্তচাপ বৃদ্ধির রোগী সে সময় ছিল না বললেই চলে। ভ্যাদিম রোটেনবার্গ ও ভিক্টর আরশাভস্কি এই নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনার পর বললেন যে সক্রিয় প্রতিরক্ষামূলক আচরণ (active defensive behaviour) ব্যক্তির অভিযোজন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে রোগ আক্রমণকে প্রতিহত করে। যুদ্ধে আহত বিজেতার ক্ষত নিরাময়ে বিজিতের থেকে অনেক কম সময় লাগে (Moscow News, No. 16, 1982)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লণ্ডনের ওপর যখন অবিরাম বোমাবর্ষণ চলছিল, তখন সেখানেও, শোনা যায়, উদ্বায়ুঘটিত (neurotic) ও মানস-শারীরিকব্যাধি-

গ্রস্তের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে উদ্দেশ্যমূলক কিয়াকলাপ (Quest activity) পরিবেশের দুঃখকষ্ট, কঠোরতা সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের দাক্ষিণ্য ছাড়াই প্রাক্-কিশোর ও কিশোর বলিষ্ঠ মনোভাব ও সুস্বাস্থ্যর অধিকারী হতে পারে—যদি তার পরিবার ও পরিবেশে উদ্দেশ্যমূলক কিয়া-কলাপ, ও দঃখকষ্টের বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রামী মনোভাব গঠনের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের আর একটি দিক,—জনসংখ্যার ঘনত্বের (population density) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন আজকের মনস্তাত্ত্বিকরা। প্রধানত ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে অনেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঘনবসতি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা শিশু ও কিশোরকিশোরীরা বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে, রাস্তাঘাটে নিজেদের মানিয়ে নিতে গিয়ে খুবই অসুবিধায় পড়বে, এবং মানসিকতার দিক থেকে বিরলবসতি অঞ্চলের কিশোরকিশোরীদের সংগে তাদের অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। খাদ্যবস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি জীবন-ধারণের উপযোগী উপকরণের অভাবের কথা কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ধরা হচ্ছে না। জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ অভিযোজন ক্ষমতার অবনতি ঘটবে।

১৯৬২ সালে ক্যালহাউনের বিখ্যাত পরীক্ষানিরীক্ষার কথা অনেক লেখক উদ্ধৃত করেছেন (Population Density and Social Pathology, Scientific American, 1962. 206 (2) ; 139-50) একটা বদ্ধ জায়গায় ল্যাবরেটরীর ইঁদুরের বংশ বৃদ্ধি করার অবাধ সুযোগ দেওয়া হল। সেখানে খাবারদাবার ও বাসা বাঁধবার জিনিসপত্তরের সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল। সংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে প্রথমে মেয়ে ইঁদুর ও পরে পুরুষ ইঁদুরের আচরণে বিশৃংখলা ও বিকার দেখা গেল। বাসা বাঁধা ও বাচ্চাদের যত্ন করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্রমশ বদলে যেতে লাগল। অযত্নে বাচ্চাদের মৃত্যুহার বেড়ে দাঁড়াল শতকরা প্রায় ছিয়ানব্বই। গর্ভধারণের নিয়মশৃংখলা ভেঙে গেল। চার ভাগের এক ভাগ মেয়ে ইঁদুরের মৃত্যু হল বছর দেড়েকের মধ্যে। তারপর পুরুষের মধ্যে অসুভাবী আচরণ প্রকাশ পেল। যৌন ক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে অসুস্থতা (morbidity) দেখা দিল। সমকামিতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ইঁদুর ও অনিচ্ছুক প্রাপ্তবয়স্কদের সংগে সংগম ইত্যাদি অস্বাভাবিকতার পর দেখা দিল হিংস্রতা ও আক্রমণ করার প্রবণতা। মৃত্যুহার বাড়ল, জন্মহার কমতে লাগল। এইভাবে চললে অল্প

কিছুদিনের মধ্যেই এই গোষ্ঠী বংশবৃদ্ধি ও সংখ্যা-ঘনত্বের জন্য লোপ পেত। অনেকেই এই পরীক্ষার ফল মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন না। আমরা জানি নিম্নপ্রাণীর জীবনধারণ ও প্রজাতি সংরক্ষণ তাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম ও সহজপ্রবৃত্তির উপর প্রধানত নির্ভরশীল। মানুষ এই ধরনের অন্তর্নিহিত কোনো ব্যবস্থার (built-in apparatus) উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধি যদি খাদ্য বাসস্থান ইত্যাদির উপর চাপ সৃষ্টি না করে—তবে মানুষকে ইঁদুরের মত আত্মধ্বংসী কিয়াকলাপে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। কিছু পশ্চিমী বিজ্ঞানী ইঁদুরের আচরণের সংগে ঘনবসতির মহানগরীর মানুষের ব্যবহারের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন—তাদের দ্রুততালের উন্মত্ত জীবনযাপন ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে। ম্যালথুস প্রভাবিত এই সব বিজ্ঞানীরা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও তার ফলে অধিবাসীর মানসিকতার পরিবর্তনের কথা আদৌ চিন্তা করেন নি। কোলম্যান (Psychology and Effective Behaviour) এবং আরো কিছু মনোবিজ্ঞানী কিন্তু মনে করেন যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশই মূলত শিশু ও কিশোরের মানসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ এবং জীবনের সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ :

প্রথমে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কথা ভাবা যাক। ভারত এবং এই রকম দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের শিশু কিশোরদের পক্ষে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের গুরুত্বই বোধহয় সব থেকে বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে নানা কারণে শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীর কিশোরের সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা যথাক্রমে মোট জনসংখ্যার ৩১% ও ২৩% (Nag, Adolescents in India, Calcutta 1982, p. 3)। এটা ১৯৬৭ সালের হিসেব। আমাদের দেশে ১৯৭১-এর লোকগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার একশজনের মধ্যে ৬১ জনের বয়স পঁচিশের কম, ৪২ জনের পনেরোর কম আর ছয় বছরের কম বয়স্ক শিশুর সংখ্যা শতকরা পঁচিশ—১১৫ মিলিয়ন। প্রতি দেড় সেকেণ্ডে একটি করে শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে—বছরে ২১ মিলিয়ন। পাঁচ বছরে পূর্ণ হবার আগেই এদের মধ্যে ৩·৬ মিলিয়নের মৃত্যু হয়। মোট মৃত্যুর শতকরা ৪০

ভাগ ঘটে প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে, শতকরা ১৫ ভাগ এক বছরের আগেই মারা যায়। উন্নত দেশে ০—৫ বছরের শিশুর মৃত্যুহার মোট মৃত্যুর শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। মৃত্যুহার গত ৩০ বছরে অনেক কমেছে; কিন্তু এখনও হাজারে ১৫ জন মারা যায় প্রতি বছরে। এই হার শ্রীলংকা মালয়েশিয়ার মত দেশের মৃত্যুহারের দ্বিগুণ আর পশ্চিমী দেশের চেয়ে ৬ গুণ বেশি। শহরের থেকে পল্লীগ্রামে মৃত্যুহার স্বাভাবিক কারণেই বেশি। জন্মানোর পরেই পল্লীগ্রামে হাজারে ১৩১ এবং শহরে ৮১টি শিশু মারা যায়। আর্থিক দিক থেকে উন্নত দেশে এই সংখ্যা মাত্র ২৭ [Child in the third world, P. P. H, New Delhi, 1979, pp. 27-29]।

শিশুর সমস্যা,—প্রাক্-কিশোরকালীন সমস্যা কৈশোরকে প্রবাহিত করে—এ কথা সবারই জানা। শিশুস্বাস্থ্য, শিশুমনস্তত্ত্ব, শিশুদের বুদ্ধি বিকাশ নিয়ে, তাদের ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আমাদের এই আলোচনা কৈশোর ও কৈশোর সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই সম্পৃক্ত। শৈশব ও কৈশোরেও মায়ের সংগে সন্তানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ এবং মায়ের স্বাস্থ্য, মানসিকতা ও সমস্যার সংগে শিশু ও কিশোরের বৃদ্ধি, মনের বিকাশ ও সমস্যা নানাভাবে জড়িত। মায়েদের অপুষ্টিজনিত ব্যাধি, প্রসবকালীন সংকট ও পরবর্তীকালে শিশুচর্যার অজ্ঞতা, বুকের দুধ দানে অক্ষমতা শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক নিরাপত্তা বোধকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে: এই বিপর্যয়ের প্রভাব কিশোর বয়সেও লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে মা ও শিশুর পুষ্টি. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক। দেশের শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ পল্লীবাসী, কিন্তু তাদের জন্য বরাদ্দ হাসপাতালের ৩০% শয্যা ও মোট চিকিৎসকের এক পঞ্চমাংশ। শহরের বস্তি এলাকায় শিশুদের ও মায়েদের অবস্থা হয়তো সামান্য কিছু উন্নততর কিন্তু আশানুরূপ নয়।

আর্থ-সামাজিক সমস্যার কথা দেশের শাসকশ্রেণী, শিক্ষিত জনসাধারণ, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সমাজসেবী সকলেরই জানা। পুষ্টির অভাব, চিকিৎসার অভাব, শিক্ষার অভাব—এ সম্পর্কে পুরো অবহিত থাকা সত্ত্বেও আমরা বিশেষ কিছু করে উঠতে পারছি না কেন—এ প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব আমাদের এই পুস্তকের বিষয়সূচীর মধ্যে পড়ে না। আমরা আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্রের কিছুটা আভাস এখানে দিচ্ছি। মনোবিদ্যা ও

সমাজবিদ্যার তরুণ বন্ধুরা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে তথ্যভিত্তিক চিন্তার সুযোগ পান—এই আমাদের কাম্য।

দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচেতে বাস করেন। ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রাক্-কিশোর ও কিশোরের সংখ্যা প্রায় ৩৪৬ মিলিয়ন (Nag, Ibid, p. 3) ; এদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ১৪৪ মিলিয়ন। ইউনিসেফের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন বেঁচে থাকার মত ন্যূনতম পুষ্টিদায়ক খাবার পাচ্ছে না (Child in third world, Ibid) 3. 29। আই.সি.এম.আর,-এর বিধান অনুযায়ী ২০০০ ক্যালোরির (৫০ গ্রাম প্রোটিন থাকা চাই) খাদ্য খুব কম শিশুই পায়। ১৫ থেকে ২০% পুষ্টির অভাব নিয়েই এরা বেড়ে ওঠে এবং বেঁচে থাকার সৌভাগ্য যাদের হয়, তারা কৈশোরে পড়াশুনো ও খেলাধুলোর প্রয়োজনে বাড়তি খাদ্য না পাওয়ার ফলে দেহ ও মনের অপুষ্টিতে ভোগে। মগজ প্রোটিনের অভাবে পুরোপুরি কাজ করে না, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের স্বাদ তারা ভোগ করতে পারে না। মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ঘটে না।

দুঃস্থ শ্রেণীর কিশোরদের দুর্গতির শুরু জন্ম থেকেই। জন্মকালে তাদের ওজন কম (২·৮ কেজি ; গড় ৩·২ কেজি) ; শতকরা ৭৫ জন অপুষ্টিতে ভোগে ; ২৫ জনের অপুষ্টির মাত্রা খুবই বেশি। এদের শতকরা ৩ জন মাত্র স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অধিকারী। পনেরো বছরের আগেই ২·৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে অন্ধ হয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রেই ভিটামিন 'এ'র অভাব এই অন্ধত্বের জন্য দায়ী। কম শোনার জন্য বেশ কয়েক লক্ষ কিশোরের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। শৈশবে সুষম খাদ্যের অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাবে আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের বেশির ভাগই অপরিণত দেহ ও মনের অধিকারী ; তাদের স্নায়ুসংস্থা দুর্বল, উৎসাহের অভাব, স্মৃতিশক্তি ও বোঝার ক্ষমতা কম। সাধারণত তারা অলস ও শ্রমবিমুখ। উৎকেন্দ্রিক ও অস্বভাবী প্রকৃতির এই সব কিশোরকিশোরীদের খুব সহজেই বিপথে পরিচালিত করা যায়। প্রায় ৭৫ ভাগ রোগের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুষ্টির অভাব দায়ী (Ibid, p. 31)। প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রসঙ্গে বৈচিত্র্যহীন পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। শিশু ও কিশোরকিশোরীদের মানসিক বিকাশ, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, ধারণা, কল্পনা তার পরিবেশের বৈচিত্র্য

ও সৌন্দর্যের উপর নির্ভরশীল। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ যারা একই ধরনের পরিবেশের মধ্যে শৈশব কাটাতে বাধ্য হয়, নতুন দেশ বা নতুন মানুষের সংস্পর্শে যারা আসতে পারে না, তাদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায় না, অভিজ্ঞতাও বাড়ে না। ফলে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ আরও বাধাপ্রাপ্ত হয়। কৈশোরে তাদের পেটের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা মেটানোর চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই স্থান পায় না। দারিদ্র্যের দরুণ যেমন গ্রামের এবং বস্তিবাসী কিশোরকিশোরীরা বুদ্ধি, মননশীলতা, মেধার দিক থেকে অনগ্রসর, তেমনি আবার লেখাপড়া শেখার সুযোগও এদের কম। মাইনে দিতে হয় না, বইপত্তরের দাম লাগে না—তবু তোমার ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাও না কেন? গোপালপুর (উড়িষ্যা)-এর এক নুলিয়াকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে সে একটু হেসে নিজের নিম্নাংগের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—এই পোষাক পরে যে ইস্কুলে যাওয়া যায় না। তার নিম্নাংগের খুবই সামান্য অংশ ঢাকা ছিল। এর থেকে বেশি আবরণ, আচ্ছাদনের মত কাপড় কেনবার ক্ষমতা তার নিজের জন্যেই নেই, যদিও সে জানে প্রয়োজন আছে। বাচ্চাদের জন্য গাত্রাবরণ কেনার কথা ওরা ভাবতেই পারে না। এ-ছাড়া কিশোরত্ব প্রাপ্তির আগেই শিশুদের শ্রমের ওপর দরিদ্র পরিবার মাত্রেই নির্ভরশীল। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং-এর ১৯৭৩ সালে সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে ৬—১১ বছর বয়সের ২৮·৪% ছেলে ও ৪৬·১৬% মেয়ে কোনো ইস্কুলের ভর্তির খাতায় নাম লেখায় নি। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে। বাচ্চাদের নিম্নাংগটা পুরোপুরি ঢাকবার ক্ষমতা যাদের আছে, অর্থাৎ যে সব শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তির খাতায় নাম লেখায় তারাও, আগেই বলেছি, বয়স বাড়ার সংগে সংগে বিদ্যামন্দির ছাড়তে থাকে। উঁচু ক্লাসে ভর্তির সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। ১৯৭০-৭১ সালের একটা হিসেব তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে।

	ছেলে	মেয়ে
I—IV	89·7	68·6
V—VI	50·7	33·0
VII—IX	23·4	12·2
X—XII	9·2	3·5

এ দেশে কিশোরকিশোরীর সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে খুবই বেশি (২০ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়ের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫০·৭%)। আধা-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কিশোরকিশোরীর সংখ্যা (অশিক্ষিত ও আধা-শিক্ষিত শতকরা পঞ্চাশ ভাগের কম হবার কথা নয়) প্রায় ১৫ কোটির কাছাকাছি হবে মনে হয়। এদের এক অংশ বিভিন্ন শ্রমে নিযুক্ত; আর বেশির ভাগই বেকার। মানসিক গঠনের দিক থেকে, যারা সংগঠিত শিল্পে বা উৎপাদনে নিযুক্ত, তারা বেকার আধা-বেকার ও অসংগঠিত শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত কিশোরদের থেকে আলাদা। কৈশোরের সাধারণ সমস্যার সংগে মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও চিকিৎসকরা যতটা পরিচিত, এই সব অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, বেকার ও আধা-বেকার গরীবঘরের কিশোর কিশোরীর বিশেষ সমস্যার সংগে ততটা পরিচিত নয়। কিশোর কিশোরী-স্বভাবতই অবহেলিত (অবশ্য বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়); এরা তো আরও অবহেলিত, অবাঞ্ছিত। এরা পড়াশুনা করে না, বাড়ীর কাজে লাগে না, তারুণ্যের মর্যাদা পায় না। বৈধ, অবৈধ যে ভাবেই এরা অর্থোপার্জন করুক না কেন, নিজের জন্যই বেশি খরচ করে, পরিবারের সংগে এদের অনেকেরই কোনো সম্পর্ক থাকে না। আদি কৈশোরে—১৪ বছরের আগে এদের শ্রমে নিযুক্ত করা আইনবিরুদ্ধ। কিন্তু এই আইন অমান্য করার জন্য সাজা খুব কম ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসাব অনুযায়ী শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ভারতে সব থেকে বেশি—১১ কোটির কাছাকাছি (১৯৭৯ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী)) হিসেবের বাইরে আরও বেশ কয়েক কোটি আছে নিশ্চয়ই। ঠিকাদারদের অধীনে যারা কাজ করে, শহরে গঞ্জের দোকানে যারা ফাই ফরমাস খাটে, বড় বড় নগরে গৃহভৃত্যের কাজে যারা নিয়োজিত, বাসলরীর 'ক্লিনার'-এর যারা সহকারী, রাস্তাঘাটে যারা জিনিস ফেরি করে, তাদের সঠিক হিসেব কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। এদের বেশির ভাগই ১১ থেকে ১৪ বছরের ছেলে। এ-ছাড়া বিড়ি ও চুরুট তৈরীর কাজে ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত আছে যারা তাদের অনেকেরই বয়স ১৪ বছরের কম। এই সব শিল্পে মোট শ্রমিকের শতকরা আশি ভাগই নাকি কিশোর শ্রমিক।

পল্লীগ্রামে চাষবাসের কাজে নিযুক্ত কিশোর শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৭০-৭৫ লক্ষ; মোট জমিতে নিযুক্ত শ্রমিকের দশ ভাগের এক ভাগই এরা। শিশুদের স্কুল ছাড়িয়ে তাদের বাপ-মাই শ্রমের কাজে নিযুক্ত করেন।

কিছু ছেলে অনেকদিন অবধি তাদের উপার্জন বাপ বা মায়ের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু ১৪-১৫ বছরে পৌঁছে তাদের নিজেদের নেশাভাঙের তাগিদ ও অন্যান্য জৈবিক প্রয়োজন বেড়ে যায়, তখন অনেকে নিজেদের খরচা মিটিয়ে পরিবারের জন্য বিশেষ কিছু দিতে পারে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। পল্লীগ্রামে স্থায়ী ও অস্থায়ী সিনেমা হল-এর সংখ্যা বাড়ছে। এই শক্তিশালী গণমাধ্যম যৌনগন্ধী ও খুনখারাবির চিত্র দেখিয়ে এই সব কিশোরদের উন্মার্গগামী করে। অবশ্য যাত্রাগান ছাড়া আর কোনো রকমের পুরনো দিনের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা নেই। মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে জৈব উন্মাদনামূলক চিত্রকাহিনী এদের একাংশকে অসামাজিক দুঃসাহসিক কাজে প্ররোচিত করছে। গত দুই দশকের মধ্যে গ্রামীণ পরিবেশের পরিবর্তন কিশোরদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন এনেছে। এদের মধ্যে অপরাধ ও মাদকাসক্তি ও মনের রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে; অবশ্য শহরের বস্তিবাসী বেকার কিশোরদের মত এরা এখনও বড়দরের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেনি বলেই মনে হয়। বছরে বড় জোর মাস ছয়েকের মত এদের রোজগার হয়; অন্যসময় রোজগারের আশায় ধারে কাছের ছোট শহর, শহরতলীতে গিয়ে অনেক সময় সমাজবিরোধীদের খপ্পরে পড়ে, এবং দলে ভিড়ে গ্রাম ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য হয়।

অসংগঠিত শিল্পে বা ঠিকাদারদের কাছে যারা কাজ করে, তারা অল্প বয়সেই পাকাপোক্ত হয়ে পড়ে এবং গ্রামের কিশোরদের চেয়ে অনেক বেশি দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। শহরের বস্তিবাসী কিশোরদের মত এরা অপরাধী ও চোরাকারবারীদের দলে ভিড়ে ভবিষ্যতে মস্তানী করবার মহড়া দিতে থাকে। বিড়ি তৈরীর কাজে ও কুটির শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিশোরদের আয়ের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা বেশি থাকায় এরা অন্য সব কিশোর শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপত্তা বোধ করে। গৃহ ও পরিবারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব বেশি ছিন্ন হয় না এবং দুষ্কর্মে ও অপরাধের জগতের সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটবার সম্ভাবনা কম থাকে।

বড় শহরের ঘিঞ্জি অঞ্চলের ও বস্তিবাসী কিশোরদের অবস্থা পল্লীর কিশোরদের থেকে আলাদা। নিউ দিল্লীতে ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পঠিত একটি পেপার থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্য পরিবেশন করেছি।

দিল্লী বোম্বে কলকাতায় রাস্তায়, বস্তিতে ও শহরতলীর ঘিঞ্জি অঞ্চলে হাজার হাজার কিশোরকিশোরী বসবাস করে। বম্বের ফুটপাথে ১৯৭০ সালে প্রায় দু লক্ষ লোক বাসা বেঁধেছিল। এইসব বস্তিতে প্রায়শই পানীয় জলের অভাব থাকে, মলমূত্র ত্যাগের জন্য পায়খানার সুবন্দোবস্ত নেই। অদক্ষ শ্রমিক ও বাস্তুহারা চাষীরা এই সব নগরীর প্রান্তে এসে দিনমজুরীতে কাজ করবার জন্য ভিড় জমায়। কিশোরকিশোরীদের অবস্থা এখানে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। প্রথমত এক ঘরে ১৫।২০ জনের সঙ্গে রাত কাটাতে হয়; মেয়েদের দেহ ঢাকবার মত কাপড় জামা সব সময় থাকে না, কাজেই কিশোরীরা আব্রু রক্ষা করতে পারে না। যৌবনোদ্গমের অনেক আগেই ইচ্ছা থাক বা নাই থাক দূর আত্মীয় বা মস্তানদের লালসা মেটাতে হয়। শৈশব থেকে অশ্লীল কথা শুনে ও অনেক সময় গোপনীয় ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হতে দেখে এরা অকালপক্ক হয়ে ওঠে। আরো দেখে মদ চোলাই, চোলাই মদ ও চোরাই মাল চালান করা, খুন জখম ইত্যাদি ব্যাপার। এ প্রায় নিত্যকার ঘটনা। কিশোরদের মধ্যে যারা একটু চালাক চতুর তারা 'বেলাক' করতে, মাল পাচার করতে শেখে; যাদের গায়ে শক্তি বেশি, মারামারি লাঠালাঠি করতে শিখেছে তাদের দলে টানে 'ওয়াগন ব্রেকাররা'। এইভাবে এদের ভয় ডর কমে যায়, পাপবোধ অপরাধবোধ থাকে না, অন্যের ও নিজের প্রাণের মূল্য প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। এরা সমাজে অবাঞ্ছিত বুঝতে পারে, তাই এদের কাছে সামাজিক-অসামাজিক কাজের কোনো পার্থক্য থাকে না। নিজেদের কোনো মতে বাঁচিয়ে রাখা ও নিজেদের জৈবিক প্রয়োজন মেটানো ছাড়া আর কিছু করণীয় আছে বলে ভাবে না। আবার বস্তির লোকদের গোষ্ঠীর লোকদের অভাব বা প্রয়োজন মেটাতে কোনো কোনো সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন করতেও এদের দেখা যায়। কদর্য হিন্দী সিনেমা দেখে, হিন্দী গান গায়, সব রকমের নেশাতেই এরা অভ্যস্ত। সমাজেরই সৃষ্ট এই সব কিশোরকিশোরীদের সমাজের দুষ্ট ক্ষত বলে অভিহিত করেন নীতিবাগীশ পণ্ডিতের দল। এদের থেকেও দুরবস্থায় ও নির্যাতনের মধ্যে জীবন ধারণ করে অস্পৃশ্য ও আদিবাসীদের কিশোরকিশোরীরা। এতদিন এইসব কিশোরকিশোরীরা নিজেদের দীন হীন ও ঈশ্বর-পরিত্যক্ত জীব বলেই মনে করত; গত জন্মের পাপে তারা এ জন্মে প্রায়শ্চিত্ত করছে। অবশ্য আদিবাসীরা এ রকম ভাবত না। আজ তারা প্রাক্তন কর্মফলে বিশ্বাস হারিয়েছে; নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে

গড়বে বলে ঠিক করেছে। এই সব নির্যাতিতের নতুন প্রজন্মের কিশোর-কিশোরী, তরুণতরুণীরা দেশের উচ্চবর্ণ ও শাসককুলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। আর্থ-সামাজিক সমস্যা আজ তাদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিশোরদের সমস্যার সৃষ্টি শৈশব থেকে। সেই কারণে শিশুদের প্রতি বড়দের আচরণ ও শৈশবের নানা সমস্যাও স্বভাবতই এসে পড়েছে। কিছুদিন আগেই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে। সেই সময় প্রায় সব দেশের শিশু ও আদি কিশোরদের সমস্যা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।* আমাদের মত দেশে শিশুদের পুষ্টির অভাব, মা ও শিশুর অবহেলা, শিশুদের ব্যবহার ইত্যাদির মূলে দারিদ্র্য। ধনী ও শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নত দেশে শিশু ও আদি কিশোররা (কথাটি এর আগেও কয়েকবার ব্যবহার করেছি; যাঁরা গোড়ার দিকের অধ্যায়গুলো মন দিয়ে পড়েন নি, তাঁদের জানাচ্ছি যে কৈশোর-এর ও কৈশোর সমস্যার আলোচনার সুবিধার্থে ১১-১৪ বছর অবধি আদি কৈশার, ১৫-১৭ মধ্য কৈশোর, ১৮-১৯ অন্ত কিশোর বলে গণ্য করা হয়েছে) খুব সুখে স্বচ্ছন্দে আছে ভাবলে ভুল হবে। সে দেশের মনোবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞনীদের কাছে শিশু ও আদি কিশোরদের প্রতি আচরণ অনেক সময় সত্যিই দুর্বোধ্য ও প্রহেলিকা মনে হয়। নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে কিছু তথ্য তুলে দিচ্ছি। সমস্যার গুরুত্ব সহজেই বোঝা যাবে।

লাটিন আমেরিকা :

(ক) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W.H.O) হিসাব অনুযায়ী দশ লক্ষ শিশু পুষ্টির অভাবে মারা যায়।

(খ) প্রতি মিনিটে ২টি শিশু মারা যাচ্ছে, তাদের ডাক্তার দেখানোই হয় না।

(গ) ইউনিসেফের হিসেবে স্কুলে যাবার বয়সী অর্ধেক ছেলে- মেয়ে ভর্তি হয় না।

(ঘ) ক্ষুধা মেটাতে দশ লক্ষ মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র :

(ক) শতকরা চল্লিশ জন শিশুকে পলিও ও ডিপথেরিয়ার টিকা দেওয়া

* সেই সময় লেখক এক সভায় এই প্রবন্ধের অংশবিশেষ পাঠ করেছিলেন।

হয় না, এই তথ্যটি পড়ে চমকে উঠবেন অনেকেই। তাঁরা আমার তথ্যসূত্রকে নির্ভরযোগ্য না মনে করতে পারেন। তাঁদের কোলম্যানের লেখা 'সাইকলজি অ্যাণ্ড এফেকটিভ বিহেভিঅর' (ভারতীয় সংস্করণ ১৯৭১) বইটির ৫৩৩ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ২য় প্যারাটি পড়তে অনুরোধ করছি। (খ) শিশু ও কিশোরদের (৬-১৭ বছর) শতকরা চল্লিশ জন ডাক্তার দেখেনি। (গ) শিশু ও কিশোর অনুষ্ঠিত দুষ্কিয়তা বেড়েই চলেছে ; অপরাধ প্রবণ কিশোরদের ২৭০০ সংঘ আছে ; সভ্য সংখ্যা ৮০,০০০। (ঘ) নিউইয়র্ক শহরের ৬৮,০০০ কিশোরকিশোরী নিয়মিত মাদকসেবী। আর এক হাজার শিশু নিউইয়র্কে মাদকসেবী হয়েই জন্মায়, মানে তাদের মায়েরা মাদকাসক্ত। (ঙ) যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত কিশোরকিশোরীর সংখ্যা দশ বছরে দশ গুণ বেড়েছে। ১৯৭০ থেকে ৮০-র মধ্যে ১৩,০০০ থেকে বেড়ে ১৩৭,০০০। শিশু ও কিশোর শ্রমিকের সংখ্যা উন্নত দেশেও খুব কম নয়। আই. এল. ও.এর হিসেবে একচ্ছত্র পুঁজির রাজত্বে মোট সংখ্যা ৫ কোটির বেশি।

পশ্চিম জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেরও এই হাল। সব কিছু জানাবার প্রয়োজনও নেই।

সমস্যা এখানেও আর্থসামাজিক। দারিদ্র্যজনিত নয়, তবে মুনাফা-ভিত্তিক। [তথ্যের উৎস প্রধানত **Child in third world, P P H, New Delhi 197।**]

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ শৈশব ও আদি কৈশোরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কৈশোর সমস্যা সৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক কারণের ভূমিকাকে প্রচলিত মনোবিদ্যার পুস্তকে লঘু করে দেখানো হয়েছে। এঁরা মনে করেন উৎপাদনভিত্তিক আন্তর্মানবিক সম্পর্ক মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়।

সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ

আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের দরুণ শিশু ও কিশোরদের মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং নিউরোসিসের সংগে তার সম্পর্ক নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একজন মনোরোগ চিকিৎসক বেশ কিছুদিন আগে একটি বই লেখেন (**Furst Joseph, The Neurotic, Citadel Press, New York, 1954**)। তিনি তাঁর দেশের কিশোর ও প্রাক্-কিশোরদের তরুণ মনের উপর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও অপসংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন এই বইটিতে। তিনি সাইকো-

এ্যানালিটিক তত্ত্বের সাহায্যে মৃত্যুরতিবাদকে ভিত্তি করে চিকিৎসা জীবন শুরু করে পরে এই পথ পরিত্যাগ করেন। আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক উপাদান পরবর্তীকালে নির্জ্ঞান ও লিবিডোর চেয়ে নিউরোসিসের ব্যাখ্যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।* তাঁর দেশের কিশোর দুষ্ক্রিয়তার তথা সব রকমের নিউরোসিসের ক্রমবৃদ্ধির জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণকায় মানুষ, স্ত্রী-শ্রমিক (সাদা কালো দুই), অন্যদেশের সংখ্যালঘুদের শোষণ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যৌনতা ও অপরাধমূলক সাহিত্য ও সিনেমার ক্রমপ্রসারকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, সহজপ্রবৃত্তিবাদী মনস্তত্ত্ব (ফ্রয়েডীয় সাইকোএ্যানালিসিসই তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য) অপরাধ, নিউরোসিস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের কারণ হিসেবে অন্তর্দ্বন্দ্বকে, বিষয়ীভিত্তিক মানসিক সংঘাতকে (subjective psychological conflict) দায়ী করেছেন, কিন্তু আসল কারণ বাইরে, সমাজে।**

কিশোরকিশোরীর মানসিকতা ও কৈশোরের নানাবিধ সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য কিছুকাল আগেও অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক ও মনোরোগ চিকিৎসক শৈশবের অবদমিত কামনাবাসনার গতিপ্রকৃতির (প্রধানত কামেচ্ছা) উপর পুরোপুরি নির্ভর করতেন। পরবর্তী জীবনের, বিশেষ করে আদি ও মধ্য কৈশোরের ভাবনাচিন্তা, কিশোরকিশোরীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য সবই নির্জ্ঞান প্রভাবিত বলে ভাবা হত। হর্নি, ফ্রম প্রমুখ নিওফ্রয়েডিয়ানরা সংস্কৃতি (culture), সমাজ

---

* We would regard neurosis as being the intensive reflection within the sick individual's practice and consciousness of certain highly individualistic, destructive and antisocial qualities, engendered by the specific aspects of the social system in which he lives. (Furst Joseph, The Neurotic, Citadel Press, New York, 1954, p 128).

** I would say unequivocally that the determining contradiction of neurosis is not an internal, psychological and subjective one. It is an external contradiction. It lies in the neurotic's social practice... ..The internal conflicts are reflections and derivatives of the conflicts in his social practice and the latter express the contradictory relations that are inherent in our social system, (Ibid, p 149).

ইত্যাদি কথা আমদানি করেছিলেন, কিন্তু কথাগুলো ফ্রয়েডেরই লিবিডোরই নতুন নাম বা পোষাক। হ্যারী কে. ওয়েলস স্পষ্টভাবে বলেছেন ও তথ্য প্রমাণ উদ্ধৃতি করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ফ্রয়েডবাদের এই সব সংস্কারকরা আধুনিক নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের আলোকে ফ্রয়েডবাদকে গ্রহণীয় করার জন্য সমাজ-সংস্কৃতি কথাগুলো ব্যবহার করেছেন। আসলে তাঁদের সমাজ-সংস্কৃতি ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানেরই অনুলিপি।* পারিবারিক সমস্যা, মাতাপিতার আচরণ শিশুকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করে; কিন্তু বহির্বাস্তবের নতুন নতুন উদ্দীপক তাকে পরিবর্তিত করবে না, শুধু শৈশবের উদ্দীপনা কিশোরকে, তার ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করবে—এই ফ্রয়েডীয় শিক্ষাকে মেনে নেওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশকে অতটা দুর্বল অনেকেই মনে করেন না। চার বছরের শিশুর মধ্যে যুবকের যৌন-ধর্মিতা আবিষ্কার করা, কৈশোরকে সরাসরি অগ্রাহ্য বা অবজ্ঞা করার মধ্যে নতুনত্ব আছে, কিন্তু বিশ্বাস্য উপাদান নেই।** সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিশোরের ক্রমবিকশিত বাস্তব চিন্তা, আন্তর্মানবিক সম্পর্ক অনুধাবন, তার সামাজিক ভূমিকা নির্ধারণ ইত্যাদি কৈশোর ধর্মের সংগে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। ফ্রয়েডীয় ভাবধারা দ্বারা পুরোপুরি বা আংশিক আচ্ছন্ন থাকার দরুন এই সম্পর্ক নির্ণয়ে পশ্চিমী পণ্ডিতদের বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্ব বিশ্বাসীরা ছাড়া অনেক পশ্চিমী দুনিয়ার মনস্তাত্ত্বিকরাও এই রকমই মনে করেন।*** কিশোরদের সমস্যাই হোক আর বয়স্কদের সমস্যাই হোক তার কারণ জানবার জন্য পরিবেশের আর্থ-সামাজিক,

---

* Reformed psychoanalysis is a theory of the unconscious but the reflection theory is the theory of the consiousness (Harry K. Wells, The Failure of Psychoanalysis, International Publishers, New York, p. 162)

** Freud conceived of people only in one way. namely that after the age of three or four they are driven by adult sexuality consciously or unconsciously—as the main motivation in life It is only this philosophically static view point which would permit Freud to visualize children as miniature adults or concieve of adults as enlarged children. (Furst, The Neurotic, 1954, p. 103)

*** The psychoanalysts say that person's thoughts or beha-

রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পূর্ণ জ্ঞান ও সম্যক পর্যালোচনা দরকার। কিশোরদের ও বয়স্কদের সব সমস্যা, তাদের মনের দ্বন্দ্ব বিরোধ বুঝতে আমরা যদি শুধু শিশুদের দুধ খাওয়া আর 'টয়লেট ট্রেনিং' এবং মাতা-পিতার আচরণ নিয়ে বিচার করতে বসি তা হলে আমরা সমাধান তো দূরের কথা, সমস্যার উৎস সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণাও তৈরি করতে পারব না। "শিশুর বা কিশোরের সব কিছু সমস্যা মাতাপিতার মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত, মাতাপিতার মানসিকতা আবার তাঁদের মাতাপিতার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি দ্বারা নির্ধারিত'—এই ভাবে বিচার করলে সমাজব্যবস্থার দোষত্রুটির দিকে নজর না দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমস্যাও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। পরিবারের বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ সেখানেই পারিবারিক নিয়মকানুন, বিধি-ব্যবস্থা ন্যায়নীতির উৎস বিদ্যমান। ব্যক্তি হিসেবে মানসিকতার বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কোন্ বিশেষ আদর্শ তাঁরা প্রাক-কিশোর ও কিশোরের মনে অনুপ্রবিষ্ট করছেন তার গুরুত্বই বেশি।* এ নিয়ে পরের অধ্যায়ে বিশদ আলোচনার চেষ্টা করব। বয়ঃসন্ধিকালের যৌনসমস্যা সহজ প্রবৃত্তগত যৌনসমস্যা নয়; সমাজে প্রচলিত নরনারীর সম্পর্ক ও সমাজ সংগঠনের সংগে এই সমস্যা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কিশোরদের যৌনতা প্রসঙ্গে এই জটিল ব্যাপার বিস্তার করার ইচ্ছা রইল।

---

viour arise from the sources entirely within himself or some part of his mind which is "Unconscious" and thereby shut off from influences emanating from the world of reality outside the brain. This trend leads into pure mysticism···the unscientific nature is perhaps most clearly seen when psychiatrists.. overlook all economic and political causes of world tensions. claiming instead that social problems are created by improper methods of raising children. (Saul, in Psychonalytic Quarterly, Vol. 18, No. 2, 1949)

* The key question is not the psychology or behaviour of parents as individuals. The key question is the nature of the aspects of capitalist morality, ideology and practice which the parents transmit to their child.
(Furst, op. cit., p. 134)

লক্ষ লক্ষ বছরের জৈবিক বিবর্তনের ফলে প্রজাতি যেমন বিশিষ্ট মানবিক স্নায়ু সংস্থার (২৩ জোড়া ক্রোমোসম ও জীন সমৃদ্ধ) অধিকারী হয়েছে, তেমনি আবার হাজার হাজার বছরের সামাজিক বিবর্তনের ফলে বিশেষ এক সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। বিভিন্ন স্থানের সংস্কৃতির মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে দুস্তর ব্যবধান আছে বলে মনে হলেও 'মানব সংস্কৃতি'র একটা সামান্যীকৃত রূপও আছে। যেমন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র হলেও ভাষা আছে, সংগীত শিল্প সাহিত্য আছে, পরিবার ও সমাজ চালাবার নিয়মকানুন রীতিনীতি আছে (Coleman, op. cit. ; pp. 52-53)। নৃবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা আজকের মনোবিদ্যাকে সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করেছে। মার্গারেড মীড ও অন্যান্য নৃবিদ্যাবিশারদদের গবেষণা অধ্যয়ন থেকে শৈশবের ও কৈশোরের বৃদ্ধি চরিত্র মানসিকতা ইত্যাদির বিবর্ধন ও বিকাশে এই সংস্কৃতির অবদান ও প্রভাবের স্বীকৃতি পুরনো দিনের সহজ প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্বের মর্যাদা বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে। আনা ফ্রয়েড, মেলানি ক্লাইনের শিশু পালন ও শিশুচর্যাভিত্তিক (Child raising) শিশু মনস্তত্ত্বকে মার্গারেট মীডের মত গবেষকদের বাস্তব তথ্য-ভিত্তিক অভিমত অনেকখানি পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করেছে। সংস্কৃতির প্রভাবকে প্রবৃত্তিবাদী শিশু ও কিশোর মনস্তাত্ত্বিকও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন।*

গোষ্ঠীর প্রয়োজন, বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের সমস্যা বিশেষ ও নির্দিষ্ট ভাবে মেটাবার চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে, আবার অতি সমৃদ্ধ সংস্কৃতিরও নানা কারণে অবক্ষয় ও বিলোপ ঘটে। সংস্কৃতি দেশে দেশে বিভিন্ন ; আবার একই দেশে ধর্মভিত্তিক, জাতিভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক : আমাদের মত দেশে আবার ভাষাভিত্তিক, আলাদা আলাদা অবর সংস্কৃতি (Sub-

* Culture is seen as a principal element in the development of the individual which will result in having a structure, a type of functioning and a pattern of irritability different in kind from that of individuals who have been socialized under another culture. (M. Mead, The concept of culture and the psychosomatic approach—In "Contributions towards medical psychology" (Ed. A. Wader), Vol. I, New York, 1953, p. 378)

culture) রয়েছে। বিভিন্ন সাব-কালচার-এর সংগে ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু কিছু মিল ও সম্পর্ক আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি আবার অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি থেকে আলাদা হলেও, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সত্তেও অন্য দেশের সংস্কৃতির সংগে কিছু কিছু জায়গায় নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত। সংস্কৃতির রূপান্তরণ ঘটলেও সব দেশের, সব জাতির সংস্কৃতিই যে মানব সংস্কৃতি, সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। প্রতিটি সমাজ তার শিশুদের জন্ম থেকেই স্বকীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধ অনুমোদিত আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার শিক্ষা দিতে থাকে। উদ্দেশ্য নিজের সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় ও বাঁচিয়ে রাখা। এ কাজের জন্য প্রতি সমাজেই নানা রকমের এজেন্সী, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে। গৃহ, পরিবার, খেলার মাঠ, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রধানত এই প্রশিক্ষণে অনেককাল ধরে নিযুক্ত। আজকাল আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব গণমাধ্যমের। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম হওয়ায় দরুণ, সংবাদপত্রের চেয়ে সিনেমা রেডিও যাত্রা ইত্যাদি কিশোর মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আজকাল আবার বড় বড় নগর শহরে দূরদর্শন খুবই জনপ্রিয় মাধ্যম। কেবলমাত্র উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই দূরদর্শন কেনবার ক্ষমতা আছে; কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত বস্তিবাসী আধা চেনা অচেনা কিশোর কিশোরীরা হিন্দী সিনেমা ও ফুটবল খেলা দেখতে সৌভাগ্যশালী প্রতিবেশী দূরদর্শন-মালিকদের বাড়ীতে ভিড় করে। কিশোরকিশোরীর মানসিকতা ও চরিত্র গঠনে এই সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান-এর অবদান সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিবরণ দেওয়া হবে। আগে বলা হলেও আবার জানাচ্ছি যে খেলার মাঠে, স্কুলে, সিনেমা হলে কিশোরকিশোরী এক সংগে একই জিনিস শিখছে বা দেখছে বটে; কিন্তু ঠিক একই ধরনের প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে ঘটছে না। ব্যক্তিগত গ্রাহীক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও ঔৎসুক্যের তারতম্যের কথা বাদ দিয়েও বলা চলে এরা নিজ নিজ অবর-সংস্কৃতি প্রভাবিত ও শৈশব থেকে বিভিন্নভাবে পূর্বশর্তাবদ্ধ (pre-conditioned) হবার ফলে একই ঘটনা, একই শিক্ষা, একই দৃশ্য তাদের মনে পুরোপুরি না হলেও বেশ কিছুটা ভিন্ন ধারণা সৃষ্টি করছে। কিশোর যে ছোটো গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম, সে কিছুটা সেই গোষ্ঠীর চোখ দিয়ে কান দিয়ে দেখে ও শোনে। সেই ছোটো গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, ভালমন্দ বিচার দ্বারা স্বভাবতই সে অভিভাবিত ও সেই গোষ্ঠীর সংগে অন্বিত। এই গোষ্ঠীর মূল্যবোধ বড় গোষ্ঠী, বা দেশীয়, জাতীয়

সংস্কৃতির পরিপন্থী হলে, কিশোরের মনে সংশয় জাগতে পারে; গোষ্ঠী-সংস্কৃতি যদি তার নিজস্ব নিরাপত্তা বোধকে বিঘ্নিত করে, তাহলে সে দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতিকে বেশি মূল্য দিয়ে নিজের গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে হয় মানসিক দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হবে না হয় জাতীয় জীবনধারাকে আত্মীভূত করে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ বিসর্জন দেবে। আবার অনেক সময় বাড়ীর ও পরিবারের সংস্কৃতির ধারা থেকে সরে গিয়ে অনেক নীচু মানের সংস্কৃতির (যেমন ছিনতাই, পকেটমার বা মাদকাসক্তের দলে ভিড়ে) প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। একটি কিশোর একই সংগে কয়েকটি ছোট গোষ্ঠীর সংগে জড়িত হবার ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সে পৃথক পৃথক সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ-প্রভাবিত হতে পারে। পূর্ববঙ্গের দরিদ্র উদ্বাস্তু পরিবারের বাঁশের ছাপড়ায় বাসকারী কোনো কিশোর মেধাবী ছাত্র হবার জন্য স্কুলে পশ্চিমবঙ্গের কোনো বনেদি বাড়ীর ছেলের বন্ধু হয়ে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু সংস্কৃতির ধারক হতে পারে; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলার মাঠে স্কুলের বন্ধুর মত মোহনবাগানের সমর্থক না হয়ে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক হতে পারে, রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো খদ্দরধারী শিক্ষকের প্রভাবে কমিউনিস্টবিরোধী হয়ে নির্বাচনের সময় পাড়ার ছাপড়াবাসী ছেলেদের বিরোধিতা করতে পারে, আবার কোনো বোহেমিয়ান কবির কবিতা পড়ে একই সময়ে ধর্ম-বিরোধী নিহিলিস্ট হয়ে উঠতে পারে। গত ৩০ বছর, বিশেষ করে গত দশকের শেষ থেকে আমাদের দেশে ও সমাজে নানা ধরনের ভাবধারা—প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াপন্থী, অতিবিপ্লবী, প্রতিবিপ্লবী, সনাতনপন্থী, প্রতিষ্ঠানবিরোধী এবং আরো অনেক—কিশোর মনের উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করছে। কিশোরকিশোরীদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো অনেক বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। বহুধর্মী উদ্দাম উদ্দীপকের চাপে উৎকেন্দ্রিকতা সংবেদনশীল কিশোরকিশোরীদের অস্থির অব্যবস্থিত করে তুলেছে। এখনও পাপ বোধের তাড়নায় বাড়ীর বড়দের মত হয়তো বাবাজী দাদাজীর আশ্রমে ছুটছে না, কিম্বা নিরাপত্তার আশায় অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনের হিস্টিরিয়ায় ভুগছে না কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে অথবা আত্মরক্ষার তাগিদে বোমা-ছোরা-বন্দুক দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করছে। তারা অন্যভাবে বাবা-কাকার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করছে। 'পিয়ার কালচার' নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে; 'পিয়ার কালচারে'র

সংগে 'পৈতৃক কালচার'-এর মিলের দিকটা সেই সব আলোচনায় বোধ হয় দেখানো হয়নি।

বড় হওয়ার বিবরণীর মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। তবে যারা সহজপ্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী, তাদের কাছে বড় হওয়াটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। খাবারদাবার আদরযত্ন ঠিক মত পেলে সব শিশুই আপনা থেকে বড় হবে; আপনা থেকে তার শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটবে; এবং এই পরিবর্তনের ফলে আদি মধ্য ও অন্ত কৈশোরের বিশেষত্বগুলো দেখা যাবে। সমাজ-সংস্কৃতি বড় হওয়াকে প্রভাবিত করবে না; কিন্তু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষ হওয়ার দরুণ সেই সংস্কৃতির অংশীদার হবে; প্রথমে মাতাপিতার শিক্ষায়, তার পর যে সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আগেই করেছি তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশিক্ষণে। ব্যাপারটা ঠিক অত সহজ বা একরৈখিক নয় বলে মনে করেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসীরা। পিতামাতা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান শিশুকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেন, কিন্তু শিশুর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ একতরফা নয়। সংযোগে ও সাহায্য দুতরফা না হলে 'বড়ো হওয়া' দৈহিক দিক থেকে না আটকালেও বুদ্ধি ও মানসিকতার দিক থেকে আটকাবে। পুনরুল্লেখের দোষে অভিযুক্ত হব জেনেও আবার বলছি শিশু মানবিক ধর্ম, উন্মেষ, বিকাশের সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, সেই ক্ষমতাকে জাগ্রত করার জন্য শিশুকে মানবিক গুণ আয়ত্ত করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করতে হয়, সেই উৎসাহে ভাঁটা না পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হয়। বাবা মা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুকে প্রভাবিত করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশু যাতে মাতাপিতা ইত্যাদি শিক্ষার এজেন্টদের প্রভাবিত, আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করতে পারে, সে দিকেও দৃষ্টি রাখবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরের পরিপূরক, দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের শিশুকে কিশোর যুবকে পরিণত করার ব্যাপারে এই ধরনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন গর্ডন চাইল্ড।*

---

* A baby does not indeed inherit at birth a physical mechanism of nerve paths stamped in the germ plasm of the race and predisposing it to make automatically and instinctly the appropriate bodily movements. But it is born heir to a social tradition. Its parents and elders will teach it how to make and use equipment in accordance with the

শিশু যখন কথা বুঝতে বা বলতে শেখেনি, তখনও সে অর্থহীন শব্দ ও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে শিক্ষকদের, মানে বড়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং নিজের বড় হবার ব্যাপারে অক্রিয় থেকে প্রথমে কিছুটা নিষ্ক্রীয় এবং পরে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। হাত পা নেড়ে অর্থহীন শব্দ করে শরীরকে নানাভাবে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে বাচ্চা বাক্‌স্ফুটনের আগেই নিজেকে বড়দের কাছে যাতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে ও তাদের সঙ্গে এই বড় হওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতার দাবিত্ব রাখে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এ-পর্যন্ত পণ্ডিতেরা বোধ হয় সকলেই একমত।

সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটে তা নিয়ে এবং পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতা ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার তাৎপর্য ও পদ্ধতি নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। খুব সংক্ষেপে সেই মতভেদের কথা উল্লেখ না করলে আমাদের পক্ষে কৈশোর সমস্যা বিশ্লেষণে ও সম্ভাব্য সমাধানের সূত্র অনুসন্ধানে অসুবিধা ঘটবে।

মেরিল (Merril, Society and Culture, New Jercey, 1962), চিনয় (Chinoy, Society. an introduction to Sociology, New York, 1961) লিনটন Linton, The Study of Man, N. Y, 1936) লেভি Levy M. D., The Structure of Society, Princeton, 1952) প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিতের মত সামান্যীকৃত করলে বোঝা যায় যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (social interaction) বলতে এরা সহজাত প্রবৃত্তির তৃপ্তির পথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার কথাই বুঝেছেন*। মেরিল সংস্কৃতি বলতে শুধু নিত্য আভ্যাসিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতা দেখা দিয়ে থাকে, সেই কথারই উল্লেখ করেছেন। সামাজিক জীবনকে স্বতঃপ্রবাহিত নদীস্রোত মনে করেছেন অনেকে। তাঁরা 'ইনটারসাইকিক' পারস্পরিক মানসিক দ্বন্দ্ব অথবা 'ইনট্রা-সাইকিক্'—নিজের

---

experience gathered by ancient generations. And the equipment it uses is itself just a concrete expression of this social tradition. (Gordon Childe, What happened in history. 1964. pp. 15-16).

*(1) Social Interaction is "a continuous and reeiprocal series of contacts between two or more socialized human beings. The nature of these exchanges varies from individual to

অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া অন্য কোনো রকম সামাজিক দ্বন্দ্বের কথার উল্লেখ করতে চান না। এঁরা শ্রেণীর (আর্থনীতিক) কথা উল্লেখ করার সংগে সংগে এই কথা বলতে ভোলেন না যে পশ্চিমী সমাজে, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেণীবৈষম্য কোনো স্থায়ী ব্যাপার নয়। নীচু থেকে উঁচুতে ওঠার অপর্যাপ্ত সুযোগ আছে, ব্যক্তি নিজের চেষ্টা ও দক্ষতায় পঞ্চম শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উঠতে পারে। পঞ্চম শ্রেণী কথাটা বলছি এই জন্যে যে ফ্রিডম্যান-কাপলান সম্পাদিত মনোরোগবিদ্যার পুস্তকে, পাঁচটি আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর উল্লেখ আছে (Comprehensive Text Book of Psychiatry, Indian Edition, 1972, pp. 208 209)। এই 'সোশ্যাল মোবিলিটি' ও 'ক্লাস কোলাবোরেশন' তত্ত্বে পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকেই বিশ্বাসী। অন্য দল, যাঁরা মোটামুটি যুক্তিবাদী অথবা যাঁরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী, তাঁরা কিন্তু এভাবে সমাজকে বা সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন না যে মানুষের মধ্যে শুধু-প্রবৃত্তিমূলক আত্মরক্ষার তাগিদই একমাত্র চালিকা শক্তি। কিশোরদের মানসিকতা গঠনে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার ও নিজেকে জাহির করে সমাজ প্রতিটি ব্যক্তির কাছে কিছু প্রত্যাশা করে, এবং শৈশবের অব্যবহিত পরের অবস্থায় কিশোর তার কাছে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করুক আর না করুক, নিজের ভূমিকা

---

individual and from one social class to another. (Merril, op. cit., p 21, 25)

(2) ...The process of socializing individuals and the demand society makes of its members almost inevitably create psychological problems, repressing man's desires and conforming modes of behaviour which run counter to impulses and drives both innate and acquired (Chinoy, op. cit , p. 57).

(3) If Society is to survive, culture must not only provide techniques for training and repressing the individual, it must also provide him with compensation and outlets. If it thrwarts and suppresses him in certain directions it must help him to expand in others. It must also provide the individual with harmless outlets for the socialy repressed desires (Linton, op. cit., 413).

সম্পর্কে সচেতন হয়। সাধারণত মাতাপিতা এই ভূমিকা নির্ণয়ের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার পর যদি বিপথে চালিত না হয়, নিজের ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ঃ অবশ্য এ ব্যাপারে মাতাপিতা, কোন কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষক বা আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই সাহায্য করেন। সেই ভূমিকা যদি কিশোরের মনঃপূত না হয় বা তার দরুণ প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে যদি তার ক্ষমতা না থাকে, যদি সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিফল হয়, তবে তার ফলাফল তার পক্ষেও অনেক সময় গোটা পরিবারের পক্ষে খারাপ হয়। আবার সে যদি ভূমিকা পালনের দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট না হয়, তাহলে তাকে পরিবার ও সমাজ সব সময় ক্ষমার চোখে দেখেন না। পরিবার, গোষ্ঠী বা সমাজের অকল্যাণ বা ক্ষতিকর কাজে সে যদি লিপ্ত হয় তা হলে তাকে আরো অনেক বেশি অবহেলা ও তাড়না সহ্য করতে হয়। আমাদের সমাজে এবং আজকাল প্রায় সব তথাকথিত সভ্য সমাজে এ বিষয়ে আগের মত বেশি কড়াকড়ি নেই। বেশির ভাগ সমাজই এখন 'পারমিসিভ সোসাইটি'র পর্যায়ে পড়ে। কিশোর মাতাপিতা, শিক্ষক, পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং সমবয়সীদের সংগে মেলামেশা আচরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্যকে ও নিজেকে ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে। সব সমাজেরই একটা নিজস্ব নৈতিকতা ও স্বাভাবিক বিধিব্যবস্থা আছে। আমাদের ও অন্যান্য অনেক সমাজেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় ব্যক্তিকে সেই শৈশব থেকেই। কিশোরদের কাছে এই প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রীতিপ্রদ নয়, বিশেষ করে যদি বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন প্রতিযোগিতার উপর অতি-গুরুত্ব আরোপ করেন। মাতাপিতার প্রতি আমরা চিকিৎসক হিসেবে দোষারোপ করি বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই প্রতিযোগিতা—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিষম, এবং এই শ্রেণীসমাজের সাংগঠনিক ও আনুষ্ঠানিক আদর্শ অথবা স্বাভাবিক কর্মসূচীর অঙ্গ, যাকে বলা হয় 'সোশ্যাল নর্ম'। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ না করতে পেরে যে সব কিশোর-কিশোরীর কোমল মনে আঘাত লাগে, তাদের কিছু কিছু হয়তো বড় হয়ে মনোরোগে আক্রান্ত হয়, হীনমন্যতায় ভোগে। অনেক সময় পরীক্ষায় পিতামাতার আশানুরূপ ফল করতে না পেরে ছেলেমেয়েরা আত্মহত্যাও করে। আমাদের দেশে আত্মঘাতীর সংখ্যা অন্য দেশের তুলনায় বেশি না হলেও ক্রমশ যে বেড়ে চলেছে—এ বিষয়ে অনেকেই বোধ হয় আমার সঙ্গে একমত হবেন। এই প্রতিযোগিতা ঘটে প্রায়শঃই একই শ্রেণীর (আর্থিক) ছেলেমেয়েদের মধ্যে; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে অতি তীব্র

বিষম ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা শ্রেণী-সমাজেরই বিশেষত্ব। এ বিষয়ে বাজারে চলতি মনোবিদ্যার পুস্তক লেখকরা খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না। শিক্ষালাভের সুযোগ যাদের নেই, যাদের কথা এই অধ্যায়ের গোড়াতেই লিখেছি ; তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আছে ; কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় অসাফল্যকে তাদের সমাজে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়না (বুর্জোয়া সমাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব এদের খুব বেশি পরিমাণে সংক্রমিত করেনি) ; তাই অসাফল্যে তারা মনের দিক থেকে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, সহযোগিতাও আছে। কিশোর-কিশোরীরা বয়ঃক্রমের কম বেশি অনুযায়ী দল বাঁধে, ক্লাব গড়ে, অনেক সহযোগিতামূলক কাজকর্মও করে। যে শ্রেণীর কিশোর-কিশোরীদের কথা পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় তারা বেশির ভাগই সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পড়ে। 'পীয়ার গ্রুপ' কথাটি আমরা ইতিমধ্যে কয়েকবার ব্যবহার করেছি ; কথাটি মনস্তত্ত্বের পুস্তকে খুবই প্রচলিত। অনেকেই মনে করেন শিশু ও কিশোর মানসিকতা গঠনে মাতাপিতা ও 'সমবয়সী'দের প্রভাবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ (Coleman, 1971, opcit p, 55)। কিন্তু অন্যান্য প্রভাবকে আজকের দিনে তুচ্ছ করা চলে না। সমবয়সীদের প্রভাবকে এঁরা আলাদা আলাদা করে বিচার করেননি। মধ্য কিশোর ও অন্ত কিশোরদের দল বা গোষ্ঠী নানা রকমের আছে ঃ সহপাঠী, পাড়ার ছেলে, আত্মীয় স্বজন, ক্লাবের ছেলে আছে ; এ ছাড়াও হালে আবার রাজনৈতিক গোষ্ঠী সব পাড়ায়, মহল্লায়, এবং স্কুলে তৈরী হয়েছে। এরা সবাই আলাদা 'পীয়ার গ্রুপ'। এদের সকলেরই কিছু কিছু প্রভাব মিশুকে স্বভাবের বহির্মুখীন কিশোরদের ওপর পড়বেই। কিশোর নিজের 'পীয়ার গ্রুপে'র চর্চার বিষয় বা ক্রিয়াকলাপের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হবে, যাদের সংগে বেশি আত্মীয়তা ও নৈকট্য অনুভব করবে ; তাদের প্রভাব তার ওপর বেশি পড়লেও অন্য গ্রুপের, প্রভাবও নগণ্য হবে না। এ মিশ্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা আগে একবার বলেছি। আবার যে কিশোর অন্তর্মুখীন, অথবা শুধু শিল্পসাহিত্যে অনুরাগী, সেও নানা ধরনের নন্দনতত্ত্বের বিকর্ষণ আকর্ষণের মধ্যে পড়বে। কোনো বিশেষ 'পীয়ার গ্রুপে'র প্রভাবে কিশোর বড় হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। আজকালকার কিশোরদের রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ স্বাধীনতাপূর্ব কিশোরদের থেকে বেশি না কম এ নিয়ে কোন সমীক্ষা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কলেজ-স্কুলে সব

রাজনৈতিক দলের প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন আছে ; এ-থেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে কিশোর-কিশোরীরা স্বাধীন ভারতে আগের তুলনায় অনেক বেশী রাজনীতিমনস্ক। এই সব কিশোর-কিশোরীরা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি বাক্‌পটু, বহির্মুখীন, একরোখা এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে। এরা বেশি সমাজসচেতন, না এদের রাজনীতিক দলের সংগে যুক্ত হওয়া আদর্শের অনুপ্রেরণা, অথবা আত্মপ্রকাশের তাগিদ ও আত্মরক্ষা-ভিত্তিক প্রবৃত্তি—সে কথা বলা কঠিন। এরাই কিন্তু একমাত্র কিশোরগোষ্ঠী যারা সংঘবদ্ধ ও যাদের নির্দিষ্ট কোনো 'পীয়ার কালচার' আছে বলা চলে। তবে বয়স বাড়ার সংগে সংগে এদের রাজনীতিক মতবাদে পরিবর্তন ঘটতে পারে। এরা সাধারণত কোনো তরুণ বা বর্ষীয়ান নেতার অনুবর্তী, দল নেতার বা মত পরিবর্তনের সঙ্গে এদেরও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। এই ব্যাপারটা প্রথম দিকে পরিবার বা গুরুজনদের কাছ থেকে গোপনে রাখা হয়। যদি গুরুজনদের একই রাজনৈতিক রং থাকে তবে অবশ্য লুকোচুরির প্রয়োজন হয় না। অনেক সময়, বিশেষ করে গত দশকের আন্তর্জাতিক ছাত্র আন্দোলনের যুগে দেখা গেছে মাতাপিতার রাজনৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক মতামতকে কিশোররা (তরুণ ছাত্রদের অনুকরণে) অগ্রাহ্য করে অন্য ধরনের তত্ত্বাশ্রয়ী হয়েছে। আমি কিন্তু অন্ত-কৈশোরের ও মধ্য-কৈশোরের কথা বলছি। অল্পবয়সী কিশোররা সাধারণত খেলাধুলো, সিনেমা নিয়েই ব্যস্ত থাকে ও পারিবারিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। মধ্য ও অন্ত কিশোরের ক্ষেত্রে চলতি মনস্তত্ত্বের পুস্তকে তাদের যৌনতা, খেলাধুলো, ও অস্বাভাবী আচরণ সম্বন্ধে বেশি লেখা হয়েছে ; রাজনৈতিক প্রবণতা নিয়ে সাময়িক পত্রের পাতায় আলোচনা হলেও পাঠ্য পুস্তকে এ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু লেখা হয়নি। বর্তমান সময়ের কিশোরদের ওপর মাতাপিতা ও সমবয়সীদের প্রভাব, 'পেরেন্টাল ও পীয়ার কালচার'—দুই কালচারেরই প্রভাব ক্ষীয়মাণ বলে মনে হয়। মা-বাবা, শিক্ষকদের অপেক্ষা কিছু সংখ্যক কিশোর-কিশোরীর উপর রাজনৈতিক দাদাদের, আর কিছু সংখ্যকের উপর সিনেমা-নায়ক ও খেলার মাঠের হিরোদের প্রভাব বেশি—একথা বললে বোধহয় অনেকেই প্রতিবাদ করবেন না। শ্রেণীসমাজের পরিবৃত্তিকালীন সংকটে আজকের কিশোর-কিশোরীদের মনে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ও সেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নানারকমের প্রতিরক্ষামূলক মানসিকতা দেখা দিয়েছে এবং সমস্যা

সৃষ্টি হয়েছে, তাই নিয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করব।*

সারাংশ

পরিবেশের প্রভাব

পরিবেশকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) প্রাকৃতিক, (খ) সামাজিক। সামাজিক পরিবেশকে আবার আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক দুই দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। মানবপ্রকৃতিজাত গুণ ও ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশে পরিবেশের ভূমিকাই প্রধান।

মানুষের দেহের গঠন, গায়ের, চুলের বা চোখের রঙ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। শক্তিসামর্থ্য, কষ্ট সহ্য করা ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা ইত্যাদি কিছু কিছু মানবিক ধর্মও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে কম বেশি হয়। অবশ্য বিভিন্ন গবেষকের অভিমতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কঠোর পরিবেশে অবস্থিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ ও জার্মান সেনাবেষ্টিত লেনিনগ্রাডের অধিবাসীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা উদ্বেগজনিত অসুখ দেখা যায়নি।

জনবসতির ঘনত্বের উপর অনেকে গুরুত্ব দিয়েছেন ও আবার অনেকে প্রধানত ইঁদুর নিয়ে এই সব পরীক্ষানিরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। অনেকেই মনে করেন যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশই প্রধানত কিশোর-মানসিকতা গঠনের জন্য দায়ী।

অনুন্নত দেশের চেয়ে উন্নত দেশের শিশুমৃত্যুহার অনেক কম; কিন্তু শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার উন্নত দেশে কম নয়। শিশুদের অভিজ্ঞতা তাদের কৈশোরকালকে প্রভাবিত করবেই। তাই শিশুদের কথা, কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ এই অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রভাবের ব্যাপারে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। ধনী ও শিল্পোন্নত দেশের পণ্ডিতরা বোধ হয় তাঁদের পরিবেশের প্রভাবেই, তাঁদের সমাজ-সংস্কৃতিকে বজায় রাখবার জন্য নানাবিধ যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করেছেন। সেই সব যুক্তিতর্ক সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দরিদ্র দেশের লেখক ও পাঠকদের পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না।

* লেখকের পাভলভ পরিচিতি ২য় সংস্করণ, ১ম পর্ব থেকে গৃহীত।

COMPLIMENTARY

উৎস :

1. Huxley Aldous, Human Potentialities—Science & Human Affair, California, 1965.

2. Mc. Clemand, D. C. The Achieving Society, Princeton, N. J. 1961.

3. Coleman, Psychology and Effective Behaviour, Bombay 1971.

4. Moscow News, No. 16. 1982.

5. Calhoun, J. B., Population Density and Social Pathology 'Scientific American'. 1962.

6. Nag, Adolescents in India, Calcutta 1982.

7. Child in the third World, P. P. H., New Delhi, 1972.

8. Furst Joseph, The Neurotic, Citadel Press, New York, 1954.

9. Wells, H. K., The Failure of Psychoanalysis, International Publishers, New York, 1963.

10. Saul, Psycho-analytic Quarterly Vol. 18, No 2, 1949.

11. Mead. M, The Concept of Culture and the Psychoanalytic approach : Contributions towards Medical Psychology.(Ed. A. Wader), New York, 19/53.

12. Gordon Childe, What happened in history, 1964.

* 13. Merril. Society and Culture, New Jersey, 1962.

* 14. Chinoy, An Introduction to Sociology, New York 1961

* 15. Linton, The Study of Man, N.Y. 1936.

* 16. Levy, The Structure of Society, Princeton, 1952

* চিহ্নিত পুস্তকগুলিকে সহায়ক পুস্তক হিসাবে পাঠ করা চলে।

প্রশ্ন :

(1) দারিদ্র্য কি ভাবে শৈশবে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে ? উদাহরণ দিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত কর।

(2) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) 'প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব-(শিশুর দেহমনের উপর)' বিষয়ক অভিমত সংক্ষেপে বিবৃত কর।

(3) আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমতের আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিকীকরণ ও চরিত্র গঠনের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান

কৈশোরের বৃদ্ধি ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ও বয়ঃসন্ধির উন্মেষ ও প্রকাশকে কোন কোন স্তরে আকস্মিক মনে হলেও, বস্তুত এই আকস্মিকতা মাত্রাগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত রূপান্তর। বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিবেশে সামাজিকীকরণে ও বিশেষ শিক্ষাদানে প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের ভূমিকা বিভিন্ন হলেও বয়ঃসন্ধির শারীর-বৃত্তের জ্ঞান সবার পক্ষেই অপরিহার্য।

সাধারণত পরিবার, বিদ্যালয়, সমবয়সীদের দল বা ক্লাব (peer group), খেলার মাঠ, বিশেষ-সংঘ, ছাত্র সংগঠন, সংবাদপত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন এবং কিছু কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিশোরদের সামাজিকীকরণের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী এই সব প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃঙ্খলা, কার্যক্রম (শিক্ষাদানের বিষয়সূচি) ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। নীতিবোধ ও মূল্যবোধ দেশকালনির্ভর। সমসাময়িক উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রেখে সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রসরণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই নীতি ও মূল্য নির্ধারিত হয়। প্রচলিত রীতিনীতি, সংস্কার, আচার, অনুষ্ঠান, কৃত্যের সব কিছুই সমসাময়িক উৎপাদন সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। পুরনো অনেক কিছু আচার অনুষ্ঠান (Rituals)—আজকের উৎপাদন সম্পর্ক বা জীবনধারণের সংগে যার কোনো সম্পর্ক নেই—নতুন সমাজব্যবস্থায় টিকে থাকে। অধিকাংশ সামাজিকীকরণ প্রতিষ্ঠানের কাজ

শিশু ও কিশোরকে সমাজের সংগে সম্পৃক্ত রাখা, উৎপাদন টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে এদের নিয়োজিত করার জন্য শিক্ষাদান ; এদের ভবিষ্যৎ ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করা এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে এদের অবহিত করা।

'সামাজিকীকরণ' কথাটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার বোধ হয় প্রয়োজন আছে : বিশেষ করে আধুনিক সমাজে যখন বহুবিধ তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত এবং সমাজবিরোধিতার নানাবিধ অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। সমাজ, আমরা জানি, একই ধরনের জীবনধারণ প্রণালীতে অভ্যস্ত একদল প্রায় একই ধরনের মূল্যবোধে বিশ্বাসী জনগণের সমষ্টি। একই সমাজে একসময়ে একধরনের সংস্কৃতির—অর্থাৎ জীবনধারণ পদ্ধতি ও প্রণালীর প্রাধান্য থাকে। সামাজিকীকরণের অর্থ কিশোরকে তার নিজস্ব সমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত করা ও সেই সব তার মনে অনুপ্রবিষ্ট করা। উদ্দেশ্য সমাজের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষা। আদিম সমাজের কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে বিশেষ ধরনের গবেষণা করে Margarate Mead ও Ruth Benedict সামাজিকীকরণের দিকে বর্তমান কালের মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃবিদ্যাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরিবার ও কিশোর : সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা নিঃসন্দেহে মুখ্য ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে ৫০/৬০ বছর আগে যৌথ-পরিবারেরই আধিক্য ছিল। বাংলাদেশে তিরিশের দশক থেকে যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরে, আজকাল নানাকারণে খণ্ডিত পরিবার (nuclear family) সংখ্যাই বেশী। গত দুই দশকে পারিবারিক সংগঠনে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে ; শিশু ও আদিকিশোরের শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের ব্যাপারে পরিবারের ভূমিকা ঠিক আর আগের মতন নেই। আগের দিনে বড় পরিবারের একই বয়সী ছেলেমেয়েরা একই অবস্থার মধ্যে বেড়ে উঠত ; বাবা-মা নিজেদের শিশুদের ওপর সবসময় নজর রাখতেন না ; পরিবারের নিজস্ব বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে- বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নির্দেশিত আচার অনুষ্ঠান পালন করে শিশুরা বড় হত। আজকালকার ছোটো পরিবারে বাবা-মায়ের ওপরই শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের দায়িত্ব। শহরে পিতারা প্রায়ই সব সময় নিজের কাজকর্ম—চাকরী, পেশা, ব্যবসায় ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকেন ; কাজেই শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের দায়িত্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মায়ের ওপরই পড়ে। যেখানে পিতামাতা দুজনেই বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকেন, সেখানে

এই কাজের ভার মাইনে করা লোক, বেকার অথবা কোনো কারণে এই পরিবারের উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির ওপর পড়ে। তবে বড় বড় শহরে আজকাল খুব অল্প বয়স থেকেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য নার্সারী, কিন্ডারগার্টেন জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় বাচ্চারা। সামাজিকীকরণের কাজে এইসব বিদ্যালয়গুলির প্রভাব আজকের দিনে পরিবারের স্থলাভিষিক্ত না হলেও পারিবারিক প্রভাবের অনেকটা কাছাকাছি এসেছে।

কিন্ডারগার্টেন, নার্সারী অবশ্য সকলের জন্য নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারেই বাচ্চারা সামাজিকীকরণের প্রাথমিক পাঠ শুরু করে। পরিবার তাকে শেখায় কোন আচরণ তার জীবনধারণ ও বড় হওয়ার পক্ষে দরকারী। কি ভাবে চললে, কি ভংগী করলে তার জৈবিক প্রয়োজন মিটবে, তার নিরাপত্তা অব্যাহত থাকবে—এই পরিবারই—প্রধানত অভিভাবকরা তাকে শেখায়। আর একটু বড় হয়ে সে বুঝতে পারে পরিবারে নিজের স্থান ও ভূমিকা। সমাজের ভালমন্দ, নীতি, দুর্নীতি, বিধিনিয়ম শেখবার ও জানবার প্রথম পাঠশালা পরিবার। জটিল সমাজের বিন্যাস ও সংগঠনের রূপরেখা পরিবারের মধ্যে বিদ্যমান, পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে থাকে সামাজিক সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি পরিবারই সমাজের অংগ ; সমাজের ছোট সংস্করণ, কিন্তু প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব কিছু স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকে। আমাদের মত মিশ্র সমাজে ধর্মভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক (আর্থিক), ভাষাভিত্তিক বহু স্বতন্ত্র পরিবার আছে। এছাড়া প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (ঐতিহ্যগত, বংশকুলগত) আছে ; আভিজাত্য, কৌলীন্য ইত্যাদি সামন্ততান্ত্রিক যুগে যতটা গর্বের বস্তু বলে বিবেচিত হত, আজকের দিনে ততটা না হলেও, বংশ মর্যাদা এখনও কিছুটা সামাজিক মর্যাদার দাবি করে। হিন্দু মুসলমান—সব ধর্মের পুরনো পরিবারেই পূর্বপুরুষদের মহিমা কীর্তন করা হয়ে থাকে। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের যুগে পরিবারের বাইরে এ মহিমার মূল্য না থাকলেও, পরিবারের মধ্যে লালিত শিশুর কাছে এই মহিমার মূল্য কম নয়। আগেকার যৌথপরিবারের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ থেকে সমাজের উচ্চ নীচ ভেদাভেদের জ্ঞান জন্মাত প্রাক্‌কিশোর ও আদি কিশোরের। আজকের নিউক্লিয়ার পরিবারে মানুষ হওয়ার দরুণ নগরবাসী শিশু সেদিনের সমাজের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের জ্ঞান লাভ করে না। 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ' তাকে শেখানো হয় না, কিন্তু পিতা যে পরিবারের প্রধান, মায়ের চেয়ে তার প্রাধান্য বেশি, পাড়ায় বা বিদ্যালয়ে পিতার পরিচয়েই তার পরিচয়, পিতৃপ্রধান

সমাজের এই শিক্ষা শিশু শৈশবেই লাভ করে। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে, বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করার পর এই ধারণার অদল বদল ঘটে; কোন কোন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে শৈশবের অভিজ্ঞতা, তিক্ত, কটু, মিষ্ট বা আনন্দদায়ক—যাই হোক না কেন, কিশোর অনেকদিন অবধি মনে রাখে এবং সেই স্মৃতি তার মানসিক ও চারিত্রিক প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। তবে শিশু বয়স্কের পিতা (Child is the father of man) এই প্রবচনটি খুবই পরিচিত হলেও সত্য নয়। যাদের শৈশবের অভিজ্ঞতা কৈশোরে ও যৌবনেও তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাদের অগ্রগমন ব্যাহত হয়, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না। সোজা কথায় বলা চলে, তারা অসুস্থ ও অসুখী। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতাপিতার সঙ্গে কিশোরের সম্পর্ক বদলাতে থাকে। সমবয়সীদের দল, খেলার মাঠ, বিদ্যালয়, নানাধরনের কিশোরপাঠ্য পুস্তক—এই সব তখন কিশোরকে পারিবারিক জগতের বাইরে যে বৃহত্তর জগৎ—সেই জগতের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে। চেতনার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে; আত্মকেন্দ্রিক, পরিবারকেন্দ্রিক চেতনা ক্রমশ বহির্জগৎ-কেন্দ্রিক হতে থাকে। একদিকে অহংবোধ, অন্যদিকে আত্মাভিমান (amourpropre) বাড়ছে; জগতের বিশালত্বের আভাস পেয়ে, অন্যশক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেকে দুর্বল, অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগে মায়ের বুকের ওপর আধিপত্য হারিয়েছে, আঁচল ধরা অভ্যাসও ছেড়েছে, কিন্তু আদি কিশোর এখনও মাঝে মাঝে সেই প্রাককিশোরের স্বপ্ন দেখে বিশেষ যখন ছোট ভাই, ছোট বোন তার জায়গা দখল করেছে বুঝতে পারে। আবার পুরোপুরী স্বাধীন হয়ে, পরিবার ও মা বাবার এক্তিয়ারের বাইরে যাবার ইচ্ছাও প্রবল—সেই ইচ্ছার পালে হাওয়া লাগে যখন কিশোর-উপন্যাসের নায়কের সংগে নিজেকে একাত্ম মনে হয়। এক পা ঘরে, অন্য পা বাইরে দিয়ে ঘর ও বাইরে দু জগতেরই স্বপ্ন দেখে সে। এই দ্বন্দ্বের সহজ সমাধান না হলে কিশোর সমস্যার সম্মুখীন হয়। সাধারণত এই বয়সে সে অল্পেতে আহত হয়, অভিমানভরে দু এক সন্ধ্যা না খেয়ে দেখে মা আগের মত উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন কিনা। এই সময়ে অভিভাবকদের অবিবেচনাপ্রসূত সামান্য দুএকটা ঘটনা বা কথায় কিশোর মনে দারুণ আঘাত লাগতে পারে। আর একটু বয়স বাড়লে, মধ্যকৈশোর পর্বে প্রথম যৌনাকাংক্ষার উন্মেষের সময়টা পরিবারের অনেকেরই অলক্ষ্যে সে বদলাতে থাকে। কিশোরীরা দিদি বা মায়ের

কাছে কিছুটা সাহায্য পায়, কিছুটা জ্ঞান লাভ করে। কিশোর সে সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবার থেকে এই সময় সে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আরো কিছু পরে অন্তর্কিশোর পর্বে নতুন দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সম্মুখীন হয় কিশোর। মেয়েদের প্রতি রোমান্টিক ও যৌন আকর্ষণ প্রায় একই সংগে অনুভব করে। দুটোরই তাৎপর্যের মর্ম নিজে ঠিক বুঝতে পারে না। বহির্মুখীন কিশোর যদি সমবয়সীর বা কিছু বেশি বয়সীর অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলার চেষ্টায় সফল না হয়ে; খুবই মুস্কিলে পড়তে হয় তাকে। পড়াশুনোয় অমনোযোগিতা, পরীক্ষায় খারাপ ফল ইত্যাদির জন্য অভিভাবকরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শে মনের ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সময়কার সমস্যা যৌবনে অন্যভাবে দেখা দিতে পারে—সে আলোচনা এখানে নয়। এই সময় অন্য একটি সমস্যাও অনেক কিশোরকে পীড়িত করে। পরিবারের খুব আপনজনদের, বিশেষ করে মাতাপিতা সম্পর্কে একটা বাস্তব ও অন্যদের সংগে তুলনামূলক একটা ধারণা গড়ার চেষ্টা চলে কিশোর মানসে। শৈশবের ইমেজ এই নতুন ধারণা গড়ে ওঠার ফলে যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে কিশোর দারুণ আঘাত পায়। সেই আঘাতের ফল বিষময় হতে পারে। সম্মান ভালবাসার পাত্রের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবার যন্ত্রণা কিশোরকে দুষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করতে পারে, তার অন্তর্মুখীনতা বৃদ্ধি ক'রে তাকে অসামাজিক করে তুলতে পারে। আত্মঘাতী ও হত্যাকারী কিশোরের সংখ্যা অনেক দেশেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিতামাতাকে হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত কিশোর অপরাধীর সংখ্যাবৃদ্ধি সমাজের বিষম প্রতিযোগিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া বলে অনেকেই মনে করেন। উন্নত দেশে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগবৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং ধর্মীয় প্রভাবের ক্রমাবনতি এর জন্য দায়ী। কিছু সমাজতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকের এই প্রচার, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বের ইন্ধন জোগালেও আসল কারণের হদিশ তাঁরা দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। পারিবারিক এই দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্বেরই প্রতিচিত্র না হলেও প্রতিফলন—এই অভিমতে বরং বাস্তব সত্যের আভাস আছে বলা চলে। পারিবারিক সম্পর্ক যে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, শিশু নির্যাতন সমাজে ও পরিবারে বেড়ে চলছে—আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পঠিত লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এর আগে সেটা বলবার চেষ্টা করেছি। এবার আরো কিছু তথ্য দিয়ে কিশোর ও বর্তমান কালের পারিবারিক সম্পর্ক বিচার করছি।

(তৃতীয় অধ্যায়ে এর উল্লেখ আছে)— পারিবারিক সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে ওঠা, শিশু ও কিশোর নির্যাতনের সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে মাতাপিতা কর্তৃক শিশু হত্যার সংখ্যাও বাড়ছে। সামাজিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব, বেকারত্ব, কাজ হারাবার ভয় বয়স্কদের—মা বাবাকে নৃশংস করে তুলেছে।[১]

বছরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 4000 প্রাক্‌কিশোরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ন্যুইয়র্কে প্রতি সপ্তাহে অন্তত তিনটি শিশু নিহত হয়। ১৯৭৬ সালে ১০ লক্ষ প্রাক্‌কিশোর ও আদিকিশোরকে ছুরি এবং পিস্তল দিয়ে আহত করা হয়েছিল।

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকে 600 শিশুহত্যা সংঘটিত হয় এবং কয়েকশতকে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়। গ্রেটবৃটেনেও প্রতিসপ্তাহে মাতাপিতা অন্তত 6টি বাচ্চাকে হত্যা করেন এবং দারুণ দুর্ব্যবহারের প্রায় তিন হাজার ঘটনা ঘটে।[২]

টোকিও থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেছে গত বছর জাপানে অনুষ্ঠিত 1754টি হত্যাকান্ডের শতকরা 11টি পারিবারিক কলহের ফল। ১৯৭২ থেকে কিছুটা কমলেও পিতা কর্তৃক সন্তান নিধন, সন্তান কর্তৃক পিতামাতার জীবননাশ, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কলহের ফলে হত্যা, ইত্যাদি বড় রকমের পারিবারিক অপরাধের সংখ্যা এখনও একটা মস্ত সমস্যা। মাতা কর্তৃক সন্তান হত্যাকে এক মনোরোগ চিকিৎসক আত্মহত্যার সামিল বলে সাফাই গেয়েছেন। সন্তানকে নিজের অংশ বলে মনে করেন জাপানী মায়েরা। দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্যের দরুন সন্তানকে খেতে দিতে না পারার জ্বালায় আত্মহত্যা ও সন্তানহত্যা—এই সহজ সরল সত্যকে ঐ ভাবে ঢেকে রাখা যায় কি? তবে বর্তমানে যা দেখে সমাজ-তাত্ত্বিকরা ভয় পেয়েছেন সেটা হচ্ছে কিশোর পুত্র কর্তৃক পিতৃহত্যার প্রবণতা —যেটা এঁদের কাছে নতুন ও পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম নিদর্শন। একটি ছেলে দারিদ্র্যের তাড়নায় লেখাপড়া ছেড়ে কাজ করতে বাধ্য হবার কয়েকদিন পরেই পিতাকে হত্যা করে। পিতা সকলের ওপর

---

১ Child in the third world. p 91
২ Ibid p 94

এযাবৎ পিতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন শুধু সন্তানদের বেদম প্রহার করে। এছাড়া, পিতাপুত্রের সম্পর্ক বিষাক্ত হবার আর একটা কারণ—পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়বার অনুমোদন লাভের জন্য সন্তানের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। স্থানীয় এক ইংরাজী দৈনিকে একটি লেখা (The Statesman, June 20, 1982) পাঠকদের এক অংশের মনে বেশ কিছুটা বিভ্রান্তি ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। লেখক সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এসে সেখানে দারিদ্র্যজনিত আত্মহত্যার ক্রমবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনাপ্রসংগে লেখেন যে অন্তকিশোর ও যুবক তাদের বেকারত্ব ও অসাফল্যের জন্যে পশ্চিমী মনস্তাত্ত্বিকদের অভিমত অনুযায়ী নিজেদের অপদার্থতাকেই দায়ী মনে করে। তাই অসার্থক অপদার্থ জীবনটাকে অনায়াসে ধ্বংস করে। ঐ লেখক আত্মহত্যার এই প্রবণতাকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান বলে মনে করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের জন্যই গলাকাটা প্রতিযোগিতা – (পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার জন্য নয়) – এই মতবাদ ব্যক্ত করে তিনি খুব নতুন কথা বলেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিমী শিল্প-অগ্রসর দেশগুলির বিষম প্রতিযোগী সমাজব্যবস্থা, পণ্যপূজার প্রবণতা এবং মানুষে মানুষে সংযুক্তির পরিবর্তে বিযুক্তি ও বিচ্ছিন্নতা শিল্পে সাহিত্যে সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায় প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। আউটসাইডার কথাটি চালু হয় এবং বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। ঐশ্বর্যের পাশাপাশি নীচুতলার মানুষের অভাব-অনটন ও চারিত্রিক অধঃপতন, চিন্তাশীল দার্শনিক, ভাবপ্রবণ অন্তকিশোর ও তরুণদের মনে আর্থিক সচ্ছলতার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগায়। আত্মিক মুক্তির তাড়নায় অথবা বিচ্ছিন্নতার বিড়ম্বনায় অনেকে 'ইস্টার্ণ'-মিস্টিসিজমের' প্রতি আকৃষ্ট হন। গ্রেটবৃটেনে ও যুক্তরাষ্ট্রে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বিট্‌নিকস ও হিপিদের বিচিত্র জীবনধারণ—(ভারতের ভিক্ষাজীবি ও সমাজত্যাগীদের সংগে এদের তুলনা চলে না) প্রণালী অনেককে আকৃষ্ট করে। এখন হিপিবিটী নেই বটে কিন্তু ভারতীয় যোগশাস্ত্র, আত্মোন্নতিমূলক ধ্যান, নামজপ ও নাম-কীর্তন পশ্চিমী জীবনচর্যাকে আরো বেশি প্রভাবিত করেছে। ধর্মীয় প্রভাব ওদেশে এদেশে কোথাও কমেছে বলে মনে হয় না। ভারতীয় সাধু-সন্তদের প্রতিপত্তি আমেরিকায় দিন দিন বাড়ছে। এদেশে দাদাজি, বাবাজি, মাতাজিদের আশ্রম সংখ্যা বাড়ছে এবং রত্নধারণ ও শান্তিস্বস্ত্যয়নে ভাগ্যদেবীর কৃপালাভের জন্য ভক্তের অভাব ঘটছে কি ? আত্মহত্যা বৃদ্ধি মানেই জীবন ও

বিশেষ করে, পারিবারিক জীবনধারার বিপর্যয় ও বিশৃংখলা; পরিবারের সভ্যদের মধ্যে সদ্ভাব সত্যিকারের আকর্ষণ ও আস্থার অভাব। দৈনিক পত্রিকার অভিজ্ঞ প্রবন্ধকার, পাঠ্য পুস্তকের অভিজ্ঞ লেখক সমাজ-ব্যবস্থার ও উৎপাদন সম্পর্কের জটিলতা, শ্রেণীবিদ্বেষের বৃদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতার ক্রমবিস্তারকে এড়িয়ে গিয়ে, আত্মহত্যা, খুনজখম, বর্বর প্রথায় পিটিয়ে ও পুড়িয়ে মারা, পিতৃহত্যা, সন্তান হত্যা ইত্যাদির কারণ বা ব্যাখ্যা কিছুই খুঁজে পাবেন না। ডেসমণ্ড মরিস, ডেলগ্যাডো ও স্কিনার এবং প্রাচ্যের মিস্টিকরা এই উৎকেন্দ্রিক ও অস্বভাবী ব্যবহারের দাওয়াই জানেন না।

পারিবারিক সুসংগতি ও সম্প্রীতির অভাবের জন্য কিশোর ও মাতা-পিতার সম্পর্কের ক্রম-অবনতি ও পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, সন্তানহত্যার ক্রম-বৃদ্ধির বিবরণ দিতে গিয়ে আমরা আমাদের মূল বক্তব্য থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়েছি বলে মনে হয় না। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, জাপানের মত আমাদের পারিবারিক সম্পর্কে গভীর ফাটল ও তিক্ততা না দেখা দিলেও পরিবার প্রথা ও পারিবারিক নিয়মানুবর্তিতা যে ক্রমশ শিথিল হচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—এ বিষয়ে আমার চিকিৎসক জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য অনেক আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক সমস্যা দেখে অনুমান করতে পারি। ছেলেদের ক্ষুধা মেটাতে না পেরে মা কিম্বা বাবা সন্তানকে হত্যা করে নিজের প্রাণ নিয়েছেন—এই জাতীয় সংবাদ গণমাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে থাকে। খুব ঘন ঘন না হলেও এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বাড়ী ছেড়ে কিশোর নিরুদ্দিষ্ট হচ্ছে, ফিরে আসছে, আবার নিরুদ্দেশের পথিক হচ্ছে—এ খবর কাগজে খুব বেশি না বেরুলেও, এই ধরনের যে সব ছেলেদের বাবা কিম্বা মা ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসছেন—তাদের সংখ্যা খুব কম নয়। মনে রাখতে হবে;—এই ধরনের খবর সব সময় পুলিশ বা সংবাদ-পত্রের কাছে পৌঁছয় না। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষা, একটা শিক্ষানবিশী চাকরীর জন্য এক হাজার আবেদনপত্র, নাম করা বিদ্যালয়ে ভরতি হবার পরীক্ষায় সুযোগ পাবার জন্য বা ছাপানো আবেদনপত্র কেনবার জন্য লাইন দেওয়া ইত্যাদি—জাপান, আমেরিকার সঙ্গে তুলনায় না গিয়েও বলা যায়—যে ভাবে প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা থেকে আমরা কিশোরদের মনের ওপর চাপবৃদ্ধির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করতে না পারলেও অন্তত এইটুকু বুঝতে পারি যে কিশোর জীবনের প্রারম্ভেই, এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক বিষম সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে সহজ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে

অকাল প্রৌঢ় হয়ে যাচ্ছে। মাদকাসক্তের সংখ্যা কিশোরদের মধ্যে যদি বৃদ্ধি পায়, কিশোরীরা যদি দরিদ্র মাতাপিতার অভাব অনটনের সংসার ছেড়ে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়, এবং এর ফলে যদি সন্তান ও মাতাপিতার সম্পর্ক তিক্ত থেকে বিষাক্ত হতে থাকে—তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? কিশোর সমস্যা জাপানের মত হতে বাধ্য যদি না এই সমস্যার প্রতি আমরা এখন থেকে নজর দিই এবং সমাধানের সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হই। ছোট পরিবারে—'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে' পারিবারিক সম্পর্ক তিক্ত হলে পরিবারের কর্তা ও পোষ্য উভয় পক্ষেরই সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা, কারণ মনের তিক্ত ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে কোন তৃতীয় পক্ষ সেখানে দুর্লভ।

আমরা আগেকার সমাজব্যবস্থায়—যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ও পুরোহিত-তন্ত্রের যুগে ফিরে যেতে আর পারব না। সেই ব্যবস্থায় আত্মহত্যা হয়তো কম ছিল, আনুগত্য বেশি ছিল, অননুগামিতা কিশোরবিদ্রোহ হয়তো ছিলনা—কিন্তু সামাজিক বৈষম্য ও সমাজপতি ও পরিবার প্রধানদের অত্যাচারের যেটুকু ইতিহাস জানা আছে তার ফলে পুরণো দিনে ফিরে যাবার ইচ্ছে, উপায় থাকলেও সাধারণ মানুষের হবে না। আবার পশ্চিমী ঢংএ পারিবারিক সংগঠন, মাতাপিতার সংগে সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন ও গড়ে তোলার প্রয়াসকে (যা আমরা কিছুটা অর্থনৈতিক কারণে বাধ্যতামূলকভাবে, এবং বেশিটা বোধ হয় আমাদের দুশো বছরের, হীনমন্যতাজনিত অনুকরণের ঝোঁকে) প্রশ্রয় দিলে চলবে না। আমাদের দেশে আমাদের সংস্কৃতির সংগে নতুন আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, উৎপাদন সম্পর্ককে নতুন ভাবে সমন্বিত করতে হবে—তাহলে বোধ হয় ভেঙ্গে পড়া পারিবারিক ব্যবস্থা, ক্ষীয়মান স্নেহ-ভালবাসা পুনঃস্থাপিত করা যাবে। কৈশোর সমস্যার অনেকটাই পারিবারিক, তথা সামাজিক সমস্যার সংগে জড়িত।

বিদ্যালয় ও কিশোর

বিদ্যালয়ের প্রথাগত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মোট শিক্ষার ভগ্নাংশ। তবুও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব খুবই বেশি, এবং কোন সমাজই তার নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া চলতে পারেনা। সকলকে সমাজের মূল্যবোধ, আচার আচরণ ইত্যাদিতে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গোড়ার দিকে। প্রথমদিকে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক ও পরিচালক ছিলেন ধর্মযাজক শ্রেণী; তাঁদের সাহায্যদান করে উৎসাহিত করতেন রাজারাজড়ারা। এখন প্রায়

সব দেশেই শিক্ষা সরকারী সংস্থা বা সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচালিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সামাজিকীকরণ নয়, সরকার পরিচালন ও উৎপাদন সচল রাখার জন্য প্রযুক্তিবিদ এবং নানাধরণের পেশার জন্য বুদ্ধিজীবি ও কুৎকুশলী সৃষ্টি করা। আরো সোজা কথায় বলা যায় যে আধুনিক সমাজ-শিক্ষার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য :—অর্থনীতি পরিচালনার জন্য ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য একদল দক্ষ ব্যক্তি সৃষ্টি করা ও শাসকশ্রেণী ও সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য প্রয়োজনীয় সমাজ নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম একদল শিক্ষিত ব্যক্তি সৃষ্টি করা। সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থাও পরিবর্তিত হচ্ছে, শিক্ষার বিষয়সূচীও বদলাচ্ছে। সব পরিবর্তনের মধ্যে শিক্ষা-পরিচালকদের নজর রাখতে হচ্ছে যে শিক্ষার মাধ্যমে বিশেষ করে কৈশোরে এমন এক শিক্ষাদানের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা যায় মধ্যে কিশোর তার নিজস্ব লক্ষ ও উদ্দশ্য ঠিকমত বুঝতে পারে।

প্রাথমিক ও বিশেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের নীচুর ক্লাস শিক্ষালাভের প্রধান প্রতিষ্ঠান। কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে শিক্ষা পেয়েছে পরিবারে, নার্সারী ও কিনডারগার্টেনে। এই শিক্ষার ফলে তার প্রাথমিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, মানসিক ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে পরিবর্ধন ঘটেছে—সেই পরিবর্দ্ধনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—আরো ব্যাপক ও বিস্তারিত করা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদাতাদের উদ্দেশ্য। কিশোর-কিশোরী বিদ্যালয়ের প্রোগ্রামের সংগে তাল রেখে ক্লাসের পর ক্লাসে নতুন নতুন পাঠ্যসূচির সংগে পরিচিত হতে থাকে; তার জ্ঞানবৃদ্ধি ও দেহের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বয়স বাড়ে এবং সংগে সংগে সমাজ চেতনা বাড়তে থাকে। প্রতিটি কিশোর কিশোরী এইভাবে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন যুবক ও পরে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে নিজ ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। বয়স বাড়ে, শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে, দায়িত্ব বাড়ে; পরিবেশ সম্পর্কে চেতনা বাড়ে। বাইরের জগতের অনেক কিছু কিশোরের মনোরাজ্যে স্থান লাভ করে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও শিক্ষকদের আচরণ সঠিক না হলে কিশোর-কিশোরীর শিক্ষালাভ ব্যাহত হয় এবং অভিযোজনের ব্যাপারে শিক্ষা সহায়ক না হয়ে বরং প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সমাজসম্পর্ক যত জটিল হয়, ধর্মীয়, ভাষাগত ও অঞ্চলগত পার্থক্য যত বেশি হয়, শিক্ষাব্যবস্থা ততই জটিল হয়, এবং শিক্ষাদান তত কঠিন হতে

থাকে। আমাদের মত বহুজাতি, বহুভাষা, অনেক রকম সংস্কৃতি যে সব দেশে বিদ্যমান, সেই সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান নিয়ে বাক্-বিতণ্ডা ও মতের পার্থক্য স্বতঃই বেশি হতে বাধ্য। তবে কিছু কিছু ব্যাপারে প্রায় সব দেশের শিক্ষাব্রতী ও মনস্তাত্ত্বিকরা প্রায় একই অভিমত পোষণ করেন। শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি, বিশেষ করে, কি ভাবে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বিষয়ে বেশি মনোযোগী করা যায়, কি ভাবে কর্তব্য অকর্তব্য শেখানো যায়, কি করলে কিশোরকিশোরীর প্রতিষ্ঠানের প্রতি, সমাজের প্রতি, সমাজের ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সভ্যের প্রতি আনুগত্য বাড়বে, তাদের আচরণ মার্জিত ও সমাজানুমোদিত হবে—এই সব বিষয়ে সর্বত্র প্রায় একই ধরনের কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় অভ্যাস বা আচরণ শিক্ষায় পুরস্কার বা প্রশংসা দ্বারা উৎসাহিত করার নিয়ম এবং অসামাজিক বা অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য শাস্তি বা তিরস্কার দ্বারা নিরুৎসাহ বা অনাগ্রহ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা প্রায় সব সমাজেই প্রচলিত। পিতামাতার মত শিক্ষক-শিক্ষিকাও ভালবাসার কথা বলে এবং ভালবাসা প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীকে শেখায় আগ্রহী করতে পারেন, আবার নিন্দা করে এবং ভালোবাসার বদলে নির্বিকার ভাব দেখিয়ে শিক্ষার্থীর ভুল ত্রুটি বা অবাঞ্ছিত আচরণপ্রবণতাকে দূর করতে সক্ষম। কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থীরা মাতাপিতা, শিক্ষক ইত্যাদি বড়দের অনুকরণ করে অনেক কিছু খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। বয়স্কদের আদর্শ অনুসরণ সব কিশোরদেরই স্বভাবজাত প্রবণতা। দেখে শেখাকে অনেকে পুরস্কারে উদ্দীপনাজাত শেখার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। চলচ্চিত্রে, থিয়েটারে, আজকাল আবার দূরদর্শনে আদর্শের প্রতীকদের আচরণ ও কার্যকলাপ কিশোরদের প্রভাবিত করে। এখনও বই-এর পাতার নায়করা কিশোরকিশোরীদের আদর্শ ও তাদের অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করেন।

ইতিহাসের রক্তমাংসের কার্যকলাপও অনেকের আদর্শস্থানীয়। অবশ্য এই সব প্রতীক ও আদর্শ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে বদলায়, আর বহুধর্মী বহুজাতিক দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে আদর্শও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কিশোর ও তরুণদের কাছে সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজনে বা স্থায়িত্ব দানে যে সব গুণ বা উপকরণের উপযোগিতা বেশি, কিশোরকিশোরীকে প্রতিষ্ঠানজাত শিক্ষার দ্বারা সেই সব গুণ ও উপকরণ মূল্যবান বলে নানাভাবে প্রচার করা হয় এবং সেই সব গুণ অর্জনে তাদের

উৎসাহিত করা হয়। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে অধিকাংশ কিশোরই খুব কাছাকাছি যারা থাকে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করে। তাদের কাছে সমাজ কি চায় তাদের জানা না থাকলেও, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব চেনাজানাদের প্রত্যাশা এবং প্রয়োজন তাদের জানা। তারা সেই প্রত্যাশা পূরণ করে তাদের প্রশংসা পেলেই নিজেরা সফল হয়েছে মনে করে। সমাজ পুরস্কার, প্রশংসা, আদর্শ ইত্যাদির সাহায্যে কিশোরের মধ্যে সমাজের পক্ষে হিতকর আচরণ গঠনে সচেষ্ট, কিন্তু সমাজের পরিচালকরা যদি বুদ্ধিমান হন তবে তাঁরা শুধু প্রত্যাশা পূরণের আচরণ বা ক্রিয়াকলাপেই সন্তুষ্ট থাকেন না; তাঁরা চেষ্টা করেন যাতে কিশোরকিশোরী সামাজিক সত্তার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে একাত্ম হয়ে যায় এবং সমাজের মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন না থাকে। এ রকম আশা করা স্বাভাবিক, কিন্তু এ আশা পূরণ খুব কম ক্ষেত্রেই হয়। প্রায় সব সমাজ-ব্যবস্থাতেই বিবাদমান বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে, কাজেই সমাজের সকলের কাছে সমান মূল্যবান, সর্বজনগ্রাহ্য কোনো 'মডেল' পাওয়া যায় না। এ ছাড়া শিক্ষাদান ও সামাজিকীকরণের ব্যাপারে এই কথা মনে রাখা দরকার যে 'হোমো-স্যাপিয়েনস'-এর স্বার্থে, মানবগোষ্ঠীর স্বার্থে যে সব গুণাবলি অর্জন করা দরকার, সে গুলোকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। তারপর আমাদের নিজেদের সমাজ-সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবার বিদ্যা ও গুণার্জনে মনোনিবেশ করা উচিত। আগেকারদিনে এ ধরনের চিন্তা কোনো সমাজতাত্ত্বিক বা শিক্ষাবিদের মনে আসতো না। তখন পৃথিবী ছিল অনেক বড়, তার অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভর ও আত্ম-কেন্দ্রিক। কিন্তু আজ সব দিক থেকেই পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে, অধিকাংশ অঞ্চল ও অঞ্চলের অধিবাসীই পরস্পরের কাছে পরিচিত, ভীতিপ্রদ বা রহস্যময় নয়। চাহিদা আজ অঞ্চলভিত্তিক নয়, অনেকখানি সর্বজনীন। প্রায় সবকিছুর জন্যই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী আজ পরস্পরের উপর নির্ভর-শীল। পারমাণবিক যুদ্ধ, জনসংখ্যাবিস্ফোরণ, বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্র দূষিত-করণ, ইত্যাদির ভয়ে আমরা সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত। সমগ্র মানবজাতি আজ অভিন্ন স্বার্থে অন্বিষ্ট। তবুও আঞ্চলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে, প্রতিদিন আঞ্চলিক যুদ্ধ বিগ্রহে প্রচুর লোকক্ষয় অর্থক্ষয় হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে 'জাত্যাভিমান' এর কারণ মনে হলেও অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক বৈষম্য এর মূল কারণ।

বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যাকে আবিষ্ক্রিয়ার কাজে লাগাতে পারলে এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কিছুটা দূর হলে, মানুষের অনাহার-অনটনের সমস্যা অনায়াসে দূর করা যায়—একথা আজ অনেকেই মেনে নেবেন। খুবই অল্প সংখ্যক মানুষের লোভ ও লালসা মেটাতে পৃথিবীর সম্পদের যদি অপচয় না ঘটে, বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর যদি অস্তিত্ব বিলোপ করা যায়, তাহলেই প্রজাতি সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধির উপায় ও সূত্র সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে এই শিক্ষাই সব দেশের কিশোরকিশোরীদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থ আঞ্চলিক স্বার্থের চেয়ে প্রজাতি স্বার্থ অনেক বেশি মূল্যবান—আজকের কিশোরকিশোরীদের এই শিক্ষা সর্বাগ্রে দিতে হবে।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের পুস্তকে '' 'আত্মকল্পনা' (self concept) 'আত্ম-কেন্দ্রিকতা' (self-centeredness) 'আত্ম সচেতনতা' (self consciousness) ইত্যাদির আলোচনা প্রসংগে এমন সব কথা বলা হয়ে থাকে যা পড়ে মনে হবে যে—সব কিছুই আপেক্ষিক, মূর্ত ধারণা ও বিষয়মুখীনতা (concrete idea and objectivity) বলে কিছুর বোধহয় অস্তিত্ব নেই'।' আত্মসচেতনতা দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিক অন্য অর্থে ব্যবহার করেন। প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে পরিবর্তিত করে নিজেকে নিজের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের থেকে আলাদা করে দেখতে শেখে। কিন্তু শ্রমের চরিত্র সব সময়েই সামাজিক, কাজেই আত্মসচেতনতার ফলে ব্যক্তি নিজেকে এক ঐতিহাসিক গঠনতন্ত্রের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ ও অন্য মানুষকে নিজের মতই মানুষ (অভিন্ন সমরূপ) ভাবে। আত্ম বা ব্যক্তিকে বুঝতে হলে, আত্ম-সচেতনতার স্বরূপ জানতে হলে ব্যক্তিকে সামাজিক উৎপাদন ক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। আত্মসচেতন ব্যক্তিই পরিবেশের বাস্তব মূর্তরূপ, এবং সামাজিক পরিবেশে নিজের ও সমাজের অন্যান্য (তার মত) ব্যক্তির সম্পর্ক বুঝতে পারে। (৮) ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে পুঁজিবাদী সমাজে। বর্তমান অবস্থায় যখন আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে এই বিশেষ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার শ্রম ও শ্রমোৎপন্ন বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন, তার পাশে দাঁড়িয়ে যে কাজ করছে তার সংগে সম্পর্ক রহিত। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ ব্যক্তির কোনো মূল্য ছিল না, কোন বিশেষ ভূমিকা আছে কিনা বোঝা যেত না, প্রভুর প্রত্যক্ষ ইংগিতে পরিচালিত ক্রীতদাস ও ভূমিদাস

নিজেদের অকিঞ্চিৎকর মনে করতো। রেনেসাঁস ও শিল্পবিপ্লবের পর ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক ভূমিকা নির্ণীত হল। সামন্তপ্রভুর প্রাধান্য ও আধিপত্য হ্রাস পেল; কিন্তু ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে সে পুঁজিদাসে পরিণত হল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও তথাকথিত স্বাধীনতা কতখানি সীমিত সেটা যাতে সহজে সে বুঝতে না পারে তার জন্যেই বোধ হয় পশ্চিমী সমাজ-তাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকরা ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর অতি গুরুত্ব প্রদান করে বিচ্ছিন্নতার ও ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের নানাভাবে বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে এগিয়ে এলেন। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসী সরকারের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ গণতান্ত্রিক উদার বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গুণগান খুবই সময়োপযোগী হয়ে উঠল এবং এর সংগে সংগে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি যে রাষ্ট্রদাস এই প্রচার করার সুযোগও পাওয়া গেল। কিন্তু অনেক সৎ সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী "আউট সাইডার" ও বিচ্ছিন্ন মানুষের সন্ধান পেলেন তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় উৎসর্গীকৃত শিল্পোন্নত দেশে, এবং রায় দিলেন যে ব্যক্তি এই সমাজে অদৃশ্য সুতোর বাঁধা, অদৃশ্য হস্তপরিচালিত পুতুলের মত স্বাধীন। তবে খন্ডিত, বিভক্ত ও স্বতন্ত্র সত্তার ছবি যে অটোমেটনের—এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত হলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্তঃ-কিশোর ও তরুণদের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ আমেরিকা থেকে ফরাসী দেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অস্থির করে তুলল, মনে হল বুঝি যে বিষম সমাজব্যবস্থার সব কিছুর সঙ্গে কিশোর তরুণদের মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টা চলেছিল, সেই সমাজ ব্যবস্থাই বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মামুলি সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টা পরিবৃত্তিকালীন সংকটে সার্থক হতে পারে না - এই সত্য সমাজের পরিচালক ও রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠলো। সূক্ষ্মতর কৌশলের খোঁজে তাঁরা শিক্ষাবিদদের শরণাপন্ন হলেন। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি স্বাধীনতা পরবর্তী কোনো সময়েই শাসক শ্রেণী বা শিক্ষার্থী কোনো পক্ষেরই উপযোগী হতে পারেনি। অনেক 'কমিশন ও রেকমেনডেশন'এর জন্য কালিকাগজ খরচ অনেক হয়েছে কিন্তু প্রয়োগ বা প্রায়োগিক ফলাফলের হিসেবনিকেশ কতটা হয়েছে বলা কঠিন। অনেকে হয়ত বলবেন, 'ধান ভানতে শিবের গীত' এর প্রয়োজন কি? আমার মনে হয় কৈশোর সমস্যার সংগে আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পৃক্ত। যে সময় হারফার্ড থেকে সরবোন ছাত্র

কিশোরদের বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল, সেই সময় আমাদের দেশের স্কুল কলেজেও ঠিক ঐ ধরনের বা ঐ মানের না হোক কিশোরকিশোরীদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, পরীক্ষাভন্ডুল, শিক্ষক নিগ্রহ ইত্যাদি ঘটনায় বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল : তাই আর্থরাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পটভূমির এই বিচারবিশ্লেষণকে আমি প্রয়োজনীয় মনে করতে পারি না। মনে হয়, অতি শীঘ্রই প্রজাতি বিলুপ্তির ভয়ে উন্নত অনুন্নত সব মানবগোষ্ঠী জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রজাতি সংরক্ষণের কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হবে। সব দেশের কিশোরকিশোরীদের পাঠ্যসূচিতে মানবিকীকরণ জাতীয়করণের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে। সামাজিকীকরণের অর্থ অনেক ব্যাপক হয়ে সমগ্র জাতির স্বার্থে অন্বিত হবে।

আদর্শগত বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ফলে কিশোরমনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই আদর্শগত বিরোধ : সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক সব ধরনেরই হয়ে থাকে। আজকাল সব দেশের বেশ কিছু সংখ্যক কিশোর রাজনীতি ও সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন ও এর কারণ জানতে আগ্রহী। তারাই একদিন প্রজাতি স্বার্থে বিষম সমাজ বিলুপ্তির উপায় খুঁজে পাবে।

সমবয়সীর দল ও কিশোর : (Peer group) সমবয়সীর সঙ্গ সব বয়সের মানুষই চায় ; তবে কিশোরদের কাছে এই সমবয়সীর সঙ্গের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ সকলেরই জানা। আদি-কিশোরকে প্রাক্‌কিশোর বা শিশুর (বাংলায় শৈশবের বিভিন্ন পর্ব বোঝাবার মত ইনফ্যান্ট, বেবী-চাইল্ড জাতীয় কথার অভাব আছে ; থাকলেও আমার জানা নেই, তাই শিশু ও প্রাককিশোর – এই দুটি কথা ব্যবহার করছি) মত আর পারিবারিক গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারছে না, রাখলেও পরিবারের সভ্য বিশেষ করে, মা বাবার কাছ থেকে আর আগেকার মত আদরযত্ন পাচ্ছে না, যা পাচ্ছে তাতে তার প্রয়োজন মিটছে না। পরিবারের বাইরের আকর্ষণ তাকে পরিবারের গন্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে দিচ্ছে না, সেখানে নিঃসঙ্গ থাকলে নিজেকে অসহায় বোধ হবে, নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হবে, তাই আদি কিশোর সমবয়সীদের সঙ্গের জন্যে লালায়িত। মধ্য কিশোরদের শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনের রহস্য, তদ্দরুণ চাঞ্চল্য ও উন্মাদনা, যৌন-অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি কারণ, সমবয়সীদের সংগলাভে অনেকটা বাধ্য করে—কেননা অধিকাংশ দেশেই এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনায় পরিবারের অভিভাবক বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোনো উৎসাহ থাকে না, এবং কিশোরদের গুরুজন

সম্পর্কিত সংকোচ ও ভয় আলোচনার অন্তরায়। অন্ত কিশোররা বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক জেনেছে, জানার উৎসাহ বেড়েছে, পরিবারের আকর্ষণ, পরিবারের উপর নির্ভরতা, আর্থিক ছাড়া অন্য সব দিকেই অনেকখানি কমেছে, কথাবার্তা, হাবভাব, পোষাকপরিচ্ছেদে বড়দের অনুগামী না হয়ে পিয়ার গ্রুপের অনুগামী হওয়ার পথে বিশেষ কোনো বাধা নেই। বয়স্করা তাঁদের অভ্যাস, বিশ্বাস, মূল্যবোধে (কার্যত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজায় রাখা সম্ভব না হলেও) অনড়, এবং আজকালকার ছেলেদের সব কিছুরই সমালোচক হলেও, তাদের নিজেদের মত চলবার পথে বিশেষ বাধা দিতে চান না: বোধ হয় জানেন, বাধা দিয়ে ফল হবে না। তাঁরাও নিজেদের 'পিয়ার গ্রুপের' আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ, আচারব্যবহারের অনুগামীই থাকতে চান। আগেই উল্লেখ করেছি, সমাজ যতই জটিল হচ্ছে নানাধরনের আদর্শ, ইত্যাদি সম্পর্কে কিশোর অবহিত হচ্ছে, নানাদেশের সংস্কৃতি ও সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতি তাদের কাছে গণমাধ্যম তুলে ধরছে, ফলে বিভিন্ন মতাবলম্বী 'পিয়ারগ্রুপের' সংখ্যা বাড়ছে; 'পিয়ার গ্রুপের আকর্ষণও বাড়ছে। তা ছাড়া, মা বাবা অভিভাবকদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও বয়স্কদের দ্বারা অবহেলিত বা বাচ্চা বলে বিবেচিত হবার ফলে জোটবাঁধা ও কোনো দলের সঙ্গে একাত্ম হওয়া মানসিক কারণে অত্যাবশ্যক ওদের কাছে। আর পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব কাঁধে না থাকার দরুন, সমবয়সীদের দলে মেশা ওদের পক্ষে অনেকটা সহজও বটে। অনেক কিশোরকিশোরীর সংগে চিকিৎসক হিসেবে অন্তরঙ্গ হবার ফলে বুঝতে পেরেছি ওরা নিজেদের সত্যই অনাদৃত মনে করে, শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে ওরা সত্যিই কিছুটা অবহেলিত এবং সামাজিক ও পারিবারিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ওদের নেই। কিছুদিন আগেও তাদের বাধ্যতা ও অনুগামিতা—অন্তত মধ্যকৈশোর পর্যন্ত ছিল প্রত্যাশিত ও অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার; এর ব্যতিক্রমকে মনে করা হত অস্বাভাবিক বা দুর্ঘটনা। আজ ব্যাপারটা ঠিক আগের মত নেই। অন্য অধ্যায়ে এই বিষয় আলোচিত হবে। তখন চিন্তনীয় একই কিশোরের বহু দলের (পিয়ার গ্রুপের) সভ্য হওয়ার ফলে উদ্ভূত সমস্যা ওদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির পক্ষে 'পিয়ার গ্রুপ' অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে এই গ্রুপের প্রভাব নানা কারণে বড় বড় শহরে অনেকটা ক্ষীয়মান। সাধারণত ছোট ছোট গ্রুপের সভ্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে; ছোট গ্রুপই ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও

পারস্পরিক নির্ভরতার পক্ষে অনুকূল। বড় সহরে ছোট ছোট গ্রুপের সংখ্যা কমে আসছে, বড় বড় সংগঠন গড়ে উঠছে। এই সব সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বিশেষ ধরনের, লক্ষ সাধারণত একমুখী। তাই এইসব সংগঠন কিশোরদের পরিবার থেকে বিযুক্ত হবার দরুন বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রয়োজন মেটাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সক্ষম নয়। পরিবারের উষ্ণতা আজকালকার বেশির ভাগ কিশোর গ্রুপের মধ্যে নেই। সেই উষ্ণতা এবং মানসিক নিরাপত্তার জন্য যে অনুগামিতা কিশোরদের মধ্যে ছিল, আজকাল তার অভাব ঘটেছে।

গণমাধ্যম ও কিশোর: সংবাদপত্র, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির ভূমিকা, মানসিকতা ও চরিত্র গঠনে এবং সামাজিকীকরণে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব লাভ করছে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য বাইরের বই-এর প্রভাবকে এ ব্যাপারে অবহেলা করা চলে না। শিক্ষিতের হার কম, কাজেই সংবাদপত্র ও বাইরের বই-এর প্রভাব রেডিও সিনেমার চেয়ে অনেক কম। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের চেয়ে গণমাধ্যমের শক্তি-বিশেষ করে রেডিও এবং সিনেমার প্রভাব অনেক বেশি ব্যাপক। সিনেমা, টেলিভিশন দর্শন শ্রবণ—এই দুই প্রধান ইন্দ্রিয়কে একই সঙ্গে উদ্দীপ্ত করে, তাই এই দুই মাধ্যম বিশেষ শক্তিশালী। আমাদের দেশে টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসার সুযোগ খুব কম সংখ্যক কিশোর-কিশোরীর ভাগ্যে ঘটে, তাই গণমাধ্যমের মধ্যে সিনেমাই এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল কলেজের কিশোরকিশোরীদের উপরও সিনেমার প্রভাব কম নয়।

আদি-কিশোর মধ্যকিশোরকে আকৃষ্ট করবার জন্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকায় মজাদার ও দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী চিত্রের প্রধানত ব্যঙ্গ চিত্রের (cartoon) মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিশোরকিশোরীদের অনেকেই এই কাহিনীর নায়কের ভক্ত হয়ে ওঠে। মধ্য ও অন্ত কৈশোরের আকর্ষণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ধাঁধা ও শব্দ-হেঁয়ালি (Cross-word Puzzle) ; এছাড়া সপ্তাহে দৈনিক পত্রিকার একদিনের একটি পৃষ্ঠার কিছুটা অংশে কিশোরদের জন্য নির্বাচিত গল্প কবিতা প্রকাশিত হয়। আর খেলার খবরে ছোটরা বড়দের চেয়ে বেশি আগ্রহী। অন্যান্য খবর সকলকে আকৃষ্ট করে না। পারিবারিক প্রভাব ও সমবয়সীদের সংগঠনের প্রভাব অনুযায়ী কিশোরদের রুচি ও আগ্রহ

গড়ে ওঠে। কিশোরকিশোরীদের জন্য সব আঞ্চলিক ভাষাতেই মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কৈশোরকালে বুদ্ধির বিকাশ, শারীরবৃত্তিক ও মানসিক পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। আদি-কিশোর ও অন্ত-কিশোরদের একই লেখা খুব কম ক্ষেত্রেই আকৃষ্ট করে। তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমাত্রার অনেকখানি পার্থক্য। এগারো বছরে ও উনিশ বছরের ছেলেমেদের জন্য লেখার বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী এক হতে পারেনা। একটা কথা এখানে বলা দরকার। কৈশোরপর্ব বিভাগের ব্যাপারে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বুদ্ধিগ্রাহীক্ষমতা, প্রক্ষোভের বিকাশ, স্বাভাবিকভাবে বয়সের অনুপাতে সমমাত্রায় ঘটেছে। বাস্তবে কিন্তু সমমাত্রিক বিকাশ খুব কমই ঘটে থাকে। মস্তিষ্কের টাইপের ও স্নায়ুসংস্থার সংবেদীয় ও চেষ্টিত ক্ষমতার বিভিন্নতা এবং প্রক্ষোভের তারতম্যের (ভ্রূণ ও প্রাক-কৈশোর পরিবেশের বিভিন্নতা এই পার্থক্যের জন্য দায়ী) ফলে কিশোরের বিকাশ ও বৃদ্ধি সবসময়ে কালক্রমানুসারী হয় না।

অনেক দেশে কিশোরদের জন্য নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র প্রোগ্রামের ব্যবস্থা থাকে; টেলিভিশনে অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। শিক্ষণ সামাজিকীকরণের ব্যাপারে ট্রানসিসটার রেডিও গুরুদায়িত্ব পালন করে। কিন্তু বড় শহরে টেলিভিশনের পর্দার প্রতি কিশোরদের আকর্ষণ বেশি। শিক্ষাদানের ব্যাপারে টেলিভিশনের ভূমিকা সম্পর্কে উন্নত দেশে যে সব সমীক্ষা চালানো হয়েছে তা থেকে জানা গেছে যে প্রাক্-কৈশোরে টেলিভিশনের প্রোগ্রাম যতটা প্রভাবিত করে, পরবর্তীকালে আর ততটা করে না। প্রথম যখন বাচ্চারা টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে তখন এর নতুনত্ব তাদের চমৎকৃত করে, তাই তারা গোড়ার দিকে অনেক কিছু খবর জানতে পারে এবং মনেও রাখে। কিন্তু বাস্তব ও বিষয়মুখীন প্রোগ্রামের চেয়ে উদ্ভট কল্পনাশ্রয়ী প্রোগ্রামের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়; আর বারবার একই ধরনের বিষয়বস্তু দেখার ফলে বিষয়বস্তু ও কলাকৌশলের একঘেয়েমি তাদের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে এবং তারা কিছুদিনের মধ্যেই টেলিভিশনের পর্দায় আর কোনো মজা পায় না। (Human Development. Ed Ira J Gordon, Bombay, 1970, pp. 315-324) বাচ্চাদের জন্য থিয়েটার সব শহরে থাকে না; যেখানে আছে সেখানে আদি-কিশোর থেকে অন্তকিশোর—সকলেই থিয়েটার থেকে আনন্দ ও শিক্ষা দুইই লাভ করে। কিশোরকিশোরীদের জন্য আলাদা চলচ্চিত্র সব দেশেই নির্মিত হয়। কিশোরদের থিয়েটারে অভিনয়ে অংশ গ্রহণকারীরা সবাই কিশোর;

কিন্তু কিশোরদের জন্য তৈরী চলচ্চিত্রে অভিনেতা ও কলাকুশলীদের মধ্যে কিশোর বা শিশু মাত্র দুচারজন, আর সকলেই পূর্ণবয়স্ক। কাহিনীতে কিশোরদের আকৃষ্ট করার মত উপাদান থাকে। সিনেমা ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 'কমিকস', 'কার্টুন'—দুঃসাহসী অভিযান ও উদ্ভট কল্পনাকাহিনী কিশোরদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। পৌরাণিক কাহিনীরও চাহিদা মন্দ নয়। কিশোরদের জন্য আলাদা প্রেক্ষাগৃহ যেখানে আছে এবং যে দেশে সরকার কিশোরদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে পরিচালক প্রযোজকদের সাহায্য করেন সেই সব দেশেও অনেকে মনে করেন কিশোররা 'A' মার্কা অর্থাৎ বড়দের জন্য তৈরী, প্রধানত উত্তেজনাময়, ছবি দেখতে চায়। বলাবাহুল্য, এই সব চলচ্চিত্রের যৌন আবেদন ও অপরাধ-অনুষ্ঠান কিশোরদের বিশেষভাবে অভিভাবিত করে এবং অনেক সময় দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত করে।

পারিবেশিক প্রভাবের দরুন ছোট বড় নানা রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়। সে কথা পরে বলা হবে।

সারাংশ ও লেখকের বিশেষ বক্তব্য

সামাজিকীকরণের ও চরিত্র গঠনের প্রধান কয়েকটি প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের কথা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমবয়সী বন্ধুদের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গও এসে পড়েছে।

আমাদের সমাজব্যবস্থা—শুধু আমাদের কেন, বোধ হয় সব দেশেরই —পরিবর্তিকালীন সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। আজকের বাস্তব আগামী কালে অতীত ও কোনো কোন ক্ষেত্রে অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই সংকটের প্রমাণ ঘনঘন পাঠক্রম ও পঠনপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়াস। আজ কোনো দেশের সংস্কৃতি বা সমাজব্যবস্থা অন্য দেশের সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা দ্বারা অন্তত কিছুটা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। অথচ প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ শিল্পে ও শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থবিনিয়োগ সবদেশে এক রকম নয়। সকলেই এই বিজ্ঞানের যুগে একই পথে এগিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু নানা কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছেনা। এই দোটানার মধ্যে পড়ে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিশোর-কিশোরীরা। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক বদলে গেছে ও যাচ্ছে—এ কথা সবারই জানা। বিশেষ করে হার্ভার্ড থেকে

সোবচবোর সেই ছাত্রবিক্ষোভের স্মৃতি অনেকেরই মনে আছে। কিন্তু মাতাপিতার সঙ্গে পুত্রকন্যার সম্পর্ক এই সংকটকালে কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই সম্যক ধারণা নেই। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে প্রকাশিত কিছু তথ্য এই অধ্যায়ে পাঠকদের অবগতির জন্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। তথ্যগুলো প্রায় অবিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে।

সেই কারণে তথ্যও সংবাদগুলির উৎসের উল্লেখ করাটাই যথেষ্ট মনে হয়নি। তথ্য ও বক্তব্যগুলি লেখকদের ভাষায় উদ্ধৃত করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

Desmond Morris, B F. Skinner, J. M. Delgado সুপরিচিত ব্যক্তি; কিন্তু সব ছাত্র-পাঠক তাঁদের পরিচয় না জানতেও পারেন। তাই লেখকেরই একটি ইংরিজি বক্তৃতা থেকে কয়েক লাইন তুলে দিয়েছি। এর জন্যে যদি কোনো ত্রুটী হয়ে থাকে এবং আমার বিশেষ বক্তব্য যদি সন্তোষজনক মনে না হয়,—তা হলে আমার ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

(1) Execssive pressure of work and fear of being pushed into the army of millions of unemployed—unemployment, financial troubles, hopelessness,—all this very often causes explosions at home. Every act of individual brutality always reflects the environment which made competition and the brutal struggle of survival into a basic faith. (Child in the third world o. p. cit p. 94)

(2) ঐ পৃষ্ঠা ৯৪/৯৫

(3) Mothers killing children have a long history in Japan. Dr. Ireshi Irasmura, a psychiatrist and professor of Tsukula University said "because they think that their children are part of them ;" many mothers contemplating suicide feel a "tight psychological relationship" that demands that they take their offsprings with them " (The Statesman, Calcutta, July ৩, 1982)

(4) However a more recent trend that authorities say, alarms them most, is the rise in violence by children against

parents—a phenomenon practically unheard of before the world-war II (Ibid).

(5) Parent-child tensions are exacerbated among 12-14 year old students by intense pressure to perform well in studies and gain entrance to top high schools through competitive examination (Ibid)

(6) Desmond Morris an American author is internationally famous for his ideas that man is nothing but an animal without the coat of hairs. He is the worst of all animals from the power of indulging in sex and aggressiveness. His book 'Naked Ape' was the best seller in the sixties.

B. F. Skinner is more known than Morris for his 'operent conditioning' method for changing the behaviour of man, specially of young children by his special method of re-inforcement (reward and punishment). His famous book 'Beyond Freedom and Dignity' (Kropt, New York 1971) has been criticised by all progressive minded scientists for treating man as an experimental guineapig and making an automaton of him. Dr J M Delgado's treaties Physical Control of the Mind (New York, 1968) devised means and ways of remote control of minds by electronic devices" (From a spech by the writer)

(7) For as the individual achieves a sense of his identity, he tends to view each situation in the light of his own motives, assumptions and feelings.

Thus the effects of a particular environment becomes increasingly dependent upon the way it is experienced by the individual.....the Self, in other words, is not a mystical entity but a useful and seemingly necessary construct for explaining many aspects of individual behaviour (Coleman. op. cit, p 61)

(8) By changing nature he changes himself...He differentiates himself as a producer from the objects of his activity. But since labour is always of a social character man begins to be aware of himself as a particle a cell of the given historical system, regarding another man as similar to himself and seeing in him a man. Social consciousness can be understood only as a result of man's productive activity in society. (Dictionary of Philosophy, Moscow, 1967. pp. 403-404)

উৎস ঃ

(1) Child in the third World, Peoples' Publishing, New Delhi, 1979.

(2) The Statesman, Calcutta, July 9, 1982.

(3) Coleman, Psychology and effective Behaviour, Bombay 1971.

(4) Dictionary of Philosophy, Moscow. 1967.

সহায়ক পুস্তক

(1) Piaget, J—The language and thought of the child, New York, Harcourt, Brace & World 1926.

(2) Piaget, J.—The Moral Judgment of the child, London, Kegan Paul 1932.

(3) Rosenberg, M—Society and the Adolescent self Image, Princeton, University press, 1965.

(4) Rosenthal, R—Experimental effects in behavioral research, New York, Appleton Century Crofts Bers, 1964.

(5) Ivanov Smolansky A.G.—An approach to the study of higher forms of neurodynamics in the child—1934. Symposium proceedings.

প্রশ্ন :

(1) সামাজিকীকরণের সংজ্ঞার্থ কি? কৈশোরে সামাজিকীকরণের সম্ভাবনা বেশি কেন?

(2) সামাজিকীকরণের বিবিধ প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সংক্ষেপে লেখ।

(3) শিশু নির্যাতনের কিছু খবর মাঝে মাঝে শোনা যায়। এর কারণ বিশ্লেষণ কর।

(4) বর্তমানে শিশুদের ওপর পরিবারের প্রভাব বাড়ছে না কমছে? এ-সম্পর্কে তোমার অভিমত যুক্তিসহ বিবৃত কর।

(5) মানসিকতা গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাক্ কৈশোর

প্রাক্ কৈশোরের মানসিক বিকাশ : মনোবিদ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের ধারণা

শৈশব অর্থাৎ প্রাক্ কৈশোর সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকলে কৈশোর ও তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। যদিও শৈশবের গতি-বৃদ্ধি কৈশোরের গতিবৃদ্ধির সংগে সর্বাংশে তুলনীয় নয়, এবং কৈশোরকাল তুলনায় অনেক জটিল ও নানাধরনের উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত, তবু কৈশোরকে জানতে ও তার সমস্যার উপর আলোকপাত করতে হলে শৈশব সম্পর্কে জ্ঞান অপরিহার্য।

মানবশিশু খুবই অসহায়। অন্যান্য প্রাণীর মত জন্মের অল্প কিছুদিনের মধ্যে জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রহ তার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যের উপর নির্ভরতা ছাড়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা মানবশিশুর নেই। এই অসহায়ত্ব বা বিলম্বিত দীর্ঘ শৈশব মানব প্রজাতির সামগ্রিক মানসিকতা, তার সামাজিক ও পারিবারিক সংগঠনের বিশিষ্টতা এবং সন্তানের সংগে মাতাপিতার বিশেষ সম্পর্কের জন্য দায়ী। শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকে প্রয়োজন হয় ভালবাসার। বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত শিশুর নিরাপত্তা রক্ষা ও জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদ মেটানো। এর দায়দায়িত্ব মাতাপিতা অথবা মাতাপিতার স্থলাভিষিক্ত অন্য কোনো ব্যক্তির, যে শিশুকে

ভালবাসবে। স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে মানুষ জন্মায় না, কিন্তু মস্তিষ্কের ও স্নায়ুতন্ত্রের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সে জন্মসূত্রেই পায়, যার দৌলতে স্নেহ ভালবাসা নামক হৃদয়বৃত্তি স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে উন্মেষিত হয়। এই হৃদয়বৃত্তি, অন্যান্য সব মানসিক বৃত্তি ও মানবিক আচরণ স্বাভাবিক ভাবে উন্মেষিত হয় কিন্তু কেবলমাত্র সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে। কোনো কারণে মানবসমাজের বাইরে থাকলে, মানুষের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার মত উচ্চতর মানসিক বৃত্তি কেন, সোজা হয়ে হাঁটাচলা, কথাবলার মত সাধারণ মানবিক গুণ বা ক্রিয়াকলাপও গড়ে উঠতে পারে না। জন্মের দু একদিন পর থেকেই শিশুর মধ্যে মস্তিষ্কের উপর-ধীরে ধীরে সামাজিক উদ্দীপক-এর প্রভাবে মানবিক গুণাবলী সংগঠিত হতে থাকে। আত্মরক্ষার ও প্রজাতিরক্ষার সহজাতপ্রবৃত্তি নিয়ে মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে পরিবেশের সংগে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লেনদেনের মাধ্যমে ক্রমশ বাড়তে থাকে ও মানবসমাজে টিকে থাকার প্রয়োজনীয় গুণ ও ক্ষমতা আয়ত্ত করতে থাকে। এই আয়ত্ত করণের পদ্ধতি, নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকদের মতে মতভেদ আছে। প্রধানত নিম্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষাভিত্তিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারবাদী তত্ত্ব, পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্ব, ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান তত্ত্বের সংগেই আধুনিক বিজ্ঞানীরা বেশী পরিচিত। অনেকে আবার ভুল করে পাভলভীয় তত্ত্বকে ব্যবহারবাদী বলে মনে করেন। এ নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা আগেই করেছি। এখানে শুধু শিশুর চরিত্র ও মানসিকতা গড়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করব। এবং সাম্প্রতিক কালের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের সংগে পাঠকদের পরিচিত করব।

আগেই বলেছি, জন্মের কিছুদিন পর থেকেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তার মধ্যে অবশ্য কোন পরিকল্পনা বা নির্দিষ্ট ছক থাকে না। প্রাথমিক পর্যায়ের মানসিক প্রবণতা ও চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদানের সমাবেশ ঘটে জন্মের ৬ মাসের মধ্যে। প্রবৃত্তিচরিতার্থ করার অনেকটা ক্ষমতা নিয়েই নিম্নপ্রাণীর শাবক জন্মায়, মানবশিশুর সব কিছুই শিখতে হয়। শেখা বলতে এখানে জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার উপায় ও পদ্ধতি বুঝতে হবে। কথা বোঝা ও কথা বলার ক্ষমতা আয়ত্ত করার পূর্বে এই শেখা নিম্নপ্রাণীর শাবকদের মত অনেকটা যান্ত্রিক ভাবে ঘটতে থাকে। এই শেখার মধ্যে শিশুর সজ্ঞান প্রচেষ্টা থাকে না। মনে রাখা দরকার এই শেখার ব্যাপারে শিশুর সংবেদন নার্ভ-এরই ভূমিকাই প্রধান। চোষা, গেলা ও মলমূত্র

ত্যাগের ক্ষমতা নিয়েই শিশু জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু অন্য সব বিষয়েই শিশুর অজ্ঞতা সম্বন্ধে বড়রা সচেতন এবং জানেন যে বসা, হাঁটাচলা, কথাবলা—ইত্যাদি সবই তাদের শেখাতে হবে। এখানে একটা কথা স্পষ্টভাবে জানানো দরকার। সব শিশুই মানবিক কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থা নিয়ে জন্মায়। এই স্নায়ুসংস্থার গঠন ও বিন্যাসের মধ্যে জাতি বর্ণ সংস্কৃতিগত কোনো অন্তর্নিহিত পার্থক্য থাকে না। কোনো পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর শিশুকে যদি অতি-আধুনিক কোনো সভ্যসমাজে লালনপালন করা হয়, তবে সেই আধুনিক সমাজের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিকশিত হবে। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দরুন যে স্বাতন্ত্র্য—সেটা থাকবেই। এখনও বর্ণবৈষম্য, জাতি-বৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য, সভ্য বলে পরিচিত দেশে বিদ্যমান এবং এই বৈষম্যবাদ দ্বারা অভিভাবিত কিছু মনস্তাত্ত্বিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, উন্নত দেশের মানুষের উন্নতির মূলে আছে তাদের বুদ্ধিগত ঔৎকর্ষ ও মানসিকতার বৈশিষ্ট্য। জাতিপ্রাধান্য, শ্রেণীপ্রাধান্য, বর্ণপ্রাধান্য, পুরুষপ্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এই প্রচার। আজকাল কোনো সৎ-বিজ্ঞানকর্মীই এই ধারণা পোষণ করেন বলে মনে হয় না। তবে পরোক্ষভাবে এই ধারণাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা যে চলছেনা—একথা বলা চলে না। হ্যারী. কে. ওয়েলসের 'পাভলভ' ও ফ্রয়েড' শীর্ষক বইটি পড়লেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে (Wells H.K., Pavlov and Freud: 2 vols, International Publishers, Newyork 1956)। মনস্তাত্ত্বিকের নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে আমেরিকান সাইকোলজিকাল এ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্যের মুখবন্ধের প্রথম লাইনটি প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা চলে : 'ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক আস্থাবান, মনস্তাত্ত্বিক মানুষের আত্মোপলব্ধি ও অন্য মানুষ সম্পর্কিত জ্ঞানলাভের ব্যাপারে সাহায্য করতে দায়বদ্ধ। "(A. P. A. Ethical Standards of Psychologists, — Washington D. C. 1963) ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধের পর পশ্চিমী দেশে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিয়েছিল। জেফারসন, লিংকন ও আরো অনেকে এই মর্মে উক্তি করেছিলেন যে সাধারণ মানুষকে যদি শিক্ষা দেওয়া যায়, তাদের সামনে যদি প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরা হয়, তা হলে তাদের বিবেচনা শক্তিদ্বারা তারা নিজেকে পরিচালিত করতে পারবে ও তাদের দেহ-মনের ওপর যে নির্যাতন চলছে তার অবসান ঘটবে। শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবৃদ্ধি ও

পরিবর্তনের আলোচনায় বৈষম্যবাদের উল্লেখ অপ্রাসংগিক নয়, বৈষম্য ও প্রাধান্যবাদ বহুলাংশে আমাদের দৃষ্টিভংগীকে বিকৃত করতে পারে, ফলে শৈশব ও কৈশোরের সংকট ও সমস্যার সঠিক বিশ্লেষণে সমাধানের সূত্র নির্ণয়ে ভুলত্রুটি ঘটতে পারে।

কথা বুঝতে ও বলতে শেখার আগে মানবশিশু নিম্নপ্রাণীর শাবকের মত বাড়তে থাকে। খাদ্যগ্রহণ ও মলমূত্র ত্যাগের জন্মগত তাগিদ পরিপূরণের সংগে সম্পর্কিত উদ্দীপকের সংবেদনের সাহায্যে শিশু পরিবেশের সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে। সমাজেরই অংগ পরিবারস্থ সব কিছুর সংগে শিশুর জটিল সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। এই সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে উদ্দীপকের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ঘটে। কথা বলতে বা বুঝতে না পারলেও ধ্বনির ওঠানামার বৈশিষ্ট্য (tone) শিশু বুঝতে পারে ও সেই অনুযায়ী তার প্রতিক্রিয়া হয়। বাক্‌স্ফূরণের আগে শিশুর পরাবর্ত শুধুই সংবেদন-ভিত্তিক। চিন্তার ক্ষমতা কথা বোঝা ও বলার সংগে সংগে উন্মেষিত হতে থাকে। শিশু এক থেকে দু বছরের মধ্যে ভাষা আয়ত্ত করতে শেখে। এই প্রক্রিয়া আয়ত্ত করার মাধ্যমে মানবশিশু পশু থেকে উন্নত ও গুণগত-ভাবে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। শিশুর ভাষা বা কথা বলতে শেখার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে সংবেদনভিত্তিক পূর্বার্জিত জ্ঞানের সাহায্য ছাড়া ভাষা শেখা যায় না। একটা চামচ হাতে দিয়ে বিশেষ ভাবে সেটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বারবার বলা হতে থাকে—চামচ, চামচ। এটা কি? চামচ! অনেকবার শোনার ফলে চামচের আকৃতি গঠন ও স্পর্শের সংগে 'চামচ' কথাটি ক্রমশ অনুষংগিত হয়ে যায়। পাভলভীয় মনোবিদ্যার পরি-ভাষায় বলা চলে শিশু সংবেদজ প্রতিবিম্বের সংগে কথাটিকে সংযোজিত করতে শিখেছে বা শর্তাবদ্ধ (conditioned)) হয়েছে। এই বাচনিক শর্তাবদ্ধতার সত্যতা যাচাই হয় যখন বাচনিক প্রতীকটির প্রয়োগে প্রতিবিম্বটি সঠিকভাবে সংবেদনে প্রতিফলিত হয়। এইভাবে শিশুর ভাষাভিত্তিক সাংকেতিক স্তর সংবেদনভিত্তিক স্নায়ুস্তরকে ভর করে গড়ে ওঠে। ক্রমশ শিশুর সামাজিক পরিবেশ, যেখানে ভাষার মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষিত হয়—তার স্নায়ুসংস্থার বাক্‌ভিত্তিক স্তরকে ধীরে ধীরে গঠিত করে এবং ক্রমশ এই মানবিক মস্তিষ্কধর্ম পুষ্ট হয়ে ওঠে। উচ্চতর স্নায়ুসংস্থার এই বিশেষ ক্ষমতা উন্মেষের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েই মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই ক্ষমতার উন্মেষের জন্য বাক্‌শক্তিসম্পন্ন মানুষের সাহচর্য

অত্যাবশ্যক। মানুষের সমাজে শিশুপাঞ্জী জাতীয় প্রাণীকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিলেও মানবশিশুর মত কথা বলার ক্ষমতা তারা আয়ত্ত করতে পারবে না। বাক্‌তন্ত্র পুষ্ট ও সক্রিয় না হলেও শিশুর বাচনিক চিন্তাশক্তি ও মানবিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে না।

প্রথমে দু'চারটে অস্ফুট শব্দ, তারপর দু'চারটে শব্দসমষ্টির সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট ভাবপ্রকাশ; আরো পরে বাক্যরচনা; এবং শেষে অর্থপূর্ণ বাক্যসমষ্টি দ্বারা সক্রীয় ইচ্ছা বা আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা আয়ত্ত করে মানবশিশু। ক্রিয়া, বস্তু ও ব্যক্তি নির্দেশক কথার সঙ্গে শর্তাবদ্ধ হবার প্রাথমিক পর্যায় পার হবার পর, বিভিন্ন বস্তু বা ক্রিয়ানির্দেশক কথা এবং বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক-ভিত্তিক শর্তাবদ্ধ পরাবর্ত গড়ে উঠতে থাকে। এইভাবে অনুষঙ্গিত বাক্য-সমষ্টি শৃংখলাবদ্ধ হয়ে ওঠে, জটিল ভাবপ্রকাশ করতে ও ঘটনার বিবরণ দিতে শেখে শিশু। ভাবপ্রকাশের শৃংখলাবদ্ধ ভাষা যতই জটিল হোক না কেন, মনে রাখা দরকার যে শব্দসমষ্টি দ্বারা বাক্যরচনা করা হচ্ছে—তারা বাইরের ঘটনা বা বস্তুর প্রতীক। কথা বা চিন্তাভাবনা অতি সূক্ষ্ম বা বিমূর্ত হতে পারে, কিন্তু সব সময়েই মূর্ত ঘটনা ও বস্তুর সংগে সংশ্লিষ্ট এবং শিশুর অভিজ্ঞতা প্রসূত। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, সব ভাবনাচিন্তা সঠিক ও সত্য: তবে শিশুর ভাবনাচিন্তা যতই উদ্ভট ও খেয়ালী হোকনা কেন, তার পরিবেশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সংগে জড়িত।

শৈশবের শিক্ষা ও মানসিকতা গঠনে উচ্চমস্তিষ্কের ভূমিকা সম্পর্কে রুশ বিজ্ঞানী ইভান পেত্রভিচ্ পাভলভ আজ থেকে ৫০ বছর আগে (১৯৩২ সালে ইউ. এস. এস. আর এ্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্সের সভায়) যা বলেছিলেন আজ-কের দিনেও তার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। এই অধ্যায়ের শেষে পাভলভের বক্তব্যের সারমর্ম উদ্ধৃত করা হল।

(১)* শিশুর ক্রিয়াকলাপ চিন্তাভাবনা চেতনা ইত্যাদির সংগে পরিবেশ এবং মনের অধঃস্তর-মস্তিষ্কের সম্পর্কের বিশ্লেষণ ছাড়া শৈশবের ক্রমবিবর্তন ও কৈশোরের পরিবর্তন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সংবেদনের বস্তুবাদী ধারণা ছাড়া শৈশব কৈশোর কেন, মানুষের কোন মানসিক ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা চলে না। লেনিন এক জায়গায় বলেছিলেন: (Lenin, Materialism and Empirio-criticism, Newyork, 1927, p. 137) বস্তুবাদীর কাছে সংবেদন মনের সংগে বহির্জগতের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়া আর কিছু নয়, বাইরের উদ্দীপনা শক্তির রূপান্তরের ফলে

মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। পাভলভ এই রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক ও ব্যাখ্যাকার। মানব মস্তিষ্কের সংবেদন সংস্থা ও বাক-সংস্থার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অস্তিত্বের উল্লেখ করে তিনি চিন্তাভাবনা-চেতনার-বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় পথপ্রদর্শকের কাজ করেন।

মানবশিশুর শিক্ষা ও বৃদ্ধির ব্যাপারে শুধু ধ্রুপদী শর্তসাপেক্ষ পরাবর্তই ক্রিয়াশীল ভাবলে ভুল হবে। পাভলভ অনুবর্তী গবেষকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জেনেছেন ঃ মানবশিশুর ক্ষেত্রে বারবার শর্তাধীন উদ্দীপক ও শর্তহীন পরাবর্তের সংযোগ ছাড়াই একেবারে আকস্মিক ভাবে নতুন অভ্যাস গঠিত হতে পারে। আগেকার অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের ফলে এই নতুন সংযোজন তৈরী হতে পারে, দুটি শর্তসাপেক্ষ পরাবর্তের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ফলে একেবারে নতুন একটি পরাবর্ত তৈরী হতে পারে, কোন কিছুকে জানবার ও পরীক্ষা করবার প্রচেষ্টায় নতুন অভ্যাস সহসা গড়ে উঠতে পারে। আড়াআড়ি ভাবে দুটি উদ্দীপকের সংযোগের ফলে তাৎক্ষণিক নতুন পরাবর্ত সহসা তৈরী হতে দেখা গেছে, এবং অনুকরণের ফলে সব থেকে তাড়াতাড়ি নতুন অভ্যাস বা পরাবর্ত গঠিত হবার প্রমাণও পাওয়া গেছে। আদৌ কোন অনুশীলন বা চর্চা ছাড়াই পরাবর্ত গড়ে ওঠা (নতুন কিছু শেখা) বয়স বাড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। শিশুর পাঁচ থেকে ছয় বছরে এইভাবে অকস্মাৎ গড়ে ওঠা অভ্যাসের সংখ্যা মোট অভ্যাসের ২৮ শতাংশ, ৭ থেকে ৮ বছরের ৪০ শতাংশ ও ১০-১২ বছরে প্রায় ৮০ শতাংশ (Ed. B Simon, Psychology in Soviet Union, Routledge and Kegan Paul Limited, 1957 pp. 61-63)। প্রসংগত বলা উচিত, কথা বলা শেখার আগে ও পরে পরাবর্ত গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে গুণগত প্রভেদও আবিষ্কার করেছেন পরীক্ষক গবেষকরা। ঘন্টা বাজিয়ে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সরাসরি ঘন্টাধ্বনির উদ্দীপনা লালা নিঃসরণের (শর্তহীন পরাবর্ত) উত্তেজনার সংগে যুক্ত হয়। কিন্তু ঘন্টা কথাটির দরুন উদ্দীপনা প্রথমে প্রতীক হিসেবে ঘন্টাধ্বনির অনুসংগকে জাগিয়ে তোলে তার পর ঘন্টাধ্বনির দরুন পরাবর্ত অর্থাৎ লালানিঃসরণ দেখা দেয়। ঘন্টাধ্বনির সংগে আগে থেকে পরাবর্ত গঠিত না হলে, এবং 'ঘন্টা' কথাটির সংগে পরিচয় না থাকলে-'ঘন্টা' কথাটিতে লালা নিঃসরণ হবে না। শিশুর বয়স বাড়ার সংগে সংগে তার ভাষা-জ্ঞান বাড়তে থাকে, সংগে সংগে তার শিক্ষালাভ ত্বরান্বিত হয়। 'কথা' ক্রমশ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সব রকমের উদ্দীপকের ভূমিকা গ্রহণ করে। [(1) Krasnogorsky,

N.I., The Development of Study of the Physiological Activity of Brain in Children, Moscow, 1935, (2) Ivanov Smolensky A.C, Concerning the Study of the Joint Activity of the First and the Second Signalling System, Journal of Higher Nervous Activity, vol. 1, No. 3).

শিশুর বাক্‌স্ফূর্তি ও চিন্তনশক্তির বিকাশ নিয়ে একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী (Liublinskaya A.A., Speeches at the Conference on Psychological Questions, Moscow, 1954, pp 24-38) একটি সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। তাথেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে পরিবেশিত হল। তথ্যগুলি পরীক্ষানিরীক্ষা ভিত্তিক। (১) প্রত্যক্ষণ থেকে বিমূর্ত-চিন্তার উদ্ভব শিশুর বস্তুজগত সম্পর্কিত জ্ঞান ও পরিচিতির জনক। মাতৃভাষার ব্যুৎপত্তি ছাড়া প্রত্যক্ষণ ও বিমূর্ত চিন্তন স্পষ্ট ও সঠিক হতে পারে না। ভাষাজ্ঞান বস্তু ও পরিবেশের জ্ঞানের পূর্বশর্ত। (২) সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও ধারণার উন্নতি ও বৃদ্ধির সংগে সংগে বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। পরিদৃশ্যমান জগৎ বা ঘটনা প্রত্যক্ষণের দিক থেকে যতই জটিল হতে থাকে, ততই শিশুর চিন্তাশক্তি বাড়ে, প্রত্যক্ষীভূত বিষয়টির গঠন সংযুক্তি সংক্রান্ত দিকটির পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। (৩) শব্দের উপর আধিপত্য ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান ছাড়া বাক্যের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা বা ব্যক্ত করা যায় না। শিশুর ব্যাকরণ জ্ঞান বর্ধিত না হলে সে নির্ভুল বাক্যরচনা করতে বা বুঝতে পারে না। নির্ভুল বাক্যরচনা ও পাঠের ফলে বাইরের জগতের বিবিধ ঘটনার সম্পর্ক ও সংযোগ শিশু মস্তিষ্কে অনেকটা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

এই সম্পর্কে এই সব বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীদের জ্ঞান এখনও যথেষ্ট নয়, তা তাঁরা জানেন। কিন্তু জ্ঞানের অভাব দূর করতে দূরকল্পনা বা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা তাঁরা করেন না। সেচেনভ ও পাভলভের পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা শিশুর প্রত্যক্ষণক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ ও সঠিক জ্ঞান অর্জন করে মানবমনের বিকাশকে অধ্যয়ন করতে আগ্রহী।

শৈশবের ক্রমবিকাশ, বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি, মানসিক গুণের ও প্রক্ষোভের উন্মেষের ব্যাপারে অন্যান্য দেশে যে সব পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে, তা থেকে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই সব পরীক্ষকরা বাচনক্ষমতাকে পাভলভপন্থীদের মত গুরুত্ব প্রদান করেননি।

মানুষের স্নায়ুসংস্থায় দ্বিতীয় স্তরটি সংযোজিত হবার ফলে মানবমস্তিষ্কে ও মানসিকতায় যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে, সে সম্পর্কে ব্যবহারবাদীরা খুব সচেতন বলে মনে হয়না। ওয়াটসনের ধারণা ছিল যে শিশুকে তিনি যেভাবে খুশী গড়ে তুলতে পারেন। ছাঁচে ফেলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, ব্যবসাদার ফরমায়েসমত বানানো যায় (Watson, Behaviorism, Newyork, 1930)। শিশু যেন এক তাল মাটি, তাকে নিয়ে যা খুশী করা যায়। ব্যবহারবাদীদের এই ধারণা আজকের আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিক মহলে অত্যুক্তি বলে মনে করা হয় বটে; কিন্তু স্কিনার প্রবর্তিত "অপারেন্ট কনডিশনিং"-এর ব্যাপক প্রয়োগ চলছে আজ ঐ দেশে। শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু নয়, চিকিৎসায়, জেলখানায়, কয়েদীদের চরিত্রসংশোধনে, রাজনৈতিক মতবাদ পরিবর্তনে স্কিনারের পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ নিয়ে অনেক বাদপ্রতিবাদ চলেছে বটে, কিন্তু মোটামুটি ব্যবহারবাদ আজ যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে সমাদৃত। চিকিৎসাক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় অবাধ অনুষংগ পদ্ধতির প্রয়োগের সমর্থকদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের দেশেও গত দশকে বহু সরকারী বে-সরকারী সংস্থায় চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহারবাদ ক্রমশ প্রবর্তিত হচ্ছে ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ্যালডুস হাকসলি, জর্জ অরওয়েল, প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকের এবং কোরিয়া যুদ্ধে বন্দী আমেরিকান পাইলটদের বিচারের সংবাদ পরিবেশকদের দৌলতে "মগজ ধোলাই" কথাটি খুবই চালু। পাভলভীয় কনডিশনিং পদ্ধতির প্রয়োগের কথা মনে রেখেই হাক্সলি তাঁর 'ব্রেভ নিউ ওয়ারল্ড' (১৯৩২) পুস্তকে মগজ ধোলাই-এর ছবি এঁকেছিলেন। তাঁরা পাভলভীয় মনোবিদ্যা ও ওয়াটসনের ব্যবহারবাদকে এক করে দেখেছিলেন। পাভলভ কিন্তু মানুষকে অক্রিয় যন্ত্র বা মাটির তাল মনে করতেন না। বাকতন্ত্রের স্ফুরণ ও ক্রমবিকাশের দরুন মানুষের মস্তিষ্কে ও মনে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার ফলে মানুষের চেতনা সমৃদ্ধ এবং বিশ্লেষণ শক্তি তীক্ষ্ন হয়েছে। সে স্বাধীন ইচ্ছা, চিন্তাভাবনা, বিশ্লেষণ ও সদসৎ নির্বাচনের ক্ষমতার অধিকারী। এখানে পাভলভের একটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি।[১]

---

১ 'The total integrity of the higher nervous activtiy I represent thus. In the higher animals, including man the first mechanism for the complex correlation of the organism with the surrounding is the neighbouring

এ্যালডুস হাকসলীর 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডের' নির্মম কণ্ডিশনিং-এর বিবরণ ওয়াটসনীয় ব্যবহারবাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে, পাভলভীয় পদ্ধতি নয়, । মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার মত কোন মন্তব্য পাভলভের লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থার ক্রিয়াকলাপের সংগে কুকুরের স্নায়ুসংস্থার গুণগত পার্থক্যের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে পাভলভের লেখায়। পশ্চিমী দেশের সকলেই অবশ্য ব্যবহারবাদীদের দাবী মেনে নেন নি। স্কিনারের মানুষকে বদলে ফেলার যান্ত্রিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এঁদের দেশের অনেকেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের বিবর্তন ও বিন্যাসের এবং মানুষের সমাজব্যবস্থার দরুন মানুষ যে ইঁদুর,

---

subcortex with its intricate unconditioned reflexes.... These reflexes, i.e. inborn activities, are called out by only a few unconditioned external agents. Hence the limited orientation in the milieu and with it a weak adaptation.

"The second step in the correlation is made by the cerebral hemispheres but without the frontal lobes. Here arises with help of the conditioned connections, associations, a new principle of activity ; the signalization of a few unconditioned external agents by numberless other agents, constantly analyzed and synthesized, making possible an extremely varied orientation in the same milieu and a much greater adaptation. This constitutes a unified signalling system in the animal organism and primarily in the human. In the latter there is added, possibly specially in the frontal lobes, which is not so large in the animals, another system of signalization, signalling the first system—speech, its basic or fundamental components being the Kinaesthetic stimulations of the speech organs.

"Here is introduced a new principle of higher nervous activity (abstraction—and at the same time the generalization of the multitude of signals of the former system, in its turn again with the analysis and

গিনিপিগ, কুকুর থেকে উচ্চতর ও নতুন ধরনের মানসিকতার অধিকারী হয়েছে পাভলভের এই আবিষ্কার ও বক্তব্য এঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।[২]

এতক্ষণ পাভলভীয় মস্তিষ্কভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিকদের ধারণা অনুযায়ী শৈশবের মানসিকতা বিকাশের বিবরণ দেওয়া হল। এইবার ফ্রয়েডীয় ধারণা বিবৃত করছি।

অন্য একটি অধ্যায়ে ফ্রয়েডের তিনপ্রকোষ্ঠ ভিত্তিক মনস্তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। পাভলভ বর্ণিত তিনধরনের পরাবর্তের (জন্ম-সূত্রে-পাওয়া শর্তহীন, এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টার ফলে গড়ে ওঠা প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর ভিত্তিক দুধরনের শর্তাধীন পরাবর্ত) সঙ্গে ফ্রয়েডের তিনপ্রকোষ্ঠের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়াস করেছেন দু-একজন পণ্ডিত। পাভলভের শর্তহীন পরাবর্ত, সহজাত প্রবৃত্তি-মূলক পরাবর্ত, ফ্রয়েডের ইদ্ বা অদ্স সঙ্গে তুলনীয়, প্রথম সাংকেতিক স্তরভিত্তিক পরাবর্ত ফ্রয়েডীয় ইগো বা অহং-এর সমগোত্রীয় এবং দ্বিতীয়

---

synthesis of these new generalized signals), the principle of the conditioning of limitless orientation in the surrounding world and of creating the highest adaptation of the human species—science both in the form of a humanitarian empiricism as well as in its specialized form." (Gantt-Pavlov, Conditioned Reflexes and Psychiatry, pp. 113-14).

২ Man is of course a system (more crudely, a machine), and like every other system in nature is governed by the inevitable laws common to all nature, but it is a system which, within the field of our scientific vision, is unique for its extreme power of self regulation....Is not man the pinnacle of nature, the highest embodiment of resources of infinite nature, the incarnation of her might and still unexplained laws ? Is this not rather calculated to enhance man's diginty, to afford him the deepest satisfaction ? And everything vital is retained that is implied in the idea of free will, with its personal, social and civic responsibility. (Pavlov's Selected Works, Moscow 446-7)

সাংকেতিক স্তরভিত্তিক পরাবর্ত আধিশাস্তার পাভলভীয় পরিভাষা—এই-ভাবে এই দুই সমকালীন বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতিমূলক অনুসন্ধানপ্রসূত ধারণা ও তত্ত্বকে একগোত্রে ফেলে দুই বিপরীত ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা আর যাই হোক বিজ্ঞান মনস্বতার পরিচায়ক নয়। দূরকল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টি গঠিত অধিবিদ্যা বা দর্শন যতই উচ্চমার্গের হোক্ না কেন, প্রকৃতিবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষানিরীক্ষালব্ধ তথ্যভিত্তিক তত্ত্বের সংগে তার তুলনা অচল।—পাভলভের মতে মস্তিষ্ক-সহকেন্দ্রীয় স্নায়ু সংস্থার ক্রিয়াকলাপের সঠিক জ্ঞান ছাড়া মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠতে পারে না; আর ফ্রয়েড বলেছেন, মস্তিষ্ক বিজ্ঞান ছাড়াই পশুমন থেকে মানবমনের বিবর্তন, মানবমনের ক্রমবিকাশ জানবার চেষ্টা করা দরকার। এ সম্পর্কে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মত কোনো বিশেষ জ্ঞান কারুর নেই। কাজেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার পথে পা না বাড়িয়ে মনস্তত্ত্বকে নিজের পথ নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে। (Freud, The Question of Lay Analysis, New York, 1950 pp. 29)

মানবমনের ক্রমবিকাশ ও তার আগে পশুমনের ক্রমবিবর্তন জানার তাগিদে ফ্রয়েড সংস্কৃতির বিবর্তনের পদ্ধতি ও ইতিহাসের সঙ্গে মানবমনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন। (Freud, Civilization and Its Discontents, London, 1930, p. 136)। নৃবিদ্যা ও জাতিবিদ্যা থেকে তিনি এমন কিছু তথ্য বেছে নিলেন, যা তার পূর্বগঠিত ধারণাকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। এই ধারণা হিষ্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে তার মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলো।—তাঁর রোগীরা বেদনাদায়ক ঘটনা বিস্মৃতির গহ্বরে চালান দিয়ে থাকে, এবং জন্মের মুহূর্ত থেকেই মানব-শিশু মৃত্যুরতি প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত ও পরিচালিত।—এই ধারণার সপক্ষে রবার্টসন স্মিথের আদিম মানব গোষ্ঠীর পিতৃহননের কাহিনী যখন অন্যান্য পণ্ডিতদের দ্বারা ভ্রান্ত বিবেচিত,—তখন ফ্রয়েডের কাছে সেই কাহিনী তাঁর ধারণার সহায়ক বলে গৃহীত। তিনি অকপটে তাঁর [Totem and Taboo (New York, 1939, pp. 207-208)] পুস্তকে একথা নিজেই স্বীকার করেছেন। ফ্রয়েডের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম গোষ্ঠীর ব্যক্তিমনে কোনো দ্বন্দ্ববিরোধ ছিলনা, কোনো পাপবোধ ছিলনা। প্রাগৈতিহাসিক মন প্রকৃতির সাথে একাত্মীভূত ছিল। গোষ্ঠীপতি দ্বারা বিতাড়িত সন্তানেরা যেদিন ফিরে এসে পিতাকে হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করে

উৎসব করলো, সেইদিন থেকে তার মনে ফাটল ধরলো, পাপবোধ জাগলো, ফলে মন বিভক্ত হোলো তিনপ্রকোষ্ঠে এবং সেই সময় থেকে অবদমন (repression) মানসিকতা গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করলো। প্রাগৈতিহাসিক মনের বিবর্তনে দুটি দশার কথা বলেছেন ফ্রয়েড। প্রথম দশার গোষ্ঠীমানুষ ক্রমশঃ তাদের যৌনভিত্তিক কামনা অবদমিত করে, হাজার হাজার বছর ধরে ইদ্ বা অদস্‌কে অবদমিত কামনার আধারে পরিণত করলো। সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের সংগে সংগে ক্রমশ অবদমিত কামনাবাসনা.—নির্জ্ঞানের গভীরে তপ্ত কটাহের ফুটন্ত উত্তেজনা, অসংগঠিতরূপে তৃপ্তির সন্ধানে সতত উৎসুক। সহজাত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ছাড়া আদিম মানুষ আর কিছু চায় না। আর কিছু জানে না, সভ্যতা সংস্কৃতি উন্নত হ'তে থাকে, কিন্তু চরিতার্থতার পথে বাধা সৃষ্টি হয়, অসন্তোষ জমে ওঠে মানুষের মনে। (Freud, New Introductory Lectures, pp. 104-105)। অদসের শক্তি যত বাড়তে থাকে, অধিশাস্তা বা 'সুপারইগো'র পাহারা ও শাসন তত কড়া ও কঠোর হতে থাকে। মনের মধ্যে জমতে থাকে—অবশ্য নির্জ্ঞানে—অজাচার প্রবৃত্তির দুর্জয় কামনা অদসের গুহায়, আবার অন্যদিকে অধিশাস্তারও অবদমন শক্তি আরো জোরালো হ'য়ে ওঠে। অদস চায় আদিম কামনার পরিতৃপ্তি আর অধিশাস্তা সেই পরিতৃপ্তির পথে বাধা। এই দুই বিপরীত ধর্মী শক্তি নির্জ্ঞানে বহন করে চলেছে আজও এই বিশ শতকের জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ সভ্য মানুষ। এই প্রজাতিগত স্মৃতি নির্জ্ঞানে নিয়ে মানব শিশু জন্ম-গ্রহণ করে। সংগঠিত সভ্য সমাজে অবাধ কামনা বাসনার তৃপ্তি ক্রমশ আরো কঠিন হ'য়ে পড়ে। কামনার উদ্‌গতি (sublimation) ঘটে, শিল্পে-সাহিত্য সৃষ্টি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নিয়োজিত হয় উৎগত যৌন তাড়না (Sublimated sexual drive)। শিশু জন্মায় প্রাগৈতিহাসিক মন নিয়ে। অধিশাস্তা অগঠিত, অহং দুর্বল ও ক্ষীণ, কেবলমাত্র অদসই শক্তিশালী। অদসের মধ্যে আছে সহজাত প্রবৃত্তি—কামনা বাসনা। ইতিবাচক প্রেম-ভালবাসা ও নেতিবাচক ঘৃণা, হিংস্রতা, আত্মধ্বংসী প্রবৃত্তি—এক কথায় মৃত্যুরতি প্রবৃত্তি। সমাজের কাছে অদস-প্রধান শিশু (যার দেহ-মনে শুধু ভয়, ক্ষুধা, লোভ ; ধ্বংসকামিতা আর ব্যথা-বেদনা ; শুধু আত্ম-তৃপ্তির ইচ্ছা)—এক বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের, শিশুর সামাজিকীকরণের ভার তুলে দেয় সমাজ মাতাপিতার উপর। শিশু

নিরাপত্তা চায়, জৈব প্রয়োজন মেটাতে চায়। বেঁচে থাকতে চায়, প্রতিরক্ষণ চায়। মাতাপিতা তার প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে, তাকে সমাজ অনুমোদিত পথে চলতে প্রশিক্ষণ দেন, বাধ্য করান। শিশুর শিক্ষাপর্ব শুরু হয়। শিশু দেখে শেখে, অনুকরণ করে শেখে, চেষ্টা ও ব্যর্থতা সফলতার মাধ্যমে শেখে। সামাজিক বিধিনিষেধ, পিতামাতা কি চান না চান, কি করলে শাস্তি পাবে, কি না করলে আদর পাবে না—ক্রমশ এসব বুঝতে শেখে শিশু। বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে পরিবেশের বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হ'য়ে শিশু বুঝতে পারে যে, তার প্রয়োজন, অদসের কামনাবাসনা সব সময় আপনা থেকে পরিতৃপ্ত হয় না। ক্ষুধার্ত হ'লেই দুধের বোতল বা মায়ের স্তন মুখের মধ্যে সর্বদা পাওয়া যায় না। ঘন ঘন শিশুর বিছানা ভিজছে, প্রতিবারই তখনই শুকনো বিছানা, জামাকাপড় দিয়ে তাকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে না। বেশি রকম আদরযত্নের মধ্যে লালিত শিশুর অদৃষ্টে এই রকম অনাদর মাঝে মাঝে ঘটতে বাধ্য। প্রকৃতি সত্তার সংগে একাত্ম অদসে এই সময় চিড় ধরে, মনের বিভাজন শুরু হয়। অদস থেকে এক অংশ আলাদা হয়ে বাস্তবের সংগে আদানপ্রদানের বা মানিয়ে নেবার ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভাবে, ফ্রয়েডের মতে, প্রাথমিক 'অহং' বা 'ইগোর' উন্মেষ ঘটে। এর পর, শিশুর বয়স যখন তিন কি চার, তখন শিশু আর এক সমস্যার সম্মুখীন হয়। সমাজের নৈতিক বিধি ও বিধানের সংগে মানিয়ে নেবার প্রয়োজন ঘটে এই সময়। মনের আবার বিভাজন ঘটে, দুই থেকে তিন প্রকোষ্ঠে ভাগ হয়ে যায় শিশুমন। 'সুপারইগো' বা অধিশাস্তার উদ্ভব ঘটার সংগে সংগে ঠিক বেঠিক, উচিত অনুচিত, ভালমন্দ বিচার করতে শেখে শিশু। প্রথমদিকে শাস্তির ভয়ে, স্নেহ বা ভালবাসা হারাবার ভয়ে শিশু সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে বাধ্য হয়। আর কিছুকাল পরে পিতামাতার রীতিপ্রকৃতি, তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, তাঁদের বিধান শিশু প্রত্যক্ষ নির্দেশ ছাড়াই বুঝতে পারে; পিতামাতাকে নৈতিক দিক থেকে অনুকরণ করতে শেখে শিশু। মনের এক অংশ যেন নীতিবাগীশ হয়ে পিতামাতার ভূমিকা গ্রহণ করে। এইভাবে অধিশাস্তা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে। বর্বর মন সভ্য মনে পরিণত হতে হাজার হাজার বছর লেগেছিল, মানবশিশু সেই পরিণতি লাভ করে মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে। ইদ্-ইগো-সুপারইগোর সংগঠন এবং কামনা অবদমনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করে। চার বছর অবধি শিশুর পক্ষে চরম সংকটকাল।

সব শিশু, ফ্রয়েডের মতে, পূর্বপুরুষদের প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। পাভলভের মতে সব মানবশিশু লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত মানবিক মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসংস্থা নিয়ে জন্মায়; আর ফ্রয়েড বলেন যে মানবশিশু পূর্ব-পুরুষের মানস-বিভাজন প্রবণতা ও অবদমন ক্ষমতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথম পর্বে শিশুমনে থাকে স্বগোত্রভোজনাকাংক্ষা (cannibalistic desire)। এই সময় তার আনন্দ চোষায় ও খাওয়ায়। এই পর্বের নাম আগেই বলেছি, মৌখিক পর্ব (oral phase)। দ্বিতীয় পর্বকে বলা হয় পায়ু পর্ব (anal phase)। এই পর্বে শিশু তার অন্ত্র, বিশেষ করে মলদ্বার নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পায় (Infantile Sexuality in Basic Writings, New york 1939 pp 597-98)। এই প্রয়াস প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া আক্রমণ-মুখী নিষ্ঠুরতা ও অন্তর্জাত হিংস্রতা অবদমনের পর্ব। শিশু সহজাত হিংস্রপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়, সভ্যতার পালিশের তলায় এই প্রবৃত্তি অবদমিত হয়ে অবস্থান করে, সুযোগ সুবিধার ছিদ্রপথে বেরিয়ে এসে হিংস্রাশ্রয়ী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে মানুষকে উৎসাহিত করে, অর্থাৎ মানুষ স্বভাব-বর্বর। এই ফ্রয়েডীয় অভিমত রজার্স, এ্যালপোর্ট-এর মত মানবতাবাদী মনস্তাত্ত্বিকরা এবং মার্গারেট মীড, এ্যাসলে মন্টেগ প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক এবং আরো অনেকে খণ্ডন করেছেন। (Carl Rogers, A Therapist's View of Psychotherapy, 1961, pp 90-91 ; Coleman, Psychology and Effective Behavior, Indian Edition, 1971, pp 21, 23.) ব্যবহারবাদীরা বলেন, মানুষের স্বভাবগত কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, সে নিষ্ক্রিয়, কাদার তালের মত জড়, ছাঁচে ফেলে (কণ্ডিশনিং-এর প্রভাবে) মানবমন ও চরিত্রে যে কোনো রূপ দেওয়া সম্ভব। (Skinner, B. F. ; Science and Human Behavior, New York, 1953)। পাভলভীয়দের কথা আগেই বলা হয়েছে।

শিশুর সামাজিকীকরণের দায়িত্ব মাতাপিতার উপর বর্তেছে বলে, শিশু স্বভাবতই তাঁদের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করে। আবার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখায়, নিজের নিরাপত্তার তাগিদে তাঁদের উপর নির্ভর করে, তাঁদের ভাল-বাসে। তিনটি বিশেষ অনুভূতিশীল অংশের : মুখ, মলদ্বার ও যৌনাংগের এক তৃপ্তি সাধনে বাধাদান সভ্যসমাজের পিতামাতার নৈতিক কর্তব্য বলে তারা মনে করেন। অনেকটা জোর করে একটা বিশেষ বয়সে স্তন্যপানের তৃপ্তি থেকে বাধা দেওয়া হয়, ঠিকমত সময়ে, ঠিকমত জায়গায় মলত্যাগের অভ্যাস

শিক্ষা দেওয়া (toilet training) হয় ; হস্তমৈথুনের জন্য কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। তাই সব জৈবতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত শিশু বৈরীভাব পোষণ করে মাতাপিতা বা তাদের স্থলাভিষিক্ত যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই বৈরীভাব খুব বেশি তীব্র নয়, এবং বয়স বাড়ার সংগে সংগে এই ব্যবস্থা-গুলোকে শিশু সহজে মেনে নিয়ে থাকে। কিন্তু মাতার প্রতি ভালবাসায় পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে শিশুমনে যে পিতৃবৈরিতা জাগে, তার তীব্রতা ও পরবর্তী জীবনে তার প্রতিক্রিয়া—ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে এক বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। (এই ইডিপাস গুটেষা। মেয়েদের ক্ষেত্রে মাতৃবিদ্বেষ ও পিতার প্রতি ভালবাসার নাম ইলেকট্রা গুটেষা)। গ্রীক অতি-কথা থেকে ফ্রয়েড এই নাম দুইটি গ্রহণ করেছেন। ইডিপাস ও ইলেকট্রা-গুটেষা নানাভাবে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত করেছে, এই দুই গুটেষা নিয়ে অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে ; শিল্প-সাহিত্যে এই গুটেষার অভিব্যক্তি ঘটেছে প্রাচীনতম সভ্যতার যুগ থেকে। ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামী শিষ্যবৃন্দ সামাজিক মানসিকতায়, গণ-মানসিকতায় এই গুটেষার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্তির দাবি করেছেন। শিশু মানসিকতা গঠনে, শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণে, কৈশোরের জটিল সমস্যা উদ্ভব ও সমাধানে ফ্রয়েডপন্থীরা এই জন্মসূত্রে পাওয়া গুটেষার স্বাভাবিক বিগঠন বা অবসানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মাতার সংগে মিলন ইচ্ছা, পিতার মৃত্যু কামনা থেকে শিশু-মনে জন্মসূত্রে পাওয়া সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের, পিতৃহত্যাজনিত পাপবোধকে জাগ্রত করে। অজাচার কামনার শাস্তি উপস্থছেদের (castration) ভয় তাকে পেয়ে বসে। ফ্রয়েডের বক্তব্য অনুসারে উপস্থছেদের ভয়ে মাতার সংগে মিলনেচ্ছা (অন্তর্নিহিত অজাচার প্রবৃত্তি) বা ইডিপাস গুটেষার অবসান ঘটে। চার বছরের কাছাকাছি সময়ে শিশু মানসিকতায়, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, এই সব পরিবর্তন সাধিত হয়। ইডিপাস গুটেষা সম্পর্কিত 'লিবিডো' বা যৌনশক্তি মুক্ত হয় এবং উদ্গমন (sublimation) শিশুর খেলাধুলা, পড়াশুনা, ও অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজের প্রেরণা ও শক্তি জোগায়। ফ্রয়েড কিন্তু মনে করেন যে এই ধরনের আদর্শ সমাধান খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে। বেশির ভাগ শিশুরই এই গুটেষার অবসান ও উদ্গমনের পরিবর্তে অবদমন ঘটে। এবং বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে, বিশেষ করে কৈশোরে এই অবদমিত অজাচার-কামনা ও মৃত্যু-ইচ্ছা নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। সব রকম নিউরোসিস্, অপরাধপ্রবণতা,

কিশোর দুশ্চিকিৎসার মূলে অবদমিত বা অনবসিত এই ইডিপাস (Repressed Unresolved Oedipus।) ফ্রয়েড মনে করেন, বয়সেন্ধিকাল থেকেই সকলেরই উচিত মাতাপিতার বন্ধনমুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করার উপায় সন্ধান করা। (Freud, Introductory Lectures on Psychology, London, 1929, p 283.)

মানুষের সব আচরণ মূলত শৈশবেব অবদমিত কামনা-বাসনার (মূলত কামেচ্ছা) উপর নির্ভরশীল, পরবর্তীকালের ঘটনা তুচ্ছ বা শৈশবের অবদমন দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত—এই তত্ত্ব যুক্তি-নির্ভর বলে অনেকের কাছে মনে হয়নি। চার বছরের শিশুর মধ্যে যুবকের যৌনধর্মিতা আবিষ্কারের সমালোচনা অনেকেই করেছেন, যাঁদের আদর্শগতভাবে কোনোমতেই ফ্রয়েডের প্রতিপক্ষ বলা চলে না। (Furst, The Neurotic, New York, 1954, p. 103 ; Saul, Psycho analytic Quarterly Vol. 18, No 2)। স্ত্রী স্বামীর মধ্যে পিতাকে পেতে চায় অথবা নিজের উপহ্স-হীনজনিত গুঢ়ৈষার দরুন হীনমনত্যা দূর করার চেষ্টায় স্বামীকে ভালবাসে ; স্বামীও অনুরূপ কারণে স্ত্রীকে ভালবাসে, কৈশোর দুশ্চিকিৎসা ও অন্যান্য সমস্যার মূলে অনবসিত ইডিপাস—এই সব ধারণা অবশ্য ফ্রয়েড পরবর্তী অনুগামীরা পুরোপুরি সমর্থন করেন না। (হর্নি, ফ্রম ইত্যাদি)। কিন্তু আমাদের দেশের ফ্রয়েড-অনুরাগীরা এখনও ধ্রুপদী ফ্রয়েডবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত বলে আমার বিশ্বাস ; তাই ইডিপাস গুঢ়ৈষা ও শৈশব যৌনতা নিয়ে এত কথা লিখতে হল।

শিশু মনস্তত্ত্বের ও শৈশবের শারীর-বৃত্তিক ক্রমবিকাশের আলোচনা ও অধ্যয়ন গবেষণা শুধু ব্যবহারবাদী ও ফ্রয়েডবাদী দ্বারা পরিচালিত নয়—একথা আমরা জানি। তবে এই দুই মতবাদের অনুগামীরা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই এই অধ্যায়ে এঁরাই প্রাধান্য পাচ্ছেন। তত্ত্বের দিক থেকে ওয়াটসন প্রবর্তিত পুরনো ব্যবহারবাদ ও থর্নডাইক দ্বারা প্রকল্পিত এবং স্কিনার দ্বারা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত 'অপারেন্ট কন্ডিশনিং' বা স্বতঃস্ফূর্ত কন্ডিশনিং-এর মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। প্রাণী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পাভলভের ধ্রুপদী পদ্ধতির সংগে স্কিনারের পদ্ধতির কোনো বড় রকমের পার্থক্য সেই। সেই কারণেই বোধ হয় পশ্চিমী দেশে প্রকাশিত পুঁথিপুস্তকে পাভলভকে ব্যবহারবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে। তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ পার্থক্যকে এঁরা আদৌ গুরুত্ব দেননি। আগেই বলেছি, ব্যবহারবাদ মানুষকে অনেকটা যন্ত্রের মত মনে করে; চেতনার, যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনার প্রভাবকে অস্বীকার করে। পাভলভপন্থীরা বলেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, চেতনা, মানসিকতা বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা মানুষের আচরণকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ পরিবেশের দাস নয়, মানুষ বিমূর্ত চিন্তারও সেই চিন্তাভিত্তিক পরিকল্পনা দ্বারা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার অধিকারী। শৈশব থেকেই মানবশিশু পশুশাবকের মত অক্রিয় নয়; সে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু সক্রিয়, তাই সামাজিক পরিবেশকে কিছুটা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করতে সক্ষম। অবশ্যই এই পরিবর্তন খেয়ালখুশিমতো করা চলে না। শিশু কেন, বড়রাও এই ব্যাপারে সমকালীন প্রয়োগ বিদ্যার উপর নির্ভরশীল। মানুষ মাত্রেই আত্মোপলব্ধি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিকল্পিত ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকারী তার আদি শৈশব থেকেই। তাকে আচরণ সমষ্টির আধার মনে করার ও ছাঁচে ফেলে খুশি মতো গড়ে তোলার স্কিনারীয় পদ্ধতিকে পাভলীয় তত্ত্বে বিশ্বাসীরা অশোভন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবাস্তব মনে করেন। মানব চৈতন্যকে কেবলমাত্র স্নায়ুপ্রক্রিয়া মনে করে না দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মনস্তত্ত্ব। (Kursanov; Fundamentals of Dialectical Materialism, Moscow. 1967, p. 103)। যান্ত্রিক জড়বাদের সংগে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের যে পার্থক্য ব্যবহারবাদের সংগে শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্বের সেই পার্থক্য। চেতনা শুধুমাত্র মস্তিষ্কের দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের প্রক্রিয়া নয়; এ চেতনার উন্মেষ, অভিব্যক্তি, ক্রমপরিণতিতে সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান (Marx, Engels—The German Ideology, Moscow, 1964, p. 42।

শিশুর মানসিকতা গঠন ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে আর যাদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁদের সম্পর্কে এবার দু চার কথা বলা যেতে পারে। শৈশবকে ভালোভাবে না জানা পর্যন্ত কৈশোর ও তার সমস্যা নিয়ে সম্যক আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় নির্ধারণ সম্ভব নয়।

প্রথমে Kurt Lewin-এর শিশুদের অভিযোজন ও স্মৃতি সম্পর্কিত অভিমতের কথা বলছি। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণা আমদানী হয়। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক বা আবয়বিক মনোবিদ্যা (Gestalt Psy-

chology) এই সময় বেশ খ্যাতি লাভ করে। নিউটনের সূত্র দিয়ে যখন নতুন নতুন আবিষ্কৃত তথ্যের ব্যাখ্যা চলছিল না, উনিশ শতকের সেই মাঝামাঝি থেকেই, যখন পরমাণু-তত্ত্বের উপর বিজ্ঞানীদের আস্থা কমে এসেছে, তখনই গেসটালট্‌বাদ ও ক্ষেত্রতত্ত্ব (Field Theory) নিয়ে জার্মানীতে কয়েকজন বিজ্ঞানী বেশ কিছু পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। Kofka, Kohler ও Wertheimier-দের এই দলে যোগ দিলেন Kurt Lewin। পদার্থবিজ্ঞানের কাছ থেকে ধার করা ধারণা নিয়ে মনের নানাদিক বোঝার চেষ্টা করেছিলেন যারা, কুর্ট লিউইন তাঁদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা অর্থপূর্ণভাবে অনুষংগিত হবার ফলে স্মৃতিচিত্র তৈরী হয়—অনুষঙ্গবাদীদের এই দাবী অগ্রাহ্য করে বললেন, প্রতিটি শব্দ ও অর্থহীন শব্দাংশ পারস্পরিক সন্নিবেশে ক্ষেত্রের এক বিশেষ সাংগঠনিক রূপ সামগ্রিকভাবে অভিব্যক্ত করে বলেই আমরা সেই বিশেষ ঘটনা ও বস্তুটিকে মনে রাখতে ও চিনতে পারি। শিশুমনস্তত্ত্বে তাঁর বিশেষ অবদান নীচের চিত্রে কয়েকটি থেকে বোঝা যেতে পারে। প্রথম চিত্রটিতে (A)

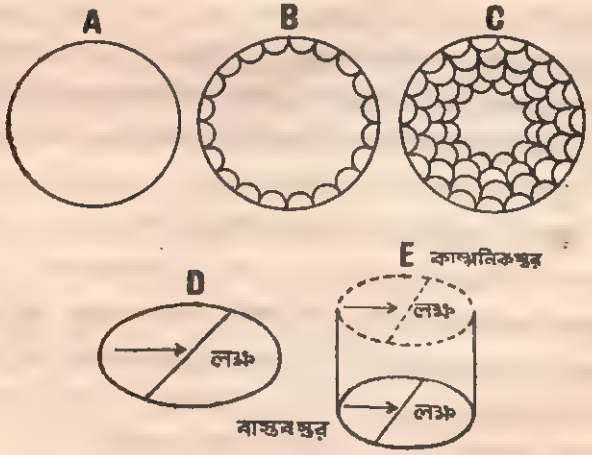

নবজাতকের বৈশিষ্ট্যহীন, স্বাতন্ত্র্যহীন অবিভক্ত মন একটি বৃত্তের আকারে দেখানো হয়েছে। (B) কিছু দিনের মধ্যেই আশে পাশের বস্তুর সংবেদন শিশুর মনে জমা হয়। শিশু বস্তুজগতকে জানতে পারে, আরো পরে

চেষ্টীয় ক্রিয়া কলাপ দেখা দিতে থাকে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শিশু-মনে সঞ্চিত হয় বহির্বাস্তবের স্মৃতি, ছবি, মূল্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি—এবং এই ভাবে শিশুর অন্তর্জগৎ তৈরী হয় (C)। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের বিভাজন ঘটে, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে (differentiation)। মনের আঘাত বা ব্যর্থতা থেকে ব্যক্তির প্রত্যাগতি (regression) ঘটার ফ্রয়েডীয় বিবরণকে ছবি দিয়ে (D and E) স্থানিক বিস্তার, সংকোচন সীমারেখার হেরফের দিয়ে মানসিক গতির স্বরূপ বোঝবার এই চেষ্টার অভিনবত্ব Kur Lewin ও তার সহকর্মীদের। (Barkar, Dembo, Tamara & Lewin, Frustration and Regression : An experiment with Children, Univ. Iowa Stud, Childwelfare, 1941, 18, No 1—Ref. Murphy, Historical Introduction to Modern Psychology, London, 1949 pp. 299-302)

আঘাতের দরুন ব্যর্থতাবোধ ও তার ফলে প্রত্যাগতি, প্রত্যাগতি মানে বিভাজনের ও বৈশিষ্ট্যীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া বা de-differentiation : আচরণের স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি ও আদি শৈশবের মানসিকতায় ফিরে যাওয়া। এই প্রকল্পের যথার্থ নিরূপণের জন্য এরা নার্সারী স্কুলের শিশুদের নিয়ে একটি পরীক্ষা চালান। এক সেট খেলনা নিয়ে খেলতে গিয়ে এদের সামাজিক ও গঠনমূলক প্রবণতা কতটা হয়েছে তার পরিমান আগেই নির্ধারিত করা হয়েছিল এক বিশেষ ধরনের স্কেলে। এদের পরীক্ষকরা কয়েক মিনিটের জন্য নতুন ও অনেক বেশী আকর্ষণীয় কয়েকটি খেলনা নিয়ে খেলতে দিয়ে আবার তাদের পুরনো খেলনার ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। ওদের আশা ভঙ্গ হলো। নতুন মজাদার খেলনাগুলোকে একটা তারের জালের পর্দা টেনে বাচ্চাদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হলো। এরপর, এই আশাভংগের পর বেশীর ভাগ বাচ্চাদের ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা গেল। অনেক আগে পুরানো খেলনাগুলো পেয়ে তারা যেরকম খানিকটা অযত্নে বা সাধারণভাবে এগুলোকে নাড়াচাড়া করতো, সেরকম করতে লাগল। যে খেলনার টেলিফোন তুলে বড়োদের অনুকরণে কথাবার্তা বলতো, সেই টেলিফোনটাকে মেঝের ওপর টেনে ঘড়ঘড় শব্দ করতে লাগলো। যে বিশেষ ধরনের খেলনার সামনে বসে চিঠি লিখতো সেখানে বসে কাগজের উপর হিজিবিজি কাটতে লাগলো। এদের মধ্যে খেলনা নিয়ে খেলা করার ফলে যে সমস্ত বিশিষ্ট ও পরিণত ধর্ম গড়ে উঠেছিলো সেগুলো ভেঙ্গে গেলো, তাদের প্রত্যাগতি ঘটলো। কুর্ট লেভিন—এই

প্রত্যাশা ভঙ্গজনিত প্রত্যাগতিকে ক্ষেত্রের সীমারেখার সংখ্যা ও দৃঢ়তার হ্রাস বলে বর্ণনা করেছেন। গাণিতিক পরিভাষায় টোপলজিকাল (Topological) পরিবর্তন। পরের চিত্র দুটিতে (D & E) ভাষার বদলে রেখার সাহায্যে মানসিক প্রেরণার প্রকৃতি, প্রেরণার বিরুদ্ধে বাধা, এবং ফলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার গতি পরিবর্তনের রূপদান করেছেন। 'D' চিত্রে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে শিশুর চিড়িয়াখানায় বা ঐরকম কোন আমোদ পাবার জায়গায় যাবার জোরালো ইচ্ছা বা মানসিক প্রেরণা, এই প্রেরণার বিরুদ্ধে পিতার জোরালো অননুমোদন দেখানো হয়েছে কালো দাগ দিয়ে। পরের চিত্রে (E) দেখানো হয়েছে বাধার ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে দিবাসুপ্তে অন্যস্তরে (উপরের দিকে) একটি প্রতিকল্প ক্ষেত্র তৈরী করেছে যেখানে বাধার দাগটি রন্ধ্রবহুল অর্থাৎ ভঙ্গুর ঃ কল্পনায় বাবাকে রাজী করানোর অথবা ফাঁকি দেবার উপায় আবিষ্কার করে লক্ষ্যে পেঁাছুবার আনন্দ উপভোগ করছে। লক্ষ্যে পেঁাছুতে না পারা পর্যন্ত শিশুর মনের ওপর চাপ বা পীড়ন থেকে যায় বলে শিশু দিবাসুপ্তের আশ্রয় নিয়ে চাপ দূর করার চেষ্টা করে। প্রতিষ্ঠা বা পদমর্যাদা লাভের আকাঙ্খা বা উচ্চাশা থাকা দরকার ঃ কিন্তু সেই উচ্চাশার মাত্রা খুব বেশী যদি হয় (যা পূরণ করা সেই স্থানকালের ও নিজের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়) তা হলে ব্যক্তি ব্যর্থতাজনিত হতাশায় ভুগবে, আবার যদি খুব কম হয় (যা আয়ত্ত করা খুবই সহজ) তা হলে প্রাপ্তির উল্লাস থাকবে না ঃ শিশুর অগ্রগতি ব্যাহত হবে—প্রত্যাগতি ঘটবে। (1) Zeigernik, Psychol Forsch, 1927, 9 ; (2) Gould, "An Experimental Analyses of Levels of Aspiration ; Ref. Murphy, op cit, p 301)

শিশুর ক্রমবৃদ্ধি ও মানসিকতার ক্রমবিকাশ নিয়ে সুসমৃদ্ধ আলোচনার শুরু বোধ হয় ১৮৭৬ থেকে যখন একটি পত্রিকায় [Mind (2) 1879] শিশুর দৈনিক ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস (A Biographical Sketch of an Infant) প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানলি হলের Pedagogical Seminary (১৮৯১) পত্রিকার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের সূত্রপাত ঘটে। তিনি গোঁড়া ডারউইন ভক্ত ছিলেন, শিশুর দৈহিক বৃদ্ধিকে তিনি অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি বলে বিবেচনা করেন। শৈশব ও কৈশোরের মানসিক বিকাশ দেহের অভ্যন্তরে যেসব পরিবর্তন ঘটে তারই পরিপূর্ণতার ফল। স্ট্যানলি হলের অনুপ্রেরণায় ইংলণ্ডে ও ফরাসী দেশে শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়। শৈশবের চিন্তাপদ্ধতি নিয়ে প্যারিতে

Binet ও যুক্তরাষ্ট্রে Woodworth পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে থাকেন। এরপর বুদ্ধ্যাংক নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করার প্রাথমিক চেষ্টা করেন, Binet (১৯০৪)। ১৯০০ সালে 'দ্য বায়োগ্রাফি অব্ এ বেবী' প্রকাশিত হয় (Millicent Shinn, California)। এইসব গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিশুদের শিক্ষাদান সম্পর্কে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। জন ডিউই প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন, এই শতাব্দীর গোড়া থেকে। শিশুদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কারণ ও তার প্রতিকারের চিন্তা করতে থাকেন জ্ঞানীগুণীরা। সুস্থ নবজাতকদের আচরণ অধ্যয়ন করার জন্য ডিউই বাল্টিমোরে একটি ক্লিনিক খোলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহার-বাদ'এর গবেষণায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ ও বিজ্ঞানকর্মী নিয়োগ করা হয়। সেই সময় Jean Piaget-এর জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকেন্দ্রের খুবই নামডাক। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে অর্থবল, লোকবল ও প্রতিপত্তি কম। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের শিশু মনস্তত্ত্বের গবেষণা দুই বিপরীত পথে চলতে লাগল। ইউরোপ পুরানো ঐতিহ্য অনুসরণ করে শিশুমনের ক্রমবৃদ্ধি, তার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যক্ষণ, বুদ্ধির বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণারত হল; আর আমেরিকা ওয়াটসনের 'কণ্ডিশনিং'-এর মাধ্যমে শিশুদের আচরণ অধ্যয়ন নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে এগুতে লাগল। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, ইউরোপ ও আমেরিকার গবেষকরা রুশ দেশের ইভান পেত্রোভিচ পাভলভের ল্যাবরেটারীতে যে সব কাজকর্ম চলছিল, সে সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য দেখলেন না।

এর উল্লেখ ব্যবহারবাদীদের লেখায় আছে, কিন্তু পাভলভ সম্পর্কে এ'রা নিস্পৃহ। সেচেনভ ও পাভলভকে এড়িয়ে চলবার কারণ হিসেবে একমাত্র অনুমান করা চলে যে মানুষের আত্মাকে ল্যাবরেটরী টেবিলে নিয়ে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর মত নিরীশ্বরবাদী উক্তি হয়তো ব্যবহারবাদীদেরও শেরিংটনের মত পাভলভের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। অতি সংক্ষেপে শিশুমন-নিয়ে গবেষণার ইতিহাস বিবৃত করে এবার শিশু মনস্তত্ত্বের বিশিষ্ট গবেষক Jean Piaget প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে।

Jean Piaget (জ্যাঁ পিয়াজে) : ত্রিশ বছর ধরে পিয়াজে শিশুদের নিয়ে বহু গবেষণা ও তাদের শিক্ষা দেওয়ার উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন। রুশো ইনষ্টিটিউটের উপর কর্তৃত্ব ও ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের গবেষণার অবাধ সুযোগ তাঁর গবেষণাকার্যকে বিশেষ সহায়তা করেছে।

শিশুর ভাষা ও চিন্তন নিয়ে তাঁর গবেষণা। বোধশক্তি বা অবধারণার (Cognition) উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বলে ব্যবহারবাদীদের কাছে তাঁর গবেষণার গুরুত্ব ছিল না, কাজেই যুক্তরাষ্ট্রে বহুদিন ধরে তিনি অনাদৃত ছিলেন। যুক্তরাজ্যেও খুব সমাদৃত ছিলেন—এমন নয়। নতুন করে তাঁর কাজের পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে এবং শিশু মনস্তত্ত্বের আলোচনায় তাঁর নাম শোনা যাচ্ছে। আজকাল আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পুস্তকে তাঁর লেখা পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। তাঁর প্রথম বইটিতে (The Language and Thought of Child, 1923) শিশু ও কিশোরদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। দুই থেকে চৌদ্দ বছরের শিশু ও কিশোরদের বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কিত ধারণা, কি দৃষ্টিতে তারা পৃথিবী ও অন্যান্য মানুষকে দেখে, চারিপাশের বস্তু ও প্রাণী নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা কি ধরনের ?—এই সব তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি নিজে একটি বিশেষ প্রণালী উদ্ভাবন করেন। ছেলেদের খেলার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের মানসিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। শিশুমনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তাঁর অভিমত সংক্ষেপে বললে এই রকম দাঁড়ায় : শিশুর আত্ম-উপলব্ধি ঘটে খুব ধীরে ধীরে, পরিবেশ থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বুঝতে না পারা পর্যন্ত সে নিজের বিষয়ীগত দৃষ্টিভংগী, সম্পর্কে সচেতন হয় না। বস্তু তার চোখে সে রকম, ঠিক সেইরকমই হবে—এই বিষয়ীগত ধারণায় সে আচ্ছন্ন। উদাহরণ দিলে শিশুদের এই মনোভাব বোঝা সহজ হবে। ঘরে একটা বড় টেবিলের ওপর একটা পর্বতের প্রকাণ্ড রিলিফ ম্যাপ (ধরা যাক হিমালয়ের) রয়েছে, টেবিলের কাছাকাছি বাচ্চাদের আলাদা আলাদা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরটির দেওয়ালে আরোহণের পথের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্বতটিকে যেমন দেখায়, সেইরকম অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের মানচিত্র রাখা আছে। পর্বতটির মানচিত্রের এদিকে ওদিকে কতকগুলি পুতুল দাঁড় করানো রয়েছে। এখন একটি বাচ্চাকে যদি এইরকম একটা পুতুল দেখিয়ে প্রশ্ন করা হয় যে এই পুতুলটি যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে পর্বতটি তার কাছে কতবড়, কেমন দেখতে হবে ? বাচ্চাটি উত্তরে বলবে ; সে নিজের জায়গা থেকে কেমন দেখছে, পুতুলটিও ঠিক তেমন দেখবে। বাচ্চার কাছে পর্বতের একটাই মাত্র রূপ—যে রূপ তার নিজের কাছে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই আত্মকেন্দ্রিকতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আর এক ধরনের প্রত্যয় জন্মাতে পারে যাকে বলা যায় 'অংশ

গ্রহণজাত প্রত্যয়' (Conception of Participation)। এই প্রত্যয় বাইরের বস্তুর সংগে শিশুকে আত্মীভূত করে দেয়। অংশগ্রহণজাত প্রত্যয় জন্মানোর ফলে শিশু অংশগ্রহণের বস্তুর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুর চিন্তা ও বস্তুর মূর্তরূপ এক হয়ে যায়। যে পুতুল নিয়ে শিশু খেলা করছে, বা যে ছোট সাইকেলে সে চাপছে তাকে তার জীবন্ত মনে হয়। পুতুলের বা সাইকেলের চিন্তার সংগে পুতুল ও সাইকেল বা সাইকেলের টায়ার এক হয়ে যায়। টায়ার পাংচার-এর চিন্তা করতে ভয় পায় পাছে টায়ার সত্যিই ফেটে যায়। আদিম মানুষের সর্বপ্রাণবাদের উদ্ভবের মূলে ছিল বোধ হয় সেই কালের মানুষের শিশুসুলভ অপরিণত মন। মধ্যযুগের জাদুবিশ্বাস—মারণ-উচাটন ও তুকতাক দ্বারা ভবিষ্যতের ঘটনা বা দূরের মানুষকে প্রভাবিত করা, শিশুমনের অংশগ্রহণজাত প্রত্যয়ের ফল। মাফি লিখেছেন, চিন্তার সর্বশক্তিমত্তার শিশুর বিশ্বাসকে (Omnipotence of thought) ফ্রয়েড যে ভাবে দেখেছেন, তার সংগে পিয়াজের দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য আছে। (Murphy, op. cit., p 395)। আত্মকেন্দ্রিকতাভিত্তিক চিন্তাধারা ও প্রত্যয়ের বন্ধন থেকে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ক্রমশ মুক্ত হতে থাকে। ভাষার ব্যবহার, প্রাকৃতিক শক্তির প্রাথমিক জ্ঞান, স্বপ্নের অর্থ বোঝবার চেষ্টা, নীতি দুর্নীতির বিচারের প্রয়াস ইত্যাদির ফলে শৈশবের বিষয়ীকেন্দ্রিক চিন্তা ও প্রত্যয় ধাপে ধাপে বদলাতে থাকে। স্বপ্নের ব্যাপারে ; পিয়াজে বলেছেন,—এই পরিবর্তন বিশেষভাবে বোঝা যায়। প্রথম দিকে স্বপ্ন জানালা গলিয়ে ঘরে ঢুকে বিছানায় শিশুর পাশে বসত। ক্রমে ক্রমে স্বপ্ন সম্বন্ধে শিশুর ধারণা বদলাতে থাকে, শেষে স্বপ্ন তার স্বকীয় স্থানিক অস্তিত্ব হারায়, নিজেরই একটি কৃত্য বলে ভাবতে শেখে শিশু।

পৃথিবী সম্পর্কে শিশুর ধারণা বিধৃত আছে ১৯২৯ সালে ছাপা একটি বইতে (The Childs' Conception of the World)। ঠাণ্ডা বাতাসে শিশুর কষ্ট হয় তাই সে শত্রু, সূর্যের আলোতে আরাম লাগে, তাই সূর্য বন্ধু। সূর্য অস্ত গেলে গাছপালা কষ্ট পায়, বরফ গললে নদীর আনন্দ হয়—এই সব সর্বপ্রাণবাদী কল্পনার রাজ্য থেকে শিশু ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে।

শিশুর নীতিজ্ঞান নিয়ে পিয়াজের গবেষণা মৌলিকত্বের দাবি রাখে। ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে বদলায় সে সম্বন্ধে পিয়াজের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। খেলার নিয়মকানুন মেনে চলা সম্পর্কে

তাঁর পর্যবেক্ষণ কৌতূহলের উদ্রেক করে। খেলার নিয়ম কানুন মেনে চলা ও হারজিত সম্পর্কে তিন বছরের শিশুর কোনো ঔৎসুক্য থাকে না। কে জিতল? জিজ্ঞাসা করলে, আদি শৈশবে শিশুর উত্তর হবে—আমি জিতেছি, আর সেও জিতেছে। প্রতিযোগিতার মনোভাব এ বয়সে থাকে না। বছর চার পাঁচেকের হলে শিশু মার্বেল খেলা, ফুটবল খেলা ইত্যাদি সব খেলার স্থানীয় নিয়ম-কানুন বিশেষ শ্রদ্ধার সংগে মেনে চলে। অন্য জায়গায় নিয়মকানুন ওদের মত নয় শুনলে শিশু গম্ভীর ভাবে বলে ওরা খেলার কিছুই বোঝে না। এখানেও আত্মকেন্দ্রিকতা, তবে সমাজ-সম্পর্কিত। মজার ব্যাপার এই যে, আরো একটু বয়স বাড়লে, বছর সাতেক হলে, শিশুর কাছে নিয়মশৃংখলা বিধিদত্ত পবিত্র ও অপরিবর্তনীয় একথা আর মনে হয় না। অবশ্য নতুন নিয়ম তৈরী করা তখনই হয়, যখন সবাই সেটা মানতে রাজী থাকে। পারস্পরিক অধিকার মেনে চলা ও সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি আরো সূক্ষ্মভাবে প্রতিপালিত হয়, যখন শিশু আর একটু বেড়ে কৈশোর রাজ্যে প্রবেশ করে। প্রতিবন্ধীদের সব ব্যাপারে বেশি সুবিধা দেবার ব্যাপারে এই বয়সের সব শিশুই একমত। পিয়াঁজের গবেষণা পদ্ধতি ও অভিমত সবক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয়, দেশকাল সংস্কৃতি ভেদে নীতিজ্ঞান ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। (The Moral Judgment of the Child ; Ref. Murphy, Historical Introduction to Modern Psychology, 1949, p. 397)। প্রায় তিরিশ বছর পরে প্রকাশিত একটি লেখায় আমরা পিয়াজেকে শিক্ষণসংক্রান্ত ব্যাপারে আরো মূর্ত সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্ট দেখতে পাই। তিনি বলছেন, চিন্তন মানে ধীরস্থির হয়ে ধ্যানমগ্ন হওয়া নয়; শুধু প্রত্যক্ষণ, ভাবমূর্তি, কল্পনা ইত্যাদির জ্ঞান নয়। চিন্তন মানে গতিশীল অবস্থায় কোনো একটি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা, কার্যকারণ নির্ণয় করা ; একটা ভৌত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের টুকরোগুলোকে বিযংগিত করা ; অবস্থান্তরণ পর্যবেক্ষণ করা ও তা থেকে সিদ্ধান্তে আসা ঃ—এই সব থেকে জ্ঞান লাভ চিন্তনকে সমৃদ্ধ করে। এই পাত্রান্তরণ বা অবস্থান্তরণ থেকে শিক্ষা-লাভ করতে সময় লাগে এবং সাত আট বছরের আগে এই ব্যাপার শিশুদের সঠিক বোধগম্য হয় না। বড় ফাঁদের নীচু গেলাস থেকে একটা সরু লম্বা গেলাসে কোনো তরল পদার্থ ঢাললে চার পাঁচ বছরের ছেলের মনে হবে পদার্থটির পরিমাণ বুঝি বেড়ে গেছে। আগের থেকে বেশি উঁচু হয়েছে তরল পদার্থটি—এথেকে তার এই ধারণা জন্মাবে। পাত্রান্তরণের ব্যাপারটা তার বোধগম্যতার বাইরে। ৭।৮ বছরের শিশুর কিন্তু এই ভুলটি ঘটবে না। চিন্তা

করা মানে বোঝা, এবং বোঝা মানে,—এ ক্ষেত্রে, পাত্রান্তরণের দরুন বস্তুর অবস্থান্তর। [Jean Piaget, The Genetic Approach to Psychology of Thought, Re—Ira. J. Gordon (Ed.) Human Development, Bombay, 1970, p 57]।

সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্তমান অবস্থা :

(ক **পাভলভবাদী**—শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও পরিণতির সংগে তার মানসিকতার ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সম্পর্ক জটিল বলে অনেকের মনে হতে পারে মানসিক ও বৌদ্ধিক ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশ বুঝি দৈবনিয়ন্ত্রিত বা অনির্দিষ্ট ও রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিকরা এ বিষয়ে আলোকপাত করা সত্ত্বেও এখনও দ্বয়বাদী ধ্যানধারণা-পুষ্ট শারীরবিদ ও মনোবিদ শিম্পাঞ্জী জাতীয় নরবানর ও মানুষের মানসিকতা ও বৌদ্ধিক বিকাশকে নিম্ন প্রাণীর মত পরাবর্তভিত্তিক বলে মানতে রাজী নন। পাভলভ তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রতিরোধ্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে নরবানরের সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়া তাদের জীবনের অবস্থা ও বহিরাগত পরিবেশের মধ্যে সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের ফলশ্রুতি। নরবানর বা মানবশিশুর বুদ্ধির বিকাশ বা উন্মেষ যতই জটিল ও আকস্মিক হোক না কেন, সবসময়েই পরাবর্তভিত্তিক ; দৈবসূত্রে নয়, জৈবসূত্রে গঠিত। পাভলভের অনেক বক্তব্য ও তথ্যভিত্তিক তত্ত্বকথা ইংরিজীতে অনূদিত না হওয়ার জন্য পাভলভ বর্ণিত নিমিত্তাত্মক শর্তাধীন পরাবর্ত (causal conditioned reflex)-এর তাৎপর্য সম্পর্কে অন্যদেশের বিজ্ঞানীদের বিশেষ কোনো ধারণা নেই। কয়েক বছর আগে পাভলভের একমাত্র জীবিত সহকর্মী E. A. Asratyan-এর এই সম্পর্কিত একটি লেখা একটি পত্রিকায় ছাপা হয় (মানবমন, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭৮)। 'নরবানর ও মানব শিশুর আকস্মিক বুদ্ধি উন্মেষের (শিম্পাঞ্জীর টুকরো কয়েকটা লাঠি জোড়া লাগিয়ে খাদ্যপ্রাপ্তির চেষ্টায় সাফল্য লাভ এই ধরনের আকস্মিক উন্মেষের একটি উদাহরণ) ব্যাখ্যায় পাভলভ কথিত (বুধবারের আলোচনা সভায়) নিমিত্তাত্মক শর্তাধীন পরাবর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন।' এই ধরনের আকস্মিক সাময়িক সংযোগ এমন একটি ঘটনা যা মানবশিশু বা নরবানরকে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের অনুধাবন ও নতুন জ্ঞান অর্জনের সহায়ক। সাধারণ শর্তাধীন পরাবর্ত সংগে উন্মেষের ব্যাপারে

পার্থক্য (আকস্মিক, নিমিত্তাত্মক, ঐচ্ছিক ও উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত) থাকলেও মৌলিক শারীরবৃত্তিক পার্থক্য কিছু নেই। শুধু Asratyan নয়, পাভলভের অনুগামীরা এখন অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিদ্যাকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করতে চাইছেন। অতি সূক্ষ্ম ও বিশেষ জটিল মননক্রিয়ার ব্যাখ্যার ব্যাপারে অনুমানভিত্তিক বা অন্তর্দর্শনভিত্তিক মনস্তত্ত্বের সাহায্য না নিয়ে ল্যাবরেটরীতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীল হবার জন্য শিশু মানসিকতা ও সাধারণ মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

খ) **ফ্রয়েডবাদী :** চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদিও ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব (অবাধ অনুষংগ পদ্ধতির) ও পরবর্তীকালের হর্নি, ফ্রম ইত্যাদির নয়া মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব আজ ব্যবহারবাদী চিকিৎসাপদ্ধতির তুলনায় অনেক কম সমাদৃত, যদিও ইডিপাস্‌গুটেষার, সর্বব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা আজ সাইকো-এ্যানালিটিক মহলেই একটি বিতর্কিত প্রসংগ, তা হলেও শিশু-চর্যায়, শিশু ও মাতাপিতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান প্রেষণা ও অবদমনতত্ত্ব (Unconscious motivation and repression) এখনও বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ফ্রয়েডবর্ণিত সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখ ও তার প্রভাব শিশু মনস্তাত্ত্বিকদের অনেককে আজও প্রভাবিত করছে। Anna Freud এবং Melanie Klein আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিশু মনস্তাত্ত্বিক। এঁদের মধ্যে আনা ফ্রয়েড ধ্রুপদী ফ্রয়েডবাদে বিশ্বাসী; তাঁর প্রভাব মধ্য ইয়োরোপের দেশগুলিতে আর মেলানি ক্লাইন (অনেক বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী) যুক্তরাজ্যে প্রতিপত্তিশালী। শৈশব ও কৈশোরের যৌনমানসিকতা ও যৌনক্রিয়া সম্পর্কে এঁদের তথ্যগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। এঁদের তত্ত্বের মর্যাদা বা মূল্য আগের মত না থাকলেও শিশুচর্যা ও কিশোর সমস্যা আলোচনায় এখনও উল্লেখ্য। তাছাড়া উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয় ইত্যাদির আলোচনা সূত্রে ফ্রয়েডবাদী ও নয়াফ্রয়েডবাদীদের উপেক্ষা করা চলে না। প্রসংগত উৎকণ্ঠা বা আতংকের ক্ষেত্রে Otto Rank-এর মতামতকে (যিনি এক সময়ে, ফ্রয়েডবাদী ছিলেন, পরে ফ্রয়েডের সংগে মতবিরোধ ঘটলেও সহজাত প্রবৃত্তিবাদতত্ত্ব থেকে তিনি সরে আসেননি) অগ্রাহ্য করা চলে না। তাঁর The Trauma of Birth (New York, 1952) পুস্তকটির উল্লেখ আজকালকার মনোবিদ্‌রা

প্রায়ই করে থাকেন। এ্যাডলার ও ইয়ুং অনেক দিন আগেই সাইকো-এ্যানালিটিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিছলেন; তাঁদের নিয়ে আজকের মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ মাথা ঘামাননা। কিন্তু এ্যাডলারের 'ক্ষতিপূরণ-তত্ত্ব' শিশুর বুদ্ধি ও শক্তির বিকাশের ব্যাখ্যায় এখনও তাৎপর্যপূর্ণ। (Adler Alexandra, The Concept of Compensation and Over. compensation in Alfred Adler's and K. Goldstein's theories, Individual Psychology 15: 79, 1959)

হীনমন্যতা (inferiority complex) কথাটি মনোবিজ্ঞানীরাও ব্যবহার করে থাকেন; মানব শিশুর অসহায়ত্ব তাকে জন্মমুহূর্ত থেকেই হীনমন্যতাবোধে আচ্ছন্ন করে এবং শৈশব থেকেই হীনমন্যতা ও দৈন্যবোধ দূর করার চেষ্টায়, নিজের অসহায়তের ক্ষতিপূরণ প্রচেষ্টায় সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঔপরিক-মন্যতা (superiority complex) লাভের উপায় ও পদ্ধতি নিজের জৈবিক ধর্ম (biological endowments) অনুযায়ী ও শৈশবের পরিবেশ অনুযায়ী শিশু আয়ত্ত করে। অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট হলেও এ্যাডলার এর 'ক্ষতিপূরণ তত্ত্ব' চিকিৎসকরা ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ উপযোগী মনে করেন। শিশু মানসিকতা ও শৈশবের ক্রমবিকাশে ইয়ুং এর কোনো বিশেষ অবদান নিয়ে আজকের গবেষক বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন বলে মনে হয় না। তবে তার 'ব্যক্তি-নিজ্ঞান' ও 'আদিপ্রতিমা' (archetype), সমষ্টিনিজ্ঞান (collective unconscious) শুধু শিল্পী সাহিত্যিককে নয়, কিছু কিছু মনোবিজ্ঞানীকেও প্রভাবিত করে। (Whitmont E, The Symbolic Quest: Basic Concepts of Analytical Psychology, New York, 1967) ইয়ুং শিশুর পরিবেশের চেয়ে সত্তার অন্তর্নিহিত সমষ্টিনিজ্ঞান সূত্রে নির্ধারিত স্বকীয় বৈশিষ্ট অর্জনের তাগিদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুর ভবিষ্যৎ পূর্ব-নির্ধারিত, মনে করেন ইয়ুং। বিধাতাপুরুষের অদৃষ্ট লিখনের নির্দিষ্ট পরিক্রমার বাইরে যাবার ক্ষমতা শিশুর নেই। শিশু মনের উপর পরিবেশ যা খুশী ছাপ দিয়ে তাকে প্রভাবিত করতে পারে না—ইয়ুং-এর এই ধারণা আজকের দিনে সমাদৃত হতে পারে না। শিশুমনকে এখন ইয়ুং-এর মত অলিখিত ফলক (Tabula Raza) বলে কোনো মানুষই বোধ হয় মনে করেন না। (Jung C. G, Collected Works, Panther Book, New York; 1953) বিশ্লেষণমূলক মনোসমীক্ষার (Analytical psychotherapy)

অনুগামীর সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু তাঁর 'আদিমাতৃরূপ'-এর ধারণা দ্বারা প্রভাবিত সাহিত্যিক শিল্পী এখনও বর্তমান।

J. H. Masserman একাধারে মনোসমীক্ষক (ফ্রয়েডবাদী), মনোরোগ চিকিৎসক ও জৈবমনোবিদ্ (biological psychologist) ও ব্যবহারবাদী। নিম্নপ্রাণীর উপর পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা তিনি জীবধর্ম ও জৈবপ্রবণতা সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং প্রেষণা (motivation), অভিযোজন (adaptation), অপসারণ বা বিচ্যুতি (displacement) ও দ্বন্দ্ব (conflict) এই চারটি মৌল জীবধর্ম ও জৈবপ্রেরণা সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করেন। সেই জ্ঞান ও তথ্য তিনি মনোসমীক্ষাতত্ত্বের সংগে সম্পর্কিত করে মনোচিকিৎসাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পান। পাভলভের পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন প্রেষণার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলে প্রাণীদের নিউরোসিস সৃষ্টি করেন (Masserman, Behavioral neurosis, University of Chicago Press 1943)। শিশুচর্যায় ও সুস্থ শিশুমানস গঠনে শিশুর মৌল জৈব প্রয়োজন মেটাবার পথে কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না হয় অথবা অন্য কোনো আকাঙ্খা পূরণের প্রেষণা তার মূল প্রয়োজনের গুরুত্ব কমিয়ে না দেয়—এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন :—ম্যাসারমানের পরীক্ষালব্ধ তথ্য এঁর তত্ত্বকে নাকি আরো জোরালো করেছে (Masserman, The Principles of Dynamic Psychiatry, Philadelphia, 1946) প্রসংগত বলা উচিত তার আক্রমণমুখিনতা এবং প্রক্ষোভধর্মিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ তথ্য ও ব্যাখ্যায় অনেকেই অসংগতি লক্ষ্য করেছেন (Furst, The Neurotic, Citadel Press, New York, 1954)

সুলিভ্যান (H.S .Sullivan) তাঁর ধ্রুপদী সাইকো-এ্যানালিটিকতত্ত্বের ফ্রয়েডবাদীদের মধ্যে বিরোধিতার জন্য এরিখ ফ্রমের প্রায় সমগোত্রীয়। * ফ্রয়েডের ইডিপাস্ গুটেষা, লিংগ-বিদ্বেষ ইত্যাদির স্বভাবধর্মিতা ও সর্বজনীনতা সুলিভান অস্বীকার করেছেন। মৃত্যুরতিবাদকে অতিমাত্রায় জীবধর্মী ও মানবধর্ম বিরোধী বলে সমালোচনা করেছেন। মার্গারেট মীড্, রুথ বেনেডিক্ট-এর মত নৃতত্ত্ববিদ্দের গবেষণাকে মূল্যবান মনে করেছেন। এদিক দিয়ে ফ্রম, হর্নি প্রমুখের সংগে তাঁর যথেষ্ট মিল আছে। সংস্কৃতি ও জীবনধারণ প্রণালী মানসিকতাকে প্রধানত প্রভাবিত করে—এই ধরনের মতবাদ প্রকাশ করে তিনি বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের অনেকটা

কাছাকাছি এসেছেন (Sullivan, Psychiatry and Social Science, New York, 1964)। অবশ্য সুলিভানের 'দরদ-শর্ত' (Tenderness Postulates) স্বতঃসিদ্ধ বলে অনেকেই মেনে নেবেন না ; কিন্তু মাতৃস্নেহের এই ব্যাখ্যার নতুনত্বের দাবি অস্বীকার করা চলে না। শিশুর প্রয়োজনের চাপা উত্তেজনা (tension) মায়ের মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে এবং এই উৎকণ্ঠাই দরদ ও মাতৃস্নেহ রূপে অভিব্যক্ত হয়। উৎকণ্ঠার (anxiety) নেতিবাচক দিক ছাড়া অন্যদিকের প্রতি দৃষ্টি দিলেন সুলিভান। উৎকণ্ঠার এই সৃজনাত্মক ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ সৃজনধর্মী। মাতৃস্নেহ ও অন্যান্য শিশু-মাতার সম্পর্ককে সুলিভান মানবধর্মী বৈশিষ্ট্য মনে করেন। সহজাত প্রকৃতিকে সুলিভান আদৌ গুরুত্ব দিতে চান না। শিশুর প্রয়োজনভিত্তিক বলে গণ্য করেন মাতৃস্নেহকে। শিশু—মায়ের দরদী সম্পর্ক থেকে মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎপত্তি। ফ্রয়েডের মতে শিশুশিক্ষা কামনা-তৃপ্তি ও বেদনাপরিহারের সমজাত প্রবৃত্তির (pleasure-pain principle) সংগে সংশ্লিষ্ট ; সুলিভানের মতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিরসনের প্রয়াস থেকে শিশু শিক্ষালাভ করে। চেষ্টা ও ভুল, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি ব্যবহারবাদী প্রত্যয়গুলিকেও সুলিভান গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন শিক্ষণ ব্যাপারে। যৌনতার ভূমিকা প্রধানত কৈশোরেই অভিব্যক্ত : শৈশবের মানসিকতা গঠনে যৌনতার ভূমিকা সম্পর্কে ধ্রুপদী ফ্রয়েডবাদীদের অভিমত তিনি গ্রহণ করেন নি।

এরিখ ফ্রম : নিও ফ্রয়েডবাদীদের মধ্যে এরিখ-ফ্রমের নামই এদেশে বেশি পরিচিত। ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা এবং মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডবাদকে সমন্বিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার জন্যতিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তিনি ফ্রয়েডের মত শুধু সহজাত প্রবৃত্তি ও জৈবধর্মের ওপর নির্ভর করেন নি। তাঁর মতে, সমাজ ও সংস্কৃতি শৈশবের প্রেরণাকে বহুলাংশে প্রভাবিত ও মানবিক করে। ঘৃণা-ভালবাসা, আধিপত্য কামনা ও বশ্যতা-মন্যতা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা ও ভয়—এই বিপরীতধর্মী চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে কোনো শিশু জন্মায় না সে সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে এই সব গুণ আয়ত্ত করে। (Fromm, Escape From Freedom, New York, 1941) শৈশব কৈশোরের মানসিকতার চেয়ে সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনের

ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে তিনি বেশি আগ্রহী; অনেক নতুন ও বিতর্কিত বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

গ) **অস্তিবাদী**ঃ ফ্রয়েডবাদ, ব্যবহারবাদ, পাভলভবাদকে দার্শনিক বিচারে যথাক্রমে দ্বয়বাদ, যান্ত্রিক জড়বাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আওতায় ফেলা চলে। অস্তিবাদী দর্শন এই যন্ত্রযুগের ভাববাদী দর্শন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অস্তিবাদী দর্শন বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। অস্তিবাদী মনস্তত্ত্ব অস্তিবাদী দর্শনের প্রতিলিপি। অস্তিবাদীদের মধ্যে আস্তিক ও নাস্তিক—দুই ধরনেরই পণ্ডিত আছেন। শিল্পে সাহিত্যে এঁদের যতটা প্রভাব, বিজ্ঞানে ততটা নেই। তবে মনস্তত্ত্ব (যে শাস্ত্র এখনও প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে শেখেনি) ও মনোরোগ চিকিৎসায় এঁদের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। অন্যান্য দর্শনের মত অস্তিবাদী দর্শন সুসংগঠিত নয়। প্রবক্তারা সকলেই প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, কিন্তু তাঁদের পরস্পরের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। এদের মধ্যে **Karl Jaspers**—(যিনি একাধারে দার্শনিক ও মনোরোগ চিকিৎসক) এর প্রভাবই মনস্তত্ত্বে ও মনোরোগ চিকিৎসায় অপেক্ষাকৃত বেশি। জাসপারস মনে করেন, শিশুর ভালবাসা, যৌনতা বা লিবিডোর সংগে যুক্ত কোনো প্রপঞ্চ নয়। ভালবাসা জন্ম থেকেই শিশুর মধ্যে বিদ্যমান, অস্তিতের প্রারম্ভিক এক সম্ভাবনাময় শক্তি—যা তার হাসিকান্নায় অভিব্যক্ত এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্ভাবনা নিয়ে ক্রমবিকশিত। সামনের বাধা যদি শিশুর সম্ভাবনাময় অগ্রগতিকে ব্যাহত করে এবং যদি পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে তার মানসিক পরিণতি না ঘটে, তাহলে তার মনে অপরাধবোধ ও অস্তিতত্ত্বমূলক উদ্বেগ উৎকন্ঠা জন্মায়, তার বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। অস্তিতত্ত্বমূলক উদ্বেগ উৎকন্ঠা ও অপরাধ বোধ (**excistential anxiety and guilt feelings**) ব্যক্তিকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অনস্তিত্বের যন্ত্রণা তাকে আতংকিত করে। কিয়েকের্গার্ড, হাইডেগার, সার্তর প্রভৃতি সব অস্তিবাদী দার্শনিকদের একটি জায়গায় মিল আছে। তাঁরা সকলেই আধুনিক যন্ত্রযুগের মানুষের সামাজিক দুরবস্থা সম্পর্কে সজাগ। পুরনো বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে, গণসংস্কৃতির (**Mass culture**) চাপে ব্যক্তিসত্তা বিলুপ্তপ্রায়, অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এই জাতীয় বিষয়ে অস্তিবাদী অধিকাংশ পণ্ডিতই প্রায় একমত। এঁদের মতে প্রতিটি

মানুষ আলাদা, তারা সবাই অর্থ ও মূল্য অনুসন্ধানে রত, নিজের লক্ষ্য ও গতিপথ নির্ণয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। অস্তিবাদী দার্শনিক নৈরাশ্যবাদী। মানবিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা অপারগ, এই তাঁদের বিশ্বাস। ব্যক্তির জটিল সমস্যা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়েই সমাধান সম্ভব। জীবন নিয়ে সে কি করবে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে তার নিজের ব্যাপার। শিশুর প্রথম কান্নায় সে জানাতে চায় যে সে জন্মগ্রহণ করতে চায়নি। কিন্তু তার চাওয়া না চাওয়াতে কিছু আসে যায় না। অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে তারই। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের সম্ভাবনা নেই। মানুষ জানে না সে কি ভাবে নিজের সংগে অপরের সম্পর্ক পড়ে তুলবে, তাৎপর্যপূর্ণ জীবন গড়ে তোলার চিন্তায় সে বিভ্রান্ত ও ভীতিবিহ্বল। আজকের মানুষ বিচ্ছিন্ন, সে যেন অন্যগ্রহের জীব,—এখানকার সবই তার অচেনা, সে ঈশ্বরকে চেনে না, অন্যকে চেনে না, নিজেকে চেনে না।

আমেরিকার মনস্তত্ত্বে যিনি অস্তিবাদ আমদানি করেছেন, সেই Rollo May আমাদের অতি পরিচিত Sartre-এর অভিমতকে অতিমাত্রায় 'নিহিলিস্টিক' ও বিভ্রান্তিমূলক বলে আখ্যাত করেছেন। সার্তর এর মতে 'বিইং' অস্তিত্বের ভিত্তি কিন্তু মানুষের কাছে হেঁয়ালির মতো অপরের কাছে 'আমি' একটা বিষয় (Object), আবার অন্যরাও আমার কাছে ভয়ের, কামনার, প্রক্ষোভের বিষয়। বিষয়ী (Subject) হিসেবে মানুষ অচেনা ও রহস্যময় ঃ—সার্তর-এর এই সব বক্তব্য আপাত-দৃষ্টিতে আত্মবিরোধী ; হাইডেগার (Heidegger)-এর বক্তব্যে বরং মানুষের ও জগতের পার্থক্যহীন বিপরীত দুই মেরু অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষ জানে মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু সে এই সত্যকে ভুলে থাকে। হাইডেগারের মতে সত্তার সত্যতার মধ্যেই নিহিত তার নিয়তিকে, অনিবার্যতাকে, যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে—স্বীকার করে নেবার সংকল্প। অস্তিবাদীরা কোনো নতুন ধরনের চিকিৎসার কথা বলেননি। ভয় ও উৎকণ্ঠা জয় করার উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা দ্বারা তারা চিকিৎসাকে বেশি ফলপ্রসূ করতে চেয়েছেন। (Jaspers, General Psychopathology, Chicago, 1963 ; May & Others, A New Dimension in Psychiatry & Psychology, Basic Books, New York 1958)

(ঘ) **প্রয়োগবাদী বা মানবতাবাদী (Humanistic) :** অস্তিবাদীদের মত এঁরাও ফ্রয়েডবাদী, ব্যবহারবাদীদের তত্ত্বকে প্রাধান্য দিলেও, এই দুই দলের সংগেই এঁদের মতধিরোধ বিদ্যমান। ব্যবহারবাদের উদ্দীপক—প্রতিক্রিয়া প্রকল্পকে তাঁরা অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট মনে করেন ; ব্যক্তি-মানসিকতার অন্তর্মুখিনতা ও গভীরতাকে পরিহার করার ফলে ব্যবহারবাদ এঁদের মতে খুবই অমার্জিত তত্ত্ব (vulgar) ; আবার ফ্রয়েডবাদের সর্বরতিবাদ, মৃত্যুরতিতত্ত্ব ইত্যাদি অতীব নৈরাশ্যজনক। মানুষকে তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রণে কিছুটা সক্ষম ও ভাগ্য গঠনে স্বাধীন বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে আছেন Allport, Maslow ও Rogers-এর মত প্রখ্যাত গণ্যমান্য ব্যক্তি। Allport তাঁর একটি পুস্তকে (Becoming, Basic Considerations for a Psychology of Personality ; Yale University Press, 1958) বলেছেন যে, ব্যবহারবাদীরা শূন্যগর্ভ সত্তার যে চিত্র এঁকেছেন, সেই চিত্র অনুযায়ী মানুষের বিচারবুদ্ধি, স্বাধীন ইচ্ছা, স্বকীয়তা নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কিছুই নেই; সে শুধু পরিবেশের টানাপোড়েনের মধ্যে, ছাঁচে ফেলা পুতুলের মত যান্ত্রিক ভাবে গড়ে উঠেছে। এই চিত্র মেনে নেওয়া চলে না। তেমনি ফ্রয়েডবাদীদের নিজ্ঞান প্রেষণা ও অযৌক্তিক কামনার দাস মানুষ তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যৌনশক্তি, আক্রমণপ্রবণতা ইত্যাদি জৈব শক্তিকে স্বীকার করেও বলা যায় যে মানুষ যুক্তিবুদ্ধি পরিকল্পনা ও সামাজিক ন্যায়নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আদিম সহজাত জৈব প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। মানুষকে এঁরা যান্ত্রিক 'রবট' অথবা কামনাবাসনাসর্বস্ব মৃত্যুরতি শক্তি দ্বারা পরিচালিত জীব মনে করেন না। আত্ম শক্তি বা 'ব্যক্তিত্ব' জাতীয় একটা কিছু কল্পনা না করলে শৈশব থেকে, প্রায় অক্রিয় অসহায় অবস্থা থেকে ক্রমবিকশিত ও পূর্ণগঠিত মানসিকতার ব্যাখ্যা করা যায়না। এই আত্মশক্তি (Self) শৈশব কৈশোরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রভাবিত হলেও, মূলত অন্তর্জাত। বাইরে থেকে দেখা না গেলেও এর প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। উইলিয়ম জেমসের (William James, The Principles of Psychology, Newyork 1890) এর আত্মজ্ঞান (Selfconcept) বা ফ্রয়েডীয় ইগোর সংগে প্রয়োগবাদীদের আত্মশক্তির কিছুটা মিল আছে। এই শক্তি আরো গুরুত্বপূর্ণ; আত্মবিকাশ ও কল্পনাকে কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে এর ভূমিকা আছে। ব্যক্তিকে এরা প্রাধান্য দিয়েছেন ও মূল্যনির্ধারণের ব্যাপারে সমাজের অনুমোদনের চেয়ে নিজের বিচারশক্তি ও পছন্দকে

অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। ওয়াটসন-স্কিনারের মত পূর্বশর্তায়ন (preconditoning) ও বর্তমানপরিবেশের দ্বারা ব্যক্তির ভবিষ্যৎ বিকাশ নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত বলে মনে করেন না প্রয়োগবাদীরা। প্রতিটি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ পুরোপুরি স্বতন্ত্র ; প্রজাতির বৃদ্ধি ও বিকাশের নিয়মকানুন অনেক শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। শিশু আত্মবিকাশ চায়, নিজের নিয়মে ও নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেড়ে উঠতে চায়, সম্পূর্ণ মানুষ হবার প্রবণতা থাকে তার মধ্যে। স্বকীয় উপলব্ধি ও ধারণা দ্বারা (শিশু ও কিশোর সমেত সকলের) আচরণ নিয়ন্ত্রিত মানুষ সম্পর্কে ইতি-বাচক ও আশাব্যঞ্জক ধারণা, আত্মোপলব্ধির প্রত্যয়কে কাজে লাগানো, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্বপ্রদান এবং মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে উদ্বেগ ও আত্মোন্নতি সম্পর্কে আগ্রহকে প্রয়োগবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের জনপ্রিয় করেছে। এর ফলে ব্যবহারবাদীদের যান্ত্রিক, ফ্রয়েডবাদীদের সহজাত প্রবৃত্তি-ভিত্তিক ও অস্তিবাদীদের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভংগী দ্বারা প্রভাবিত নিস্প্রভ আবহাওয়া যেন কিছুটা উজ্জল মনে হচ্ছে। কার্ল রজার্স-এর Client Centred Therapy (Boston 1951) পুস্তকে হিউমেনিস্টিক ব্যক্তিত্ব-মডেলের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা পড়লে মনে হয় এই বঞ্চনা-শোষণ-প্রতিযোগিতাভিত্তিক সভ্যতার মধ্যে পালিত হয়েও সবমানুষ অসুস্থ নয়; রুগ্নসমাজেও সুস্থ ও আশার বাণী এবং মূল্যবোধের কথা শোনা যায়। কিন্তু প্রয়োগবাদী এই হিউম্যানিস্টরা তাঁদের তত্ত্বে মস্তিস্ক ও মানসিকতার সম্পর্ক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বলে মনে হয় না। কেবলমাত্র বাইরের উদ্দীপক মানসিকতা গঠন করে না, ব্যক্তির আন্তর্মানসিক গঠন (internal psychological structure) তার ভাবনা-চিন্তা-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও নিরূপিত করে : এই অভিমত প্রকাশ করেছেন হিউম্যানিস্টরা। কিন্তু কিভাবে এই নিয়ন্ত্রণ ঘটে, সে সম্বন্ধে তাঁদের লেখা থেকে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না। এ্যালপোর্ট বলেছেন ব্যবহারবাদ গণতান্ত্রিক সমাজের মানুষের স্পষ্ট কোন ছবি দিতে পারেনি। মানুষ যুক্তিবাদী, স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারে, তার আদর্শ ও মূল্যবোধ আছে—এই ধারণার উপরই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত (Allport, op. cit)। আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষের মধ্যে যে সব গুণ বা ধর্মের উন্মেষ হওয়া উচিত, বা ব্যক্তির কাছে সমাজের প্রত্যাশা পূরণ যে হবেই ও তা সব সময়ে পাওয়া যাবেই এই—ধারণা বিজ্ঞানসম্মত কি ? গণতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থা যে ধনতন্ত্রের নিজস্ব নিয়মে বা দেউলিয়াপনা রোধ করতে অনেক সময় স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে যায়, সে কথা কি 'হিউম্যানিস্টক' জানেননা ? হিটলার মুসোলিনীর আমল তো খুব পুরনো হয়ে যায় নি। তাছাড়া, পুঁজিবাদী সমাজে, যেখানে গণতন্ত্রের ঢক্কা নিনাদ করা হচ্ছে সেখানে দুর্নীতি, উৎপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা, বিষম প্রতিযোগিতা মানসিকতাকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত করবে। এই রূঢ় সত্যকে অস্বীকার করলেই মানুষের মধ্যে মানবিকতার বিকাশ ঘটবে না। অস্তিবাদীদের মত তাঁরা নিরাশার বাণী শোনাতে চাননা, ফ্রয়েডবাদীদের মত মৃত্যুরতিবাদকে প্রাধান্য দেননা, ব্যবহারবাদীদের মত মানুষকে ছাঁচে ফেলে খুশীমত গড়ে তোলার কথা বলেন না। কিন্তু মানুষের কাছে যা প্রত্যাশা করেন উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরো উন্নতি না হলে তা পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাক্ কৈশোর ও কৈশোর উদ্গমের মত জটিল ব্যাপার সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য ও কৈশোর সমস্যা সমাধানে কোন মতাবলম্বীদের অনুসরণ করা উচিত তা নিয়ে মন স্থির করা বেশ কঠিন।

মনোবিদ্যার শাখা-উপশাখা যত, তার থেকে বেশি বোধ হয় বিভিন্ন মতাবলম্বী ও পৃথক পদ্ধতি অনুসরণকারী দল ও উপদলের অস্তিত্ব। ফ্রয়েড, ইয়ুং, এ্যাডলার্, হর্নি, ফ্রম, মীড প্রমুখ প্রবৃত্তিবাদী ও অন্তর্দর্শীদের এক গোষ্ঠীতে ফেলা যায়। শারীরবৃত্তিক ও জীববিদ্যাভিত্তিক এবং ব্যবহারবাদী ও শর্তাধীন পরাবর্ত ভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিকদের কিন্তু এক গোত্রীভূত করা চলে না। গেস্টালটবাদী ও অস্তিবাদী মনোবিদ্যার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি। আর মানবতাবাদী বা প্রয়োগবাদীরা সব গোষ্ঠীর কিছু কিছু অভিমত মেনে নিয়েও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পক্ষপাতী। আবার মনোবিদ্যাচর্চারত অনেকেই গ্রহণবর্জন ব্যাপারে উদারপন্থী ও বহুতত্ত্বভিত্তিক বা মিশ্রতত্ত্ব ভিত্তিক মতবাদের পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন, সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্ব, গেস্টাল্টতত্ত্ব, ব্যবহারবাদী ও অস্তিবাদী তত্ত্ব এমনকি অতীন্দ্রিয়বাদ ইত্যাদি সর্বতত্ত্বের মধ্যেই কিছু কিছু সারবস্তু আছে। সুবিধামত, প্রয়োজনমত, বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করাই বিধেয়। এক কথায় বলা চলে, মনোবিদ্যার প্রয়োগ ও গবেষণায় এখনও অপরিকল্পিত খেয়ালী মনোভাবের প্রাধান্য। বিজ্ঞানী মনোভাবের চেয়ে উদার সর্বমতসমন্বয়ের দিকেই যেন তাত্ত্বিকদের নজর বেশি। শারীরবৃত্তিক ও জীববিদ্যাভিত্তিক মনস্তত্ত্বের গবেষকরাও তাঁদের পরীক্ষানিরীক্ষার বাইরের

কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যায় সমাজে প্রচলিত ধারণার বা জনপ্রিয় ফ্রয়েডবাদের প্রয়োগে অভ্যস্ত। বছর দশেক আগে আমস্টার্ডাম থেকে প্রকাশিত 'বায়োলজিকাল সাইকলজির' প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যের উল্লেখ এখানে বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না। সম্পাদক লিখেছেন, "বায়োকেমিস্ট্রি ও বায়োফিজিক্স-এর উন্নতির সংগে সংগে মনে হয়েছিল যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক মনোবিদ্যার গবেষণা দ্রুতান্বিত হবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কার্যত সেটা সম্ভবপর হয়নি; কারণ জীববিজ্ঞান ও আচরণ বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় বা বিবৃত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার; অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় এই সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব হয়েছে এবং সেই সম্পর্ককে ভিত্তি করে বায়োলজিকাল সাইকলজি গড়ে উঠছে।" তার মানে এই বিজ্ঞ সম্পাদকের মতে জটিল মননক্রিয়ার কিছু কিছু জ্ঞেয়, বাদবাকি অজ্ঞেয় বা রহস্যময়। সম্পাদক বলেননি যে নতুন পদ্ধতি বা নতুন ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্জ্ঞেয় স্থানেও আলোকপাত করা যায়। মনে হয়, ভাববাদী বিষয়ীমুখীন দর্শনের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করার ইচ্ছে এঁদের নেই। 'দর্শনের অংগীভূত ছিল মনস্তত্ত্ব, একথা সকলেরই জানা। বস্তুবাদ ও ভাববাদ গ্রীসে, রোম ও ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বস্তুবাদী দার্শনিক ডেমোক্রিটাস এপিকিউরাস সম্বন্ধে আমরা যতটা জানতে পারি, চার্বাক সম্বন্ধে ততটা জানিনা, কারণ চার্বাক ও অন্যান্য লোকায়ত দার্শনিক-দের মতামত সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান শুধুই আছে; তাও আবার প্রতিপক্ষদের-লেখা থেকে সংগৃহীত। তাঁদের লেখা পুঁথিপুস্তক বিরল, দুষ্প্রাপ্য। এঁদের বক্তব্য মোটামুটি একই ধরনের। মানবমনের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, ব্যক্তিত্ব—গোষ্ঠীর আচরণ—এক কথায়—মানসিকতা—পার্থিব ও সামাজিক কারণ থেকে উদ্ভূত। অপরপক্ষে, প্লেটোর মতে মানবপ্রকৃতি ঈশ্বরদত্ত আর এ্যারিস্টটলের মতে অন্তর্নিহিত, জন্মগত। আমাদের পরিচিত ভারতীয় দর্শনে আরও সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবে এই অভিমতই ব্যক্ত। বস্তুবাদীদের আদিম ধারণা আধুনিক ব্যবহারবাদী মনস্তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করেছে, অনেক সংযোজন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে। রাজনীতিতে এই মতবাদ 'র‍্যাডিক্যাল' নামে অভিহিত। এঁরা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও মান-সিকতাকে ব্যক্তির কোনো কার্যকলাপের জন্য দায়ী মনে করেন না। দায়ী সামাজিক সংগঠন। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়ী না করে কেবলমাত্র সমাজ

সংগঠনকে দায়ী করা চলে কি? এই মতবাদ কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। জন লকের 'ট্যাবুলা র‍্যাজা'(Tabula Raza) ব্রিটেন আমেরিকায় এক সময় বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। ভাববাদীদের ধারণা শাসক ও ধর্মনেতাদের দ্বারা সমর্থিত। দুহাজারেরও বেশি বছর ধরে এঁদের প্রভাব ও প্রচারে মানুষ বিশ্বাস করে আসছিল যে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুযায়ী সমাজে শ্রেণীবিভাগ ঘটে। প্রকৃতিগত দিক থেকে ক্রীতদাস হবার বিশেষত্ব থাকার জন্যই একজন ক্রীতদাস হয়, আর একজনের প্রকৃতিতে প্রভুত্বের গুণাবলী নিহিত থাকার জন্যই সে প্রভু। এই ভাবে সমাজে জাতিপ্রাধান্য, শ্রেণীপ্রাধান্য পুরুষপ্রাধান্য ইত্যাদি 'মিথের' উদ্ভব হয় ও ঐ ভাবধারায় আচ্ছন্ন মনস্তাত্ত্বিকদের দ্বারা সমর্থিত হয়। উইলিয়াম জেমস্ ও সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বে এই সামাজিক 'মিথের' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য আজকের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক এই ধারণাকে বিশেষ আমল দিচ্ছেন না " (লেখকের একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি)

এই তালগোল পাকানো পরিবেশে মনোবিদ্যাকে তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) দ্বয়বাদাশ্রিত অধি-মনোবিদ্যা অভিহিত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব" (২) যান্ত্রিক জড়বাদ পুষ্ট থর্নডাইক-স্কিনারের ব্যবহারবাদী মনস্তত্ত্ব; (৩) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-সমর্থিত পাভলাভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব।

পরিশেষে বলা দরকার, প্রাক্ কৈশোর ও কৈশোরের ক্রিয়াকলাপের ও চিন্তা-ভাবনার এবং কৈশোর সমস্যার কারণ নির্ণয়ে মনের উন্মেষ-বিকাশ-সম্পর্কিত জাতিজনিক ও ব্যক্তিজনিক জ্ঞান এবং মানব-সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস জানা অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়। এ ছাড়া প্রয়োজন চৈতন্যের উদ্ভব সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব যার সাহায্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উদ্দীপক ও শিশু মস্তিষ্কের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অনুধাবন সম্ভব হয়। আমাদের বর্তমান জ্ঞান দিয়ে মানবচেতনার ও মানসিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সব কিছুর সম্যক ব্যাখ্যা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষালব্ধ তথ্য উপাত্তকে ভিত্তি করেই আমাদের আরো নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য অগ্রসর হতে হবে। অধ্যাত্মবিদ্যা, অধিবিদ্যা, পরাবিদ্যার দ্বারস্থ হলে অথবা পণ্ডিতদের বহুতত্ত্বভিত্তিক, মিশ্রতত্ত্বভিত্তিক, উদারনীতিক সমন্বয়ভিত্তিক, বক্তব্যকে আশ্রয় করে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। মননক্রিয়ায়

অনেক পরিবর্তনশীল শর্ত (Variable Conditions) আছে স্বীকার করি, তা সত্ত্বেও মস্তিষ্ক মননক্রিয়ার জনক বা অধঃস্তর (substratum) এই সহজ সত্যটি মেনে নিলে বিজ্ঞানীদের কাজ, বোধ হয়, সহজ হবে এবং বিরোধ বিসম্বাদ কমবে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা মানসিক ক্রিয়াকলাপের গবেষণায় এংগেলসের অবশ্যম্ভাবিতা ও আকস্মিকতা (Necessity and chance) সম্পর্কিত বিপরীতের ঐক্য (unity of opposites) সূত্রের প্রয়োগ করার ফলে অনেকটা সুবিধা পেতে পারেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক নিমিত্তবাদ (Mechanical determinism) ও অধিবিদ্যা (Metaphysics) প্রভাবিত দুই বিপরীত মতবাদের খণ্ডন করে এংগেলস তাঁর (Dialectics of Nature) পুস্তকে বিপরীতের ঐক্য প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করার ফলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বহু হেঁয়ালি ও রহস্যের অবসান ঘটেছে। তিনি ডারুইনের বৈপ্লবিক তত্ত্ব,—প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে প্রজাতির উদ্ভবতত্ত্বের মধ্যে আকস্মিকতা ও অবশ্যম্ভাবিতার দ্বান্দ্বিক সমন্বয় আবিষ্কার করেছিলেন। এছাড়া এংগেলস ব্যক্তি চৈতন্যের বিকাশকে প্রজ্ঞতত্ত্ব ভ্রূণতত্ত্বের আলোকে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন। সভ্যতার বিবর্তনের সংগে সংগে চেতনার ক্রম-বিকাশ শৈশবে অল্পসময়ের মধ্যে পুনঃ সংগঠিত হয়। (Marx and Engels, Selected Works, Moscow, 1970, P 341) যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়ায় ও অন্যান্য উন্নত দেশে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন এক বিশেষ রূপ নিয়েছে। একদিকে গোটা মস্তিষ্কের সমন্বিত ক্রিয়াকলাপ, অন্যদিকে একগুচ্ছ কোষের ক্রিয়াকলাপ আলাদা আলাদা ভাবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে এবং এই দুই ক্রিয়াকলাপের মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে। এর ফলে প্রাক্-কৈশোরের মানসিকতা, কৈশোরের সমস্যা ইত্যাদির উপর বিশেষ আলোকপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গোটা মস্তিষ্ক এবং বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশের দরুন উদ্দীপ্ত মস্তিষ্কের বিশেষ অংশের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নির্ণয় হয়তো ক্রমশ সহজ হবে।

সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রাক-কৈশোরকালীন মানসিকতা ও চেতনা বিকাশে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে যা বলেছেন, খুব সংক্ষেপে সেই কথা বলে প্রাক-কৈশোর অধ্যায় শেষ করছি।

শিশু প্রাথমিক পর্যায়ে বড়দের সহযোগিতায় ভাবের আদানপ্রদান শিক্ষা করে। এই পারস্পরিক সংযোগ (communication) মানুষের আদিম সমাজে সংস্কৃতির প্রথম অভিব্যক্তি; ছোটদের পরবর্তীকালের সামাজিক

প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংযোগের গুরুত্ব অসাধারণ। শিশুর এই প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণা জন্মাবার ও এই প্রয়োজন মেটাবার উপায় ও উপাদান পরিবারের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই বিদ্যমান (The Development Communication in Children of Pre-school Age, Moscow, 1976)। এর পরের ধাপে, দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে শিশু জিনিষপত্র নাড়াচাড়ার মাধ্যমে সামাজিক কাজকর্মের মৌলিক সূত্র আয়ত্ত করতে থাকে। নিজের হাত পা সঞ্চালন করে সহজতম কাজ করার ফলে একদিকে চিন্তাবৃত্তির স্ফুরণ ঘটে, অন্য দিকে নিজেকে বড়দের ও সমবয়সীদের কাছে কাজের লোক হিসেবে জাহির করে। তার পর আসে শিশুদের খেলার পর্ব। (জাঁ পিয়াজের পরীক্ষানিরীক্ষার কথা আগেই বলা হয়েছে) এই পর্বে শিশু সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, অন্যের অধীনতা জাতীয় আন্তর্মানবিক সম্পর্কের সংগে পরিচিত হয়। এই সময়ে মনে মনে খেলা করা, জয়লাভ করা, খেলার জিনিষের বিকল্প বা প্রতীক কল্পনা করায় অভ্যস্ত হয়; শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে। শিশুর মানসিকতা গঠনে ও চেতনার বিকাশে খেলা ও খেলনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সব দেশের মনস্তাত্ত্বিকরাই একমত। খেলনার ব্যবহারে শিশুদের সংবেদন ও চেষ্টীয় ক্ষমতার বিকাশ ঘটতে থাকে। সভ্যতার বিকাশের সংগে সংগে খেলনার রূপান্তর ঘটে, সরল থেকে জটিল হতে থাকে। পণ্য উৎপাদনে যত বেশি নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতে থাকে, খেলা ও খেলনার ধরন ততই নতুন ও যন্ত্রভিত্তিক হতে থাকে। শিশুর বয়স বাড়বে, সংগে সংগে ক্রমশ সে আদিম সমাজের সরল খেলনা থেকে আধুনিক কালের জটিল খেলনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আজকাল খেলা ও খেলনার মাধ্যমে আধুনিক ইলিক্ট্রনিক যুগের যন্ত্রপাতির সংগে শিশুর প্রাথমিক পরিচিতি ঘটে। খেলাকে শিক্ষামূলক করার প্রচেষ্টা চলেছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। খেলার মাধ্যমে শৈশবেই বিজ্ঞান, শিল্প, সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান ও ঔৎসুক্য বাড়াতে চান সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা। মনোবিদ্যার নতুন প্রকল্প আবিষ্কার করে তাঁরা শিশুদের এই ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যা খুঁজছেন। মস্কো থেকে প্রকাশিত "Social Science" পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের ও Platanov-এর লেখা একটি পুরনো বই থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। আমার লেখা বুঝতে অনেকের সুবিধা হবে — এই আশায়।

"Psychical development is based on man's specific psychic reproductive activity. Through this he assimilates the historically moulded fundamental needs and ability.....Later, when production becomes substantially more complicated, games are devised to develop the child's ability for learning.

This latter activity introduces the child to the world of science, art, law and morality. These instill in him the foundations of theoretical thinking and orientation in the sphere of the highest forms of human consciousness. Under socialist conditions, forms of culture emerge which being assimilated through learning, facilitate the personality's all round development.

The next research task is the discovery of psychological laws of all types of childern's reproductive activity, through which they assimilate the historically formed human abilities." [Social Sciences, Moscow, No. 2, 1982, p. 126]

শিশুদের মানসিকতার বিকাশ বিষয়ক আর একটি উদ্ধৃতি খুবই প্রাসংগিক :

"Any higher psychical function in the development of the child appears twice : first, as collective, social activity, that is, as an interpsychical function, and secondly, as an individual activity, as an internal mode of child's thinking, as an intrapsychical function" [Vygosky, Selected Psychological Studies, Moscow, 1956, pp. 93 (in Russian)—quoted in Social Sciences No. 2. 1982.) "Frederick Engels showed that consciousness is a product of the human brain and man himself is a product of nature". V. I. Lenin held that man's consciousness is "the highest product of specially

organised matter—the substance of the brain. Karl Marx emphasised another form of human consciousness, saying that it is social product and will continue to be such as long as man exists. Consciousness and speech have developed together in the process of labour" (K. Platanov, Psychology, Moscow, 1965, p. 18).

(৮) **ভিলহেল্ম্ রাইখ** ফ্রয়েডের মত মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডবাদের সমন্বয়ে নতুন এক তত্ত্ব প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে তাঁর Character Analysis প্রকাশিত হবার পর তিনি আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষণ-বাদী সংস্থা ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯৩৮ থেকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হন। "রাগমোচনের ভূমিকা" (The Function of the Orgasm) ও 'যৌন বিপ্লব" (The Sexual Revolution) বই দুটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পুনঃপ্রকাশিত হবার ফলে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং মনোরোগ চিকিৎসক হিসেবে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কতকগুলো অদ্ভুত আবিষ্কারের দাবী তোলাতে তাঁকে নিয়ে একসময় খুবই হৈ চৈ হয়েছিল। ১৯৫০ সাল নাগাদ তিনি জানালেন যে তিনি প্রাণশক্তিকে "বি-অন" (bion) নামক ক্ষুদ্র আধারে সঞ্চিত করে 'অরগোন' বক্স (Orgone box) নামক একটি বড় ঘরে জড়ো করতে পেরেছেন ; এবং এই ঘরে রোগীদের শুইয়ে রেখে অনেক রকম মানসিক রোগ নিরাময় করা যায়। তাঁর এই অদ্ভুত দাবী অনেকেই মেনে নিতে পারেননি ; এবং এই দাবীর জন্য তাঁকে মানসিক রোগাক্রান্ত বলে মনে করা হয়েছিল। এর আগে তাঁর যৌন-বিপ্লব" পুস্তকে শিশু ও কিশোরদের লালনপালন সম্পর্কে যে বিধান ও নির্দেশ দিয়েছিলেন সেইগুলোই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন : (ক) মলমূত্র ত্যাগ ও ধোয়া মোছা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে (toilet training) কোনো নিয়ম ও বাধানিষেধ শিশুদের ওপর আরোপ ঠিক নয় ও শিশুহস্তমৈথুন-এর ক্ষেত্রেও বাধা দেওয়া উচিত নয়, এবং শিশুর দাবী মত তাকে খাওয়ানো উচিত (demand feeding ; (খ) ১৫ বছর থেকে কিশোর-কিশোরীদের অবাধ যৌন স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। সমস্ত যৌন অবদমনই বয়স্কদের সামাজিক আধিপত্য বজায় রাখার কৌশল : এখানে বিপ্লবী হার্বার্ট মারকিউসের মতের সংগে তাঁর অনেকখানি মিল আছে (মানবমন ১৯৮১ সংখ্যা ১ ও ১৯৮২ সংখ্যা ২, ৩ দ্রষ্টব্য)। (গ) বর্তমান

সমাজের এক পতিপত্নীত্ব মূলক (monogamy) বিবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তে আর্থনীতিক স্বাধীনতাভিত্তিক মিলন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। শেষ বয়সে মনে হয় এই সব বিধান শৃংখলার প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। (Reich – The Sexual Revolution—Vision Press N. Y. 1969).

এরিখ এরিকসন (Erik. H. Erikson) : ১৯৩০ থেকে ১৯৬৪/৬৫ পর্যন্ত ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করেও এরিখ ফ্রোমের (Eric Fromm) মত লিবিডো তত্ত্বকে পরোক্ষভাবে নস্যাৎ করেছেন। ফ্রোম এক জায়গায় লিখেছেন যে লিবিডো তত্ত্বকে নস্যাৎ করলেও ফ্রয়েডের তথ্য ও বিশ্লেষণকে অস্বীকার করা যায় না। চারিত্রিক সংগঠনে একটি সূত্র থেকে প্রাপ্ত এনার্জিই প্রেরণা জোগায় *। এখানে তিনি বহির্বাস্তব ও সামাজিক সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত বলেছেন, যে এরিকসনও শেষ জীবনে স্বীকার করেছিলেন যে চারিত্রিক সংগঠনের সঙ্গে ফ্রয়েড বর্ণিত যৌন-পরিক্রমা ও লিবিডো-অবরোধের কোনো সম্পর্ক নেই। এইভাবে তিনিও পরোক্ষভাবে লিবিডো তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন। ** এরিকসন তিরিশের দশকে ও চল্লিশের দশকে কয়েকটি আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান উপজাতির কিছু প্রতীকধর্মী ক্রিয়াকলাপের ও অতিকথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে এই সবের সংগে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান। উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ার ইয়োরক (Yurok Indians) জাতির বাৎসরিক আনন্দ উৎসব ইত্যাদির সঙ্গে তাদের প্রধান খাদ্য একজাতীয় মাছের (Salmon) সমুদ্র থেকে নদীতে অনুপ্রবেশের সময়ের সম্পর্ক আছে। এ-সম্পর্কে ঐ উপ-

* But even if one discounts the libido theory, his discovery (Freud's, D G) loses none of its importance for the clinical observation of the Syndromes.....that a common source of energy feeds them remains equally true. (Fromm, Anatomy of Human Destructiveness, Penguin p : 21)

** Erik. H. Erikson (1964) in the late development of his theory arrived at a similar point of view in terms of 'modes' without emphasising so clearly the differences from Freud. He demonstrated in regard to the Yurok Indians that the character is not determined by libidinal fixations and he rejects an essential part of libido theory for the sake of social factors (Ibid p : 22)

জাতির মানুষরা কিছুই জানেনা। এই সব আনন্দ-উৎসব তাদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তার সঙ্গে 'লিবিডো'র প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্বকে নাকচ না করেও এরিকসন চরিত্র গঠনে আর্থ-সামাজিক প্রভাবের তাৎপর্য স্বীকার করলেন। অনেকে বলবেন যে, Yurok দের পূর্বপুরুষরা জ্ঞাতসারেই তাঁদের পৌরাণিক অতিকথা (mythology) ও কাল্পনিক কাহিনী (fantasy) গড়ে তুলেছিল। বর্তমানের সেই সূত্রটি হারিয়ে গেছে। (Murphay, 2949) ***

উৎস

(1) Wells. H.K., Pavlov and Freud—2 Vols, International Publisher, New York, 1956.

(2) A. P. A.,—Ethical Standard of Psychologists, Washington D. C. 1963.

(3) Lenin, Materialism and Empirio-Criticism, New York, 1927.

(4) Simond (Ed), Psychology in Soviet Union, Routledge and Kegan Paul Ltd., 1957.

(5) Krasnogorsky. N. I, The Development of Study of the Physiological activity of brain in children, Moscow, 1935.

(6) Ivanov-Smolensky, A. C., Concerning the Study of the joint activity of the first and the second signalling system—Journal of Higher Nervous Activity Vol I no. 3

(7) Lublins kaya, A. A, Speeches at the Conference on Psychological questions, Moscow, 1954.

(8) Watson., Behaviorism, New York, 1930.

*** Murphy, Historical Introductiou to Modern Psychology, 1949. p 843.

(9) Pavlov., I. P .—Selected Works, Moscow, 1954.

(10) Gantt, Conditioned Reflexes and Psychiatry, International Publishers, New York, 1941.

(11) Freud. S, The question of lay analysis. New York, 1954.

(12) Frued S, Civilization and its discontents, London, H. garth, 1930.

(13) Freud. S. Totem and Taboo, New York, 1939.

(14) Freud S., Basic Writings. Ed. Brill, The Modern Library. New York, 1940.

(15) Rogers. C, A therapeutist's view of psychotheraphy, Boston Houghton Miffin, 1961.

(16) SKinner. B. F., Science and Human behavior, New York, 1953.

(17) Freud. S, Introductory Lectures on Psychology, London, 1929.

(18) Furst, The Neurotic, Citadel Press, New York, 1954.

(19) Kursanov., Fundamentals of Dialectic Materialism, Moscow, 1967.

(20) Murphy., Historical Introduction to Modern Psychology, 1948.

(21) Piaget. Jean, The Language and Thought of the Child, London, Routledge & Kegan Paul, 1926.

(22) Piaget, Jean. The Moral Judgment of the Child, New York, Harcourt Orau, 1932.

(23) Piaget, Jean, The Genetic approach to Psychology of thought ;—Journal of Educational Psychology, 1961, 52.

(24) Asratyan, E. A, Manab Mon (Beng.) Calcutta, Jan-March, 1978).

(25) Adler. Alexandra ; 'The Concept of Compensation and Over-Compensation in Alfred Adler's and K. Goldestein's Theories ; in 'Industrial Psychology' 15 ; 79, 1959.

(26) Whitman, E., The symbiotic quest ; Basic Concepts of Analytical Psychology, New York, 1967.

(27) Jung, C. G, Collected Works, Panther Book, New York, 1953.

(28) Masserman, Behavioral Neurosis, University of Chicago Press. 1943.

(29) Masserman., The principles of Dynamic Psychiatry, Philadelphia, 1946.

(30) Sullivan., Psychiatry and Social Science, New York, 1964.

(31) Fromm. E., Escape from Freedom. New York, 1941.

(32) Jaspars, General Psychopathology, Chicago. 1963.

(33) May, and others, A new dimension in psychiatry and psychology, Basic Books, New York, 1958.

(34) Allport, G. W., Becoming ; Basic Considerations for a psychology of Personality, Yale Uuiversity Press, 1955.

(35) Rogers, Carl. Client Centred Psychology, Boston ; 1951.

(36) Engels. Dialectics of Nature, Moscow, 1954.

(37) Marx and Engels, Selected Works, Moscow, 1970.

(38) Social Sciences, Moscow, No. 2. 1982.

(39) Pladanov. K., Psychology, Moscow, 1965.

(40) Reich, W. The Sexual Revolution, Vision Press, New York, 1969.

(41) Fromm, E. Anatomy of Human Destructiveness Penguin Books, 1974.

সারাংশ

প্রাক কৈশোরের মানসিক বিকাশ সম্পর্কে কয়েক জন প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকের অভিমতের সারাংশই পরিবেশিত হয়েছে। কাজেই এই অধ্যায়ের সারাংশ লেখার প্রয়োজন নেই বলে মনে হচ্ছে।

প্রশ্ন

(১) ফ্রয়েড ও পাভলভের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর মৌল পার্থক্য কি? সংক্ষেপে আলোচনা কর?

(২) আধুনিক মনোবিদ্যাকে সুসংগঠিত বিজ্ঞান বলা চলে কি? যুক্তি দ্বারা নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠিত কর।

(৩) আচরণবাদী মনোবিদ্যার পাভলভীয় মনোবিদ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে কি? থাকলে সেই পার্থক্য কোথায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দাও।

(৪) শিশুর শিক্ষা শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক—এর পক্ষে ও বিপক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।

(৫) 'গেষ্টাল্ট, কথাটির মানে কি? গেষ্টাল্ট মনস্তত্ত্বের প্রসারের সঙ্গে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক ছিল কি।

(৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের সমাদর ঘটে। কারণ বিশ্লেষণ কর।

(৭) পাভলভীয় মনোবিদ্যা প্রধানত সমাজতান্ত্রিক দেশে ও ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা প্রধানত ধনতান্ত্রিক দেশে সমাদৃত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্রমবৃদ্ধি : স্তর ও অনুক্রম

শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের পর যে সব মানসিক পরিবর্তন ঘটে তার পেছনে থাকে দেহের বৃদ্ধি ও শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন আর উদ্দেশ্য পরিবারের বাইরের সমাজের সংগে নিজেকে সংযুক্ত করা এবং মানিয়ে নেওয়া। পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সংগে অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন সব নতুন নতুন মানস-ধর্মের উন্মেষ ঘটে যার ফলে সমাজের সংগে কিশোরের সংযুতি ও সমাজের উপর কিশোরের প্রভাব বৃদ্ধির দরুন কিশোর আর তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সব ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী মস্তিষ্ক নতুন নতুন সংগঠিত পরাবর্তের সাহায্যে নিজেকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করতে থাকে। শৈশবের প্রেস বা চাপা-উত্তেজনা (tension) ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে প্রেরণা, উদ্বেগ প্রয়োজন সৃষ্ট হয়। সাধারণ প্রক্ষোভ ক্রমশ সূক্ষ্ম অনুভূতি, স্নেহ, প্রেম জাতীয় ইতিবাচক মনোধর্ম অথবা ভীতি, ক্রোধ জাতীয় নেতিবাচক ধর্মে পরিণত হয়। শিশু 'দেহ-মন'-এর সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে তার কাছে দুর্বোধ্য পরিবেশকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে নির্দিষ্ট আচরণবিধি আয়ত্ত করে, অবস্থা পরিবর্তনের সংগে সংগে ক্রিয়াকলাপেরও পরিবর্তন দরকার বুঝতে পারে। নিজের সম্বন্ধে এবং যে বিশ্ব প্রকৃতির সে অংশ-বিশেষ, সেই বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে তার অনিশ্চয়তা দূর হয়, মূল্য ও বিশ্বাসের প্রণালীবদ্ধ এক নিয়মের জগতের সন্ধান পাবার ফলে।

দৈর্ঘ্য বাড়ছে, ওজন বাড়ছে ; নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে সব কিশোরকিশোরী শুধু সচেতন নয়, কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু। এই দেহবুদ্ধি সম্পর্কে সমাজ সংস্কৃতি ভেদে কিশোরকিশোরীর মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী বিভিন্ন। আমরা চাই আমার কিশোর ছেলের দেহ মাংসল হোক, শক্ত হোক, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সে সমানভাবে বেড়ে উঠুক, সমবয়সীদের ছাড়িয়ে যাক, শক্তিতে সে সংগীদের পরাভূত করুক। কিশোর সমাজের চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, দেহকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করতে সে নানা কসরত করে, এবং সুন্দর হবার চেয়ে শক্তদেহী হওয়া সে বেশি গৌরবের মনে করে। অন্যদিকে কিশোরী মেয়েটি আমার নরম হোক, সুন্দরী হোক, শক্তি নয়, শ্রী বাড়ুক, আমরাও চাই কিশোরীও চায়। কোনো কিশোরী যদি খাপছাড়া লম্বা বা ভারী হয়, আমরা খুশী হই না, সেও মনোক্ষুন্ন হয়ে সংগীসাথীদের এড়িয়ে চলে। শক্তিশালী কিশোরের বশ্যতা সকলে মেনে নেয়। কিন্তু শক্তিশালী শক্তদেহী কিশোরীকে সবাই যেন কৃপার চোখে দেখে। যারা আগে রজঃস্বলা হয়, তারা নিজেদের দলছাড়া ভাবার ফলে তাৎক্ষণিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার সমবয়সীরা যখন রজঃস্বলা হয়, তখন আবার তারা সহজে মেলামেশা করতে পারে এবং তাৎক্ষণিক সমস্যার অনেকটা উপশম ঘটে। অবশ্য এ নিয়ে সমীক্ষক-গবেষকদের মতভেদ আছে। আমরা আগে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মেয়েদের যে অসুবিধের কথা বললাম, সে অসুবিধে অভিভাবক ও সমবয়সীদের অভিমত। পরীক্ষার ফলের সংগে কিন্তু অভিভাবক ও সমবয়সীদের পর্যবেক্ষণজনিত অভিমতের মিল দেখতে পাননি সমীক্ষক। পরীক্ষকরা নিজেদের এই সমীক্ষার ওপর মন্তব্য করেছেন এই বলে যে এইসব পরীক্ষার ফল (Thematic Apperception Test—T. A. T) দেশকাল ও সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন হতে পারে।* যে সব ছেলেদের দেরীতে পরিণতি ঘটে, তাদের সংগে এক বিষয়ে মেয়েদের মিল আছে। দুদলেরই আত্মবিশ্বাস, অহংবোধ, নিজেদের সম্পর্কে ধারণা (selfconcept) সবই নীচুর দিকে**। তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে, শারীরিক বৃদ্ধি ও পরিণতির সংগে ব্যক্তিত্ব-

---

* Jones and Mussen, Self Conceptions, Motivations and Interpersonal attitudes of Early and Late Maturing Girls Ed I. gordon Human Development, Bombay, 1970, p 339

** Ibid

গঠন ও ব্যক্তিত্ববোধের এই সম্পর্ক কিশোরকিশোরীর শৈশবের ইতিহাস ও বর্তমানের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

কিশোরদের মূল্যবোধ ও মনোভাব নিয়ে অনেক সমীক্ষা হয়ে থাকে আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে। দেখা গেছে, কিশোরদের নিজের জগতে বা অপসংস্কৃতিতে (Peer subculture) বড়দের অনুকরণ করা হয় খুব কম। একটি সমীক্ষা থেকে জানতে পারা গেছে যে, প্রায় সব স্কুলের কিশোরদের মতে জেটবিমানের চালক অথবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বা জাতীয় সম্মান প্রাপ্ত খেলোয়াড় হওয়া তাদের কাছে একজন পরমাণু বিজ্ঞানী বা ধর্মযাজক হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কাম্য।*** আবার ছেলেমেয়েদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে কোন ধরনের কাজ করলে স্কুলের সকলে তাকে অনেকদিন মনে রাখবে উত্তরে অধিকাংশ কিশোর বলবে যে তারকাচিহ্নিত খেলোয়াড় হলে সকলে তাকে মানবে ও মনে রাখবে, আর কিশোরীদের উত্তরে শোনা যাবে দলের নেত্রী হলেই তার প্রতিপত্তি বাড়বে, তাকে ছাত্রছাত্রীরা স্মরণ করবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল করা অথবা জনপ্রিয় হওয়ার ইচ্ছে বেশির ভাগ কিশোরকিশোরীর নেই—সমীক্ষার ফল থেকে এটা বোঝা গেছে।**** অবশ্য সব দেশের কিশোরকিশোরীরা ঐ একই ধরনের ইচ্ছে পোষণ করে—একথা আমরা মনে করিনা, সমীক্ষকরাও তা বলেন নি। এই ধরনের প্রশ্ন যদি আমাদের দেশের কিশোরদের করা যায়, তাহলে তারা কি উত্তর দেবে? ঠিক বলা যায় না। মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করলে সম্ভবত উত্তর হবে প্রশ্নকর্তা প্রভাবিত, আর যদি প্রশ্ন লিখে পাঠানো হয়, নামধাম না জানিয়ে শুধু টিক্ দিয়ে উত্তর বাছাই করতে হয় তা হলে উত্তর হবে কিশোরদের খেয়াল খুশীমত। আমাদের ধারণা কিশোর যে-দিকে নিজের গুণপনা দেখিয়ে অন্যদের প্রশংসা পেয়েছে, উত্তরটা সেই দিকটাই দেখিয়ে দেবে। স্বাস্থ্য খারাপ, গায়ে জোর নেই, অথচ পরীক্ষায় ভাল করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে,—এই রকম কিশোর নিশ্চয়ই লেখাপড়ায় নাম করাই তার অভীপ্সা, এই কথা বলবে। আর খেলার মাঠে হাততালি কুড়িয়ে যে কিশোর তৃপ্তি পেয়েছে, তার পয়লা নম্বরের, পছন্দের তালিকায় স্থান হবে নিশ্চয়ই নাম করা খেলোয়াড়ের।

*** Coleman, Adolescent Culture, Ibid p 352

**** Ibid p 353

কোলম্যান* কিশোরদের ও কিশোরীদের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্ন রেখেছিলেন ঃ তোমার বয়সী ছেলেদের মেয়েদের জনপ্রিয় হতে গেলে কোন গুণ থাকা দরকার? অবশ্য সমীক্ষার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সম্ভাব্য উত্তরগুলোও তিনি সামনে দিয়েছিলেন। দেখা গেল কিশোরকিশোরীদের উত্তর বাছাই করার মধ্যে মিল আছে। নিজের শ্রেণীর (কিশোর ও কিশোরী বিভিন্ন শ্রেণীর বলে ধরে নিচ্ছি) মধ্যে জনপ্রিয়তা স্কুলে ভাল 'গ্রেড' পাওয়ার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু অপর শ্রেণীর কাছে (কিশোরীদের কাছে কিশোরের, কিশোরদের কাছে কিশোরীর) 'গ্রেড'-এর কোনো মূল্য নেই বলে রায় দিল অধিকাংশ কিশোরকিশোরী স্কুলের বাইরের কাজকর্ম এবং কোনো কিছু দেখাবার মত জিনিষ—ছেলেদের বেলায় নিজের গাড়ী, মেয়েদের বেলায় দামী ও সুন্দর পোষাক অন্য শ্রেণীর মন জয় করবার উপায় - এই অভিমত প্রকাশ করল প্রায় সব কিশোরকিশোরী। মেয়েরা তো তাদের পরীক্ষার ফলাফলের সংগে ছেলেদের আকৃষ্ট হবার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে একথা কল্পনাই করতে পারে না। অন্যের অঙ্গ সৌষ্ঠব ও দেহের শ্রী ছেলে মেয়ে দুজনকেই বিশেষ আকৃষ্ট করে। এখানে বড়দের সংগে তাদের মূল্যবোধের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের মেলামেশার সম্ভাবনা যেখানে বেশি, সেখানেই দেখা যায় শারীরিক সৌন্দর্য, গাড়ী, পোষাক ইত্যাদি (স্কুলের গ্রেড নয়) পারস্পরিক প্রীতি ও প্রশংসার প্রসার ঘটায়। প্রসংগত সমীক্ষক প্রশ্ন তুলেছেন যে, সহশিক্ষা (Co-education) ছেলে মেয়েদের উভয়ের পক্ষেই, লেখাপড়ার দিক থেকে না হোক,—সামাজিক দিক থেকে, ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেবার দিক থেকে প্রয়োজনীয়—এই প্রচলিত ধারণা আদৌ যুক্তিসংগত কিনা, আরো বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার। এমন কি, তিনি বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় তো নয়ই, বরং ক্ষতিকারক।

সৌন্দর্য ও পোষাক আষাক কৈশোরে যতই লোভনীয় মনে হোক না কেন, ভবিষ্যৎ জীবনে এর মূল্য খুব বেশি নয়, এমন কি 'রিসেপশনিষ্ট' বা 'সেক্রেটারী'রও শুধু রূপ ও হাবভাব থাকলে চলে না, তাঁকে কাজ কর্ম জানতেই হবে। অবশ্য অভিনেত্রী, নর্তকী জাতীয় কাজের পক্ষে রূপ অনেকদিন অবধি কাজে লাগে। সমীক্ষক এই মত প্রকাশ করে বলেছেন

---

* Ibid p 362.

কিশোরকিশোরীদের এই ধরনের মূল্যায়নের মধ্যে দোষের কিছু নেই বলেই মনে হয়েছে কোলম্যানের ; কেননা এই ধরনের মূল্যবোধ শুধু কিশোরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে* ।

আত্মকল্পনা (self concept) নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা, এবং আত্মসমর্থন বা স্বীকৃতি (self acceptance)—নিয়ে যে-সব সমীক্ষা হয়েছে, তা থেকে কোনো বিশেষ ফল পাওয়া গেছে বলে মনে হয় না ।

নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা ও নিজের কাছে নিজের স্বীকৃতি 'পীয়ার গ্রুপের' ধারণাকে প্রভাবিত করে কিনা—এ নিয়ে এক একজন এক এক রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন । কারুর মতে নিজের ধারণা আর অন্যের ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই, কারুর মতে নিজের সম্পর্কে যারা উঁচু ধারণা পোষণ করে তাদের অন্যের কাছে, বিশেষ করে সমবয়সীদের দলে কদর বাড়ে; আবার এও বলা হয়েছে নিজের সম্পর্কে নিজের খারাপ ধারণা জন্মালে অন্যের কাছে সেটা ধরা পড়ে এবং তারাও সেই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা যতই উঁচু হোক না কেন, তার দ্বারা সমবয়সীরা প্রভাবিত হয় না* ।

কিশোরদের আত্ম-পরিচয় (self identity)-এর ব্যাপার নিয়ে অনেক সময় উদ্বেগের সৃষ্টি হয় । আত্মবঞ্চনার মত ব্যাপারটি সমাজবিদ্যা ও মনের চিকিৎসা, দুই দিক দিয়েই আলোচিত হয়েছে । নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা পরিবর্তনের সংগে আন্তর প্রাতিস্বিক উপলব্ধির সম্পৃক্ত । নিজের কৃতকর্মের সংগে অন্যের কৃতকর্মের তুলনার ফলে কিশোর আত্মমূল্য নিরূপণ করে এবং প্রয়োজনমত নিজের সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন করে । প্রসংগত

---

* (1) Mc Inteyre, Acceptance by others and its relation to acceptance of self and others. J. of Ab. soc Psychol, 1952, 47.

(2) Miyamoto & Dornbusch ; A Test of Interoctionist hypotheses of Self Conception, American Journal of Sociology, 1956, 61.

(3) Marshall ; Variation in self attitude and attitude toward others as a function of Peer group appraisals Unpublished Doctoral Dessertation, University of Buffalo 1958.

বলা যায়, কিশোর মাত্রেই নিজেকে ও নিজের আশে পাশের সব কিছুকে জানতে চায়, সব কিছুর মধ্যে একটা পরস্পর সম্পর্কিত শৃংখলাবদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে কিশোর মনের ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসাজনিত অস্থিরতা দূর হয় না। বড়দেরও এই ধরনের প্রবণতা আছে ; নতুন কোনো ঘটনা বা তথ্য তার ধারণার বহির্ভূত হলে, সে নতুন তথ্যের একটা যেমন তেমন ব্যাখ্যা তৈরী করে ; বিজ্ঞানীরা এই প্রবণতাতাড়িত হয়েই নিত্য নতুন অনুসন্ধান চালাচ্ছেন, বিজ্ঞানে নতুন প্রকল্প গড়ে উঠছে। আদিম মানুষের কাছে তার নিজস্ব-পরিবেশ ও পরিবেশগত পরিবর্তনের নিজস্ব একটা তত্ত্ব বা প্রকল্প ছিল। জন্ম, মৃত্যু, বজ্রবিদ্যুৎ, ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা যতই ভ্রান্ত হোক—আদিম মানুষেরও প্রয়োজন ছিল **। তার মানে কিন্তু এই নয় যে মানুষ সব সময়েই যুক্তিবাদী বা যুক্তিনির্ভর থাকতে পারে। এই ব্যাপারে তার সমাজ ও সংস্কৃতির প্রচলিত মূল্যবোধ; নীতিবোধ প্রধানত তাকে চালনা করে। তবে মানুষের মধ্যে অনুসন্ধিৎসামূলক পরাবর্ত (Investigatory reflex) জন্মথেকেই সক্রিয়।

নিজের বিশেষ ক্ষমতার স্বীকৃতি কিশোর অন্যের কাছে আশা করে ; এবং অন্যের স্বীকৃতি বা প্রশংসা তাকে উদ্বুদ্ধ করে, ক্ষমতার প্রয়োগে সে আরো উৎসাহী হয়। প্রয়োগের ফলে ক্ষমতার উন্নতি ঘটে, আরো স্বীকৃতি বা প্রশংসা জোটে ; আরো প্রয়োগের উৎসাহ ও আত্মোন্নতি ঘটে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বা নিজের বিমূর্ত কোনো ধর্ম সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়ন, সমালোচনা বা স্বীকৃতির জন্যে কিশোর অন্যের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে চায় না, আর এ বিষয়ে সমবয়সীরাও আলোচনায় উৎসাহ দেখায় না। তাই কিশোর মাত্রেই সমবয়সীদের আচরণ পুংখানুপুংখরূপে অবলোকন করে, নিজের আচরণের সংগে তুলনামূলক বিচারবিশ্লেষণ করে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হবার চেষ্টা করে। এই প্রকল্প সব মনস্তাত্ত্বিক সঠিক বলে মনে করেন না। কোনো কোনো তাত্ত্বিক মনে করেন কিশোরের নিজের মূল্যায়ন সামাজিক চাপের ফল। সমাজে স্বীকৃত আচরণকেই কিশোর নিজের মূল্যায়ন বলে মনে করে। আবার অন্যান্যেরা মনে করেন যে কিশোর তার খুব কাছাকাছি অবস্থিত ব্যক্তিদের, বিচার ও মীমাংসাকেই স্বীকার করে নিয়ে থাকে ; সেই বিচার ঠিক বা বেঠিক তা নিয়ে মাথা ঘামায়না।

** (1) Festinger, Cognitive Dissonance ; Scientific American, 1962; 207.

ফেসটিন জার (*) কিন্তু মনে করেন, ব্যক্তি অন্যের মতামতের উপর নির্ভর না করে, নিজের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ, অবলোকন, প্রত্যক্ষণের সাহায্যে নিজের ব্যক্তিত্বের মূল্য নিরূপণে সক্ষম, এবং এ-বিষয়ে তার ভুলভ্রান্তিও কম ঘটে। একটি সমীক্ষা (**) ফেসটিন্‌জারের তত্ত্বকে সপ্রমাণ করেছে বলে দাবি করেছেন সমীক্ষক। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৭ জন আবাসিক ছাত্রদের নিয়ে সমীক্ষাটি চালানো হয়। কিছু ছাত্র, যারা বন্ধুদের মধ্যে নিজেদের তুলনায় বেশি সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখে নিজেদের ধারণা পরিবর্তন করেছে দেখা গেল এবং নিজেদের মধ্যে আরো সদ্‌গুণের বিকাশে আগ্রহী হয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে সদ্‌গুণের অভাব দেখলে বন্ধুত্বে চিড় ধরেছে; নিজেদের সংগে বন্ধুদের গুণসমাবেশের পার্থক্য কমিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করেছে ছেলেরা।

সমীক্ষকের দাবী মেনে নিলেও আমরা মনে করি না যে ফেসটিন্‌জারের তত্ত্ব এর দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে। কিশোররা শুধু একভাবেই ব্যক্তিত্ব গঠন করে বা নিজেকে নতুন গুণ নতুন ধর্ম আয়ত্তের চেষ্টা করে—এই সরলীকরণে আমরা বিশ্বাসী নই। শিক্ষা, নতুন ধর্ম বা গুণ আয়ত্তকরণও শিশুর ক্ষেত্রে যেমন নানাভাবে ঘটে, কিশোরদের ক্ষেত্রেও সেইভাবেই ঘটে। উদ্দীপকের সংগে সংক্রিয় সংযোগ ও নতুন ধর্মের বা গুণের উন্মেষ মানবশিশু ও কিশোরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাবে ঘটে। পরিবারে, বিদ্যায়তনে, আবাসিক বিদ্যালয়ের হস্টেলে, উদ্দীপকের উৎস বিভিন্ন; তাদের ক্রিয়াকলাপের ধরণও বিভিন্ন। শিশু বা কিশোরের মনোযোগ আকর্ষণ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা যে-উদ্দীপকের বেশি, সেই উদ্দীপক-সাপেক্ষ পরাবর্ত গঠিত হয়ে কিশোর নতুন ধর্মের অধিকারী হয়।

কৈশোর সেই অন্তবর্তী কাল, যখন মানবশিশু দায়িত্ব বহনের শক্তি ও দক্ষতা অর্জন করে বৃহত্তর সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই ভূমিকা শুধু পশুর মত পরিবেশের সংগে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখা নয়; তার কাজ প্রকৃতিকে, সামাজিক পরিবেশকে

---

* Festinger, A Theory of Social Comparison Process; Hum Relat, 1954, 7

** Kipnis, Changes in Self Concepts in Relation to Perception of others (Human Development, op. cit)

পরিবর্তিত করে, আরো বেশি বাসযোগ্য করা এবং সেই কাজের জন্য দক্ষতা অর্জন করা, যুক্তিবুদ্ধি বর্ধিত করা এবং প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজেকে সুস্থিত করা। এক কথায় কৈশোর পরিণতবুদ্ধি মানুষ হবার প্রস্তুতি পর্ব। অভ্যাস আয়ত্ত ও দক্ষতা অর্জনের কাল।

এই প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন উদ্দেশমূলক ঐচ্ছিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের অভ্যাস। বাইরের পরিবেশ ছাড়াও দেহের ভেতরের যন্ত্রপাতি—যা কৈশোরে ক্রম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে— উদ্দীপনা পাঠায় মস্তিষ্কের কাছে। কাজ করার সময় অঙ্গ-সঞ্চালনের ফলে পেশীর, হাড়, বন্ধনী ইত্যাদির সংকোচনজাত অনেকগুলো পরাবর্ত ক্রিয়ায় সমন্বিত হয়। একটা পরাবর্তের ফল অন্য একটি পরাবর্তের উদ্দীপক হয়ে পরবর্তী পরাবর্ত ক্রিয়াটি ঘটায়। অভ্যাসের ফলে, কাজ করাটা স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজ মনে হয়। এই সব কাজ করার সময় দেহের আন্তর যন্ত্র থেকেও সংবেদন উদ্দীপনা মস্তিষ্ক বল্কলে পৌঁছে থাকে। হাত পায়ের সদাগ পেশীর সঞ্চালনের সংগে আন্তরযন্ত্রের (পাকাশয়, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, ফুসফুস ইত্যাদি) ক্রিয়ার সংযোগ ঘটে, নতুন ও জটিল সমন্বিত ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হয় কিশোর। আগেই বলেছি একটি পরাবর্ত, পরবর্তী পরাবর্তের উদ্দীপকের কাজ করে। এই ফিড ব্যাক (Feed back) বা প্রতিবহনক্রিয়া (প্রতিটি অঙ্গ বা আন্তর-যন্ত্রের অদাগ পেশীর সংকোচনের খবর মস্তিষ্কের সংবেদক অঞ্চলে পাঠানো) বিচ্ছিন্ন পরাবর্তগুলোকে অবিচ্ছিন্ন, সুসমন্বিত সূক্ষ্ম জটিল ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে। বারবার এই একই সূক্ষ্ম কাজ অভ্যাস করার ফলে, সেই কাজে দক্ষতা অর্জন করে কিশোর। সুদক্ষ বেহালাবাদক, সুসম ভারতনাট্যমে পারদর্শী, উচ্চগণিতে পারঙ্গম—সকলেই কাজের অভ্যাসের ফলে দক্ষতা অর্জন করেছে। কৈশোরে সংবেদন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ঘন ঘন উদ্দীপনা মস্তিষ্কে নতুন গুণ ও ধর্মের সমাবেশ ঘটায়। প্রত্যক্ষণের বিকাশ ঘটতে থাকে শৈশব থেকেই, কৈশোর অন্তে প্রত্যক্ষণের ক্রমবিকাশের ফলে বহির্বিশ্ব, ও নিজের সম্পর্কে ধারণা ও চেতনা ক্রমশ স্পষ্ট ও বাস্তবানুগ হতে থাকে।

প্রত্যক্ষণ, ধারণা, চিন্তা, চেতনা কিশোরের কার্যকলাপ থেকে, বাইরের জগতের সংগে যোগাযোগ থেকে বিকশিত হয়; আবার চিন্তা, ধারণা, চেতনা কিশোরের কার্যকলাপ ও জীবনক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেঃ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। বাস্তবের

সংগে ঘাত প্রতিঘাতে, পরিবেশ পরিবর্তনে আর এক ধরনের মননক্রিয়া,—প্রক্ষোভের ভূমিকা ও প্রভাব সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবেশের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থেকে প্রক্ষোভের জন্ম। শিশুর সর্বাত্মক প্রক্ষোভ কৈশোরে ক্রমশ নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট হতে থাকে। কিশোর প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে বস্তুজগতের উপর ও নিজের ক্রিয়াকলাপের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আদিকৈশোর থেকেই সে প্রক্ষোভকে আলাদা আলাদা করে চিনতে শেখে, কোন উদ্দীপকে কি ধরনের প্রক্ষোভের সঞ্চার হয় বুঝতে শেখে। শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনের ফলে প্রক্ষোভ ক্রমশ সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ার ফলে সামান্য সামান্য যে সব উদ্দীপনায় ভয়, ক্রোধ বা আনন্দের অভিব্যক্তি হত, সেগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখে। ছোটবেলায় যে-সব ঘটনায় বিচলিত হয়ে প্রক্ষোভের তাড়নায় বুদ্ধিভ্রংশ ঘটত ও আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দিত, সে সব ঘটনাকে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। প্রক্ষোভ এবং বোধশক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত; প্রক্ষোভ ও ধারণা চেতনারই দুই পৃথক রূপ। প্রক্ষোভের প্রাথমিক কাজ ধারণায় প্রতিফলিত বস্তু বা ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয় ও ব্যক্তির পক্ষে তার মূল্য নিরূপণ। চেতনার প্রক্ষোভ অংশ কিশোরকে সচল করে, কাজে উদ্যোগী করে। বাস্তব সম্পর্কে ধারণা যত ঠিক হবে, বোধশক্তি যত পরিণত হবে, প্রক্ষোভিক সাড়া তত বেশি কাজের উপযোগী হবে। কৈশোরে এই প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ, প্রক্ষোভিক ক্রিয়াস্রোত ঠিক মত প্রবাহিত করার উপর নির্ভর করে কিশোর, তথা জাতির ভবিষ্যৎ। কৈশোর থেকে বোধ-শক্তি বৃদ্ধির দরুণ ধারণা বদলাতে থাকে; কিন্তু এই ধারণা বদলানো প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল ও নানারকমের বাধাবিঘ্ন-কণ্টকিত। বোধশক্তির বৃদ্ধি ধারণাকে পালটাচ্ছে। শৈশবের ভয়ের বস্তু, যথা নতুন মানুষ, অচেনা অদ্ভুত পোষাক পরা চেনা মানুষ, ভূতের গল্প, ডাকাতের গল্পের কল্পিত ভয়ের ছবি ও নায়ক নায়িকা অনুষঙ্গ কৈশোরের বোধশক্তি ও জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে এখন আর ভয় উদ্রেক করছেনা; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধি ধারণাশক্তিকে বাড়ানোর ফলে এই সব ভয়ের বস্তু বা ব্যক্তির সংগে অনুষংগিত নানা কল্পিত জিনিষে এখন হয়তো নতুন করে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবের প্রতিফলন আদি ও মধ্য কৈশোরে বাড়ে সত্যি, কিন্তু প্রতিফলন মানেই সঠিক প্রতিফলন নয়। তবে একথা ঠিকই যে বয়স যত বাড়বে, পরিবেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকলে মোটামুটি একটু সুস্থ ও অনেকাংশে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে। তবে অনু-

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, ঘটনা বা কল্পনা অনেক সময় সত্যিকারের প্রক্ষোভাশ্রিত না হয়েও ক্রোধ বা ভয়ের প্রক্ষোভের কারণ হতে পারে। বড়রাও যে ভুল ধারণা ও কল্পিত ভয়ের বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হলনা—এমন নয়। শৈশবের ভয় বা রাগের প্রকোপ কৈশোরে অনেকটা কমে। বোধশক্তি, জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি বাড়ার ফলে কিশোর মনের আঘাত ও ব্যর্থতার বেদনা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে বটে, কিন্তু জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি পরিণতি লাভ না করার ফলে, কিছু কিছু ভয় বা রাগ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। মিনির মত কাবুলিওয়ালা দেখলে সে ভয় পায়না বটে, কিন্তু নিজের আশা আকাংক্ষা পরিপূর্ণ না হবার ভয়, পরীক্ষার ভয়; নিজের 'পিয়র' গ্রুপের কাছে অপদস্থ হবার ভয়, এই জাতীয় অনেক নতুন ভয় অথবা উদ্বেগ তার মনে স্থান পায়।

এই সব নেতিবাচক প্রক্ষোভ ছাড়া আবার অন্যদিকে অনেক রকমের ইতিবাচক বা সদর্থক প্রক্ষোভ অনুভূত ও অভিব্যক্ত হবার ফলে কৈশোর উত্তেজনাপূর্ণ, আনন্দময়, উচ্ছল। নিজের নিজের গ্রুপের, নিজের পাড়ার, নিজের একাত্ম বন্ধুবান্ধব ও ক্লাবের, নিজের অঞ্চলের, নিজের ভাষা-ভাষীদের, নিজের দেশের সাফল্য বিফলতার সংগে কিশোর জড়িয়ে পড়ে: হর্ষ বিষাদের মধ্যে তার অবস্থান। সংখ্যায় অল্প হলেও, এদের মধ্যে কিছু এখন (অন্তকিশোরদের কথা বলছি) অন্যায় অবিচার নিয়ে ভাবতে থাকে। সামাজিক বৈষম্য নিরসনে তাদের একটা ভূমিকা, একটা দায়িত্ব আছে মনে করে—এ নিয়ে তাদের চিন্তা, ভাবনা, বোধশক্তি তাদের এই সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রভাবিত করে, সামাজিক ও রাজনীতি সংক্রান্ত দুর্নীতি তাদের ক্ষুব্ধ করে, তাদের সক্রিয় করে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা, নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তার থেকে এই সব চিন্তাই এবং এই সংক্রান্ত প্রক্ষোভ তাদের উদ্বেল করে, অস্থির করে। তাদের বোধশক্তি আরো বাড়ে, বাইরের জগতের হাতছানি 'দুর্গমগিরির কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার'-এর দিকে তাদের আকৃষ্ট করে। আমাদের কালের কিছু কিশোর যেমন পরাধীনতার গ্লানি ও অপমানের জ্বালায়, শাসককুলের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধের আগুনে নিজেকে আহুতি দিত: আজকের কিছু কিশোরকিশোরীরাও তেমনি পৃথিবীকে দুর্নীতিমুক্ত করতে, সমাজবৈষম্য দূর করতে, ক্রোধ ও ঘৃণায় অস্থির, জীবন বিসর্জনে আগুয়ান। ক্রোধ ঘৃণা ভয়—নেতিবাচক প্রক্ষোভ বলে চিহ্নিত হলেও, আত্মরক্ষা ও প্রজাতিরক্ষায় এদের ভূমিকাই মুখ্য, এরা সময়বিশেষে ইতিবাচক, পজিটিভ।

বোধশক্তি, ধারণা বৃদ্ধি; ভয়, ক্রোধ ঘৃণার মত প্রক্ষোভের হ্রাস, বৃদ্ধি, বিকাশ সব ক্ষেত্রেই পরিবেশ-প্রভাবিত। প্রক্ষোভ উদ্রেককারী উদ্দীপকের প্রকৃতি ও পরিবেশ ও শিক্ষাসাপেক্ষ। কথাটা অবশ্য সঠিক হল না। একই পরিবেশে থাকলেই একই ধরণের মানসিকতা, ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, ক্রোধ, ঘৃণা এবং ভালবাসা, সহানুভূতি গড়ে উঠবে না—এসম্পর্কে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। গ্রহীতার পূর্বশিক্ষা, বোধশক্তি ও ধারণার স্তর, এবং গ্রহীতার সেই সময়কার মানসিকতার উপর নির্ভর করবে পরিবেশের কোন উদ্দীপক কার্যকর হবে। সেই জন্যই একই সমাজে, অনেক সময়ে একই পরিবেশে লালিত কিশোরদের মধ্যে আমরা একই সময়ে অনুগামী, বিদ্রোহী: শিষ্ট, অশিষ্ট; গোঁড়া ও প্রগতিবাদী; দুষ্কৃত-কারী; সৎ; পরস্বাপহারী ও সর্বত্যাগী; আত্মকেন্দ্রিক ও পরার্থবাদীর সাক্ষাৎ পাই। পরিবেশে একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান, সংস্থাও ব্যক্তি থাকে আর থাকে নানা ধরনের ধ্যানধারণার সমর্থক ও প্রতিবাদক। বিভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের ভিড় সব দেশেই সব সময়ে আছে। তাই কিশোরদের নানাভাবে প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা। এ-ছাড়া বস্তুবাদে বিশ্বাসী মনস্তাত্ত্বিকের মতে পাভলভ-বর্ণিত মস্তিষ্কের টাইপের ওপরও কিছুটা নির্ভর করে, কিশোর কোন ধরনের উদ্দীপককে গ্রহণ করবে, কোনটাকে বর্জন করবে। তবে মোটামুটি একথা বলা যায় যে প্রক্ষোভ উৎপাদক বস্তু সম্পর্কে কিশোরের যত ধারণা ও জ্ঞান বাড়বে, প্রতিক্রিয়া ততই বাস্তবানুগ ও গঠনধর্মী হবে। ধারণা ও প্রক্ষোভ, দুইই মানুষের চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ *। তবে কিশোরের বেলায় প্রক্ষোভের শক্তি ধারণাশক্তির চেয়ে বেশি থাকে, ধারণা ও বোধশক্তি বাড়ার ফলে প্রক্ষোভ ক্রমশ নিয়ন্ত্রণসাধ্য, আয়ত্তাধীন হয়। প্রক্ষোভাধীন না হয়ে কিশোরই হোক আর বয়স্কই হোক, কোনো মহৎকাজে সমর্পিতপ্রাণ হতে পারেনা, আবার এত সাজিয়ে অতিমাত্রায় প্রক্ষোভাধীন হয়েই সে হঠকারী ধ্বংসাত্মক কাজে

* The more limited his knowledge of these, the less appropriate and more panicky will be his emotional response and the more he knows, the more appropriate and stable his reactions. Thus in human beings are two indispensable and inseparable aspects of the reflection of reality in consciousness (Wells, H K., I. P. Pavlov, International Publishers, 1958, p. 154)

প্রবৃত্ত হয়। যত বয়স বাড়ে, প্রক্ষোভের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ে ; প্রৌঢ় বয়স থেকে প্রক্ষোভের মাত্রা কমতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে খুব কম লোকই শোক দুঃখ বা ক্রোধে অভিভূত হয়। যদিও আমরা জানি পঞ্চাশের পর থেকে নিস্তেজনাকর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (inhibition) কমতে থাকে ; তবুও খুব কম সুস্থ বৃদ্ধকেই ক্রোধে বা আনন্দে আত্মহারা হতে আত্মীয় বিয়োগে অধীর হতে দেখি। মস্তিষ্ক কোষ অনড় হয়ে যায়, নমনীয়তা থাকেনা বলে এই রকম ঘটে। প্রক্ষোভ যখন প্রচন্ড হয়ে তুঙ্গে অবস্থিত, তখন আমরা তাকে বলি প্যাশ্যান ; 'প্যাশান' টাইফুন টর্ণাডোর মত শক্তি ধরে। সুখের বিষয় 'প্যাশান' প্রায়শই স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। অন্তকিশোর ও তরুণদের মধ্যে 'প্যাশানের' প্রকাশ দেখা যায় ; তরুণদের মধ্যেই বেশি, কিশোরদের মধ্যে কম। প্রক্ষোভের মৃদুতম অথচ দীর্ঘস্থায়ী প্রকাশকে 'মুড' বলে। এই 'মুড' বা মেজাজের পরিবর্তন কিশোরদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।

একজন সোভিয়েট বিজ্ঞানী মস্তিষ্কের ব্যক্তিজনিক (ontogenic) ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে সম্প্রতি বলেছেন যে, এই বিকাশ ঠিক কালক্রম বা বয়ঃক্রমানুযায়ী ও সমমাত্রিক নয়। মস্তিষ্কে নতুন গুণের সমাবেশ কোনো নির্দিষ্ট গতিতে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘটে না। কিছুদিন হয়তো ক্রমোন্নয়নের কাজ থেমে থাকে; আবার হয়তো অতিদ্রুত এক সংগে অনেকগুলো ক্ষমতা বিকশিত হতে দেখা যায় শিশুর মধ্যে। মোট কথা, উন্নতি বা ক্রমবিকাশ অব্যাহত ধারায় ঘটে না; কোনো সময়ে মনে হয়, গতিধারা থমকে দাঁড়িয়েছে ; যেন কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য থামতে হয়েছে। আবার এক সময় দেখা গেল বিকাশের ধারায় যেন জোয়ার লেগেছে, তরতর করে এগিয়ে চলেছে ক্রমোন্নয়নের স্রোত। আবার স্তব্ধতা, স্তব্ধতাতে ফের দুরন্ত গতি, কোনো কোনো ক্ষমতা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, তার বদলে আর একটার উন্মেষ হল। মস্তিষ্কের ক্রমোন্নয়নের এই অর্কেস্ট্রা সংগীত সৃষ্টি করে দিয়েছে প্রকৃতি; আর বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মস্তিষ্ক ক্রিয়াসম্পাদনের ভার অর্পিত হয়েছে আলাদা আলাদা যন্ত্রবাদকের ওপর*।

---

* The brain's development progresses intermittently – in other words, it is not an uninterrupted ascending process, but one subjcet to intermittent intermissions and leaps. Some functions fade and it is substituted by others. At different stages different functions may act as "soloists" in the "orchestra" of the brain activity, playing to the music composed by nature. But some times they start playing before their time, in which case the solo becomes specially noticeable. This is how the well known phenomenon of child prodigy appears (Levon Badalyan, Moscow News, No. p. 121, 1982)

কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় একজন বাদক নির্ধারিত সময়ের আগেই তার যন্ত্রে ঝংকার তুলেছে এবং সেটা অন্যদের সংগে সমন্বিত না হবার ফলে শ্রোতাদের কোনে বেসুরো ঠেকছে; অর্কেস্ট্রার ঐক্যতানের সংগে সংগতি হীন এই খাপ ছাড়া ব্যাপারটা আমাদের নজরে পড়লে আমরা বলি শিশু বা কিশোর প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেছে। সংগীতে, গণিতে, দাবা খেলায়, ছবি আঁকায় কিশোর প্রতিভার সন্ধান পেলে আমরা চমকে উঠি। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাধরকে নিয়ে অনেক রহস্য ও অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি করি। এই সময়ের আগে কোনে বিশেষ ক্ষমতার বিকাশের মধ্যে অপ্রাকৃত বা অলৌকিকতার কিছু নেই বলেছেন লেভন বাদালাইয়ান। তিনি সোভিয়েট এ্যাকাডেমি অব্ মেডিকেল সায়েন্সের একজন সদস্য ; একজন প্রখ্যাত স্নায়ু-তত্ত্ববিশারদ। মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ যখন ঠিক মত বেড়ে ওঠে, তাদের গুণ ও ধর্ম যখন বিকশিত হয়, তখন আর এই কিশোরকে নিয়ে আর কেউ হৈ চৈ করে না। গতকালের অসামান্য কিশোর প্রতিভা সাধারণের পর্যায়ে নেমে এসেছে মনে হয়। তিনি মনে করেন, ঠিক মত ব্যবস্থা করলে কিন্তু এদের অনেকেরই এই প্রতিভার অকাল মৃত্যু রোধ করা যায়।

উৎস

(1) Jones and Mussen, Self conception. motivation and Interpersonal attitudes of early and late maturing girl, ed. I Gordon, Human Development, Bombay. 1970.

(2) Colenae, J.S.— 'Adolescent culture' Human Development Bombay, 1970.

(3) Mc Intyre, Acceptance by others and its relation to acceptance of self and others, J. of Ab, Soc, psycho. 1952.

(4) Miyamoto and Dombusch, A Text of Interactoinist hypothe of self conception, American Journal of sociology 1956 ; P 6

(5) Marshall, Varition as self attitude and attitude to others as a fnr.ction of peer group appraisals, Unpublished doctoral dessertation, University Buffolo 1958.

(6) Festinger, Cognitive dissonance, scientific American, 1962, 207.

(7) Festinger, A Theory of social comparison process Hum Relat, 1954,7.

(8) Kipnis, Changes in self concepts in relation to perception of others (Human Development, op. cit)

(9) Well, H. K., I. P. Pavlov. International Publisher, NY. 1958

(10) Bodalyan Levon, Moscow News, No. 121, 1982.

সারাংশ

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। উদ্দেশ্য পরিবারের বাইরের সমাজের সঙ্গে সংযুক্তি ও মানিয়ে নেওয়া। শৈশবের চাপা উত্তেজনা ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে থাকে। মস্তিষ্ক নতুন নতুন সংগঠিত পরাবর্তের সাহায্যে নিজেকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করতে থাকে। নিজের সম্বন্ধে ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে তার অনিশ্চয়তা দূর হয়। কিশোর, মূল্য ও বিশ্বাসের প্রণালীবদ্ধ এক নিয়মের জগতের সন্ধান পায়।

দৈর্ঘ্য ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে কিশোর-কিশোরী এবং তার পরিবারের চাহিদা আলাদা হবে—এটাই স্বাভাবিক। রূপকথার জগতের অধিবাসী এখন কিশোর-কিশোরী। নিজের শক্তি বা শ্রীর ঘাটতি দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করে। এই সময় কিশোর-কিশোরীরা ঘনঘন আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখে এবং নিজেকে ভালবাসতে থাকে। আবার দেহের কোন অঙ্গের ত্রুটী থাকলে এবং সেই ত্রুটী নিয়ে

টিটকিরি শুনলে কিছু কিছু কিশোর কিশোরীদের মানসিক অস্থিরতা বা বিষণ্নতা দেখা দিতে পারে। জনপ্রিয় হবার আগ্রহ এই বয়সে সব ছেলে-মেয়েদেরই পক্ষে স্বাভাবিক। দেশকালভেদে জনপ্রিয়তার প্রতীক বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এই বয়সে যে-গুণের জন্য ছেলেমেয়েরা প্রশংসা পায়, সেই গুণটিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে।

সমবয়সীদের কাছে সমাদৃত হবার জন্য সকলেই আগ্রহী। এদের নিজেদের একটা 'কালচার' গড়ে ওঠে (peer culture) যার সঙ্গে বড়দের 'কালচার' এর কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

প্রত্যক্ষণ, ধারণা, চিন্তা-চেতনা কিশোরের কার্যকলাপ ও বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বিকশিত হয়; আবার চিন্তা-ভাবনা, চেতনা, ধারণা কিশোরের ক্রিয়াকলাপ ও জীবনক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

কিশোর প্রতিভা সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন :

(1) কৈশোরের শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ও মানসিক পরিবর্তন কিশোরের পারিবারিক গণ্ডীর বাইরের সমাজের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা ও মানিয়ে নেওয়ার পক্ষে দরকারি। এ-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(2) কিশোর ও কিশোরীর চাহিদার পার্থক্যের সঙ্গে সামাজিক চাহিদার সম্পর্কের বিবরণ দাও।

(3) চেতনার প্রক্ষোভ-অংশ কিশোরকে সচল করে সক্রিয় করে,– উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ ও স্বভাবী

কৈশোরে, আদি থেকে অন্তপর্বের আরম্ভ পর্যন্ত, শারীরবৃত্তিক ও মানসিক পরিবর্তন দ্রুততালে ঘটতে থাকে। পরিবারে, বিদ্যালয়ে, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজের মানিয়ে নেবার সমস্যা প্রায় সব কিশোরকেই কমবেশি বিচলিত করে। এই সব সমস্যার অনেকগুলোই সাধারণ এবং ছোটখাটো—বলা চলে স্বাভাবিক। কিছু সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে, যদি ঠিক সময়ে ঠিকমত সমাধানের চেষ্টা না করা হয়। সেই সব সাধারণ সমস্যার আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হবে। বড়দরের অসাধারণ ও অস্বাভাবিক সমস্যার আলোচনা অন্যত্র করব। প্রথমে সমবয়সীদের সংগে মেশার ও মানিয়ে নেবার সমস্যার কথা বলা যাক।

উপনাম সমস্যা : দেহের বৃদ্ধির জাতিগত ও দেশগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকে। এই ব্যক্তিগত পার্থক্য-দৈর্ঘ্য ও ওজন বৃদ্ধির আধিক্য বা সল্পতা—অনেক ক্ষেত্রে কিশোর মনে আলোড়ন আনতে পারে। বারো বছরের ছেলের দৈর্ঘ্য ষোলো বছরের মত হতে পারে, আবার সাত বছরের ছেলের থেকে বেশি নাও হতে পারে। ওজনের ক্ষেত্রেও এই একই স্বাভাবিক ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা যায়। দৈর্ঘ্য ও ওজনের তারতম্যের জন্য সমবয়সীদের দলে কোনো কোনো ছেলেকে বেঁটে, 'লম্বু', 'মোটকা', শুঁটকী' ইত্যাদি উপ-নাম দেওয়া হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দলগত শৃংখলা বজায় রাখার জন্য কিশোর কিশোরী—দৈর্ঘ্য ও ওজন সম্পর্কিত এই উপনামকে অবজ্ঞাসূচক মনে না করে কৌতুকজনক বলে মেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোনো

কোনো ক্ষেত্রে উপনাম-বিভ্রাট ঘটে। অবজ্ঞাসূচক মনে না করলেও, নিজেকে দলের অন্যদের চেয়ে হীন মনে হতে পারে– এবং তার ফলে সমস্যার উদয় হতে পারে। এই রকম সমস্যার সমাধানে অনেক সময় শিক্ষক বা চিকিৎসকের সাহায্য চাওয়া হয়। মনে রাখা দরকার, কিশোর-কিশোরী তার আংগিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অল্পাধিক সচেতন ও কৌতূহলী। অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য প্রশংসিত হলে, কৌতুক বা অবজ্ঞাসূচক উপনাম শুনতে থাকলে, সুদেহী হবার জন্য শরীরচর্চা শুরু করলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে নজর বেশি করে পড়ে। কিশোরকিশোরী একলা থাকলে বা সুযোগ পেলেই দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকে। যারা অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য প্রশংসিত, তারা এই দেখার ফলে তৃপ্তি লাভ করে, আর যারা উপনাম-উৎপীড়িত, তারা স্বভাবতই দুঃখ বোধ করে। রূপকথায় রূপবান বা রূপবতী হবার কাহিনীগুলোর কথা ভাবে এবং দিবা-স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নিজেকে রূপান্তরিত করে সাময়িকভাবে দুঃখবেদনা দূর করে। এই রকম সমস্যার সম্মুখীন যারা হয় তারা অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিকরা নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি এই অতি আকর্ষণকে 'নার্সিজম্' (narcissim) এর নিদর্শন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে এই 'নার্সিসিষ্টিক' বা 'আত্মরতি' পর্ব অতিক্রম সব কিশোর কিশোরীকেই করতে হয়। এই ধরনের শারীরিক বৈশিষ্ট্য যার ফলে উপনামের উপদ্রব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার কিশোরকে ক্ষতিপূরণমূলক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এ্যাড্‌লার পন্থীদের মতে 'অরগ্যানিক্ ইন্‌ফিরিওরিটি' বা শারীরিক ত্রুটীর দরুণ ব্যক্তি সব সময়েই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে ও মনের দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়। শুধু শারীরিক নয়, মানসিক, ও অন্যান্য ত্রুটীও এইভাবে কিশোরকে ক্ষতিপূরণে সচেষ্ট করে। (op cit, Adler Alexandra, The concept of compensation and over compensation in Alfred Adlers and Kurt Goldsteins theories, J of Individual Psychology 15 ; 79 ; 1959)। এই ধরনের প্রচেষ্টা ছাড়াই যারা অন্যদিকে নিজেদের প্রাধান্য সম্পর্কে সচেতন, তারা 'উপনাম'কে অনায়াসে অবহেলা করতে পারে। আমার এক বন্ধুর বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে, মামার বাড়ী কোলকাতায়। আদি কৈশোরে দেশ থেকে এসে কোলকাতার স্কুলে ভরতি হয় ও মামাবাড়ীতে আশ্রয় লাভ করে। মামার বাড়ীতে সমবয়সীরা এবং দুচারজন বয়স্ক ব্যক্তিও তাকে 'বাঙাল' উপনামে ভূষিত করেন ; স্কুলেও

সে বাঙাল বলে অবজ্ঞার না হোক কৌতূলের পাত্র ছিল। ষাট বছর আগের কথা, তখন কোলকাতার স্কুলে নীচু ক্লাসে পূর্ববঙ্গের ছেলে খুব কম ছিল; তার ক্লাসে যে ছিল না তার মনে আছে। বাবা চাকরীসূত্রে বিহারে থাকতেন। এখানকার উপনাম ও উপহাস তাকে বিশেষভাবে বিচলিত করে; সে বাবার কাছে চিঠি লিখে সে কথা জানায়; মামাবাড়ী থাকবে না বলে ঠিক করে। বাবা ও মা পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাকে উৎসাহিত করে চিঠি লেখেন। পড়াশুনায় খুব আগ্রহ ছিল না আগে। বাবার চিঠি পেয়ে সে বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়ে পড়তে লাগল; পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করে সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার পর উপনামের উপদ্রব কমে গেল। বলা উচিত, উপনামকে অগ্রাহ্য করার মানসিকতা গঠিত হবার ফলে উপনাম আর বন্ধুর কাছে অবজ্ঞাসূচক মনে হয়নি। এই ধরনের সমস্যা সমাধানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হন কিশোরের অভিভাবক। "ছেলে স্কুলে যেতে চায়না, পাড়ার বন্ধুদের এড়িয়ে চলছে, ঘরে বসে কি যেন ভাবছে—পরীক্ষার ফল এবার খুবই খারাপ হয়েছে"—এই রকম বিবরণ শুনলে তরুণ চিকিৎসকরা অনেক সময় স্কিজোফ্রেনিয়া জাতীয় মনের অসুখ ভেবে বসতে পারেন। অনেকদিন ওষুধ খাবার পর ফল না হওয়ায় চিকিৎসক বদল করার পর হয়তো বোঝা গেল যে উপনামের উপদ্রবে লাজুক ছেলেটি স্কুলে যাচ্ছেনা, পাড়ার ছেলেদেরও এড়িয়ে চলছে। তের বছরে স্কুল বদল করে– ছোট শহর থেকে নতুন বড় শহরে আসতে হয়েছে। ছোটবেলায় অস্ত্রোপচারের ফলে একটা পা একটু ছোট হওয়ার দরুণ একটু খুঁড়িয়ে চলতো ছেলেটি; তা ছাড়া সামান্য তোতলামিও ছিল। আগের স্কুলের ও পাড়ার ছেলেরা সব কিছু জানতো, সেখানে সকলেই তার বাড়ীর লোকদের চিনতো, ছেলেটিকে ভালবাসতো। নতুন স্কুলের ও পাড়ার ছেলেরা প্রথম দিন ভাব করতে গিয়ে দেখল ছেলেটি কথার উত্তর দিতে খুব দেরী করছে বা কথা বলেই থামছে। তার তোতলামি নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা শুরু করলো সেইদিনই; আর তার নাম দিল 'তোত্‌লা তৈমুর'। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তার তোতলামীর দরুণ কথা বলার অনিচ্ছাকে জয় করে, সবটা জানতে প্রায় তিন চারদিন সময় লাগল। তারপর তার স্কুলের কয়েকটি ছেলেকে (যারা পাড়ায় থাকতো,) তাদের বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে তার কাকা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তৈমুর লং-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা প্রসংগে তাদের আচরণ সম্পর্কে তাদের

সজাগ করে দিল। তারা ওর ছোটবেলার অস্ত্রোপচারের কথা শুনে ওর খুঁড়িয়ে চলা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য বিশেষ লজ্জিত হল। ওরাই পরদিন থেকে ওকে বাড়ী থেকে ডেকে খেলার মাঠে নিয়ে যেতে লাগল। ছেলেটির স্কুলে যাওয়ার ভয় ক্রমশ দূর, হল পড়াশুনোয় মন বসল, ভাল করে পাশ করে ক্লাসে উঠল। তোতলামিও অনেকটা কমে গেল। কোনো ওষুধ ছাড়াই তার তথাকথিত স্কিজোফ্রেনিয়ার উপসর্গ পুরোপুরি দূর হয়ে গেল।

দলানুগত্য সমস্যা ঃ দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সব কিশোরদের মধ্যেই দেখা যায়। দলে যদি দুষ্ট বা বে-পরোয়া ছেলে থাকে, সেই সাধারণত নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করে। বুদ্ধি প্রয়োগে নেতৃত্ব ভার গ্রহণ আদিকৈশোরে কমই ঘটে। দেখা গেছে যে, শান্ত পারিবারিক পরিবেশে নিয়মশৃংখলা বিধিনিষেধের মধ্যে বেড়ে ওঠা কিশোর দুরন্ত, দুঃসাহসী, দুষ্ক্রিয়তাপ্রিয় নেতার নির্দেশ নির্বিচারে পালন করে। এর ফলে অনেক সময় এমন সব কাজ করে বসে থাকে যাকে রীতিমত অসামাজিক বলা যায়। ফলে পরিবারে সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে এবং চিকিৎসককে সেই সমস্যা মেটাতে অভিভাবকদের সাহায্য করতে হয়। এই রকম একটি ছেলের সমস্যা নিয়ে তার মা একদিন চিকিৎসকের কাছে এলেন। বছর পনেরো বয়স, ইংরিজি মিডিয়াম স্কুলের উচু ক্লাসে পড়ে। পরীক্ষায় প্রতিবছরই ভাল ফল করে এসেছে। মা একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, এক সমাজসেবক সংস্থার অবৈতনিক সম্পাদক। বাবা মাঝারী গোছের একজন এক্‌জিকিউটিভ, দক্ষিণ কোলকাতায় যে-সব নতুন পল্লী গড়ে উঠেছে, তারই একটিতে, বছর তিনেক হল বাড়ী তৈরী করেছেন। প্রথমেই ভদ্রমহিলা বললেন ঃ ছেলে গোল্লায় গেছে, চুরি করতে শিখেছে, মায়ের সোনার গহনা চুরি করেছে। পরে বিস্তারিত বৃত্তান্ত দিলেন। তাঁর ছেলে পাড়ার কয়েকটি বখা ছেলেদের সংগে মিশছিল ; তাদের একজন বয়সে ওঁর ছেলের থেকে কিছু বড় ; সেই ওকে দিয়ে মায়ের গহনা চুরি করিয়েছে। তাঁর ধারণা বখা ছেলেটির দিদিই তাঁর ছেলেকে প্ররোচিত করেছে। ওঁর ছেলে গহনা চুরির কথা স্বীকার করেছে। তবে ব্যাপারটার মধ্যে বন্ধু বান্ধবীকে টানতে চাইছে না। ছেলেটির সংগে কিছুক্ষণ কথা বলার পর বুঝলাম মায়ের সন্দেহ ঠিক নয়—যৌন আকর্ষণের জন্য সে চুরি করেনি ; সে চুরি করেছে বাহাদুরির মোহে। দলপতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন শুধু নয়, অন্য ছেলেদের থেকে তার সাহস

বেশি—সেইটে দেখাবার জন্য, দলপতির ও দলের প্রতি দরদ প্রদর্শনের জন্য। এই ধরনের সমস্যা খুব বড় রকমের কিছু নয়, সেটা বোঝা গেল কিছু দিনের মধ্যে। ভদ্রমহিলার এক আত্মীয় পুলিশ অফিসার দলপতিকে ভয় দেখাতে সে সব স্বীকার করল। ছেলেটিকে কয়েকদিনের জন্য বাইরে পাঠানো হল। যখন ফিরল তখন এ দল ভেঙ্গে গেছে; দলপতি অন্য পাড়ায় গিয়ে দল গড়েছে। ছেলেটি আবার মন দিয়ে পড়াশুনো করতে লাগল। দলের সভ্য হয়ে সে অনেকদিন স্কুলে যাবার নাম করে দলের সংগে আড্ডা দিয়েছে, রেষ্টুরেন্টে খেয়েছে, দলপতির আদেশ তামিল করেছে। বছর দুয়েক পরে ভদ্রমহিলা অন্য কাজে এসে জানিয়ে ছিলেন যে ছেলে মাধ্যমিকে ভাল ফল করেছে। এখানে একমাত্র সন্তানের প্রতি পিতামাতা অতিরিক্ত ভালবাসা দেখিয়েছেন বা অন্য ভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলা চলে না।

এই সব দল অন্য দেশে কিছুটা সময়ের পর দুর্বৃত্তের দলে (gang) পরিণত হয়ে থাকে। জন হপকিন্স্ ইউনিভারসিটির এক অধ্যাপক লিখেছেন যে তের চোদ্দ বছরে পৌঁছুলে লেখাপড়ায় যারা ভাল তারা দল থেকে বেরিয়ে যায়। অল্পবুদ্ধির ছেলেরাই শুধু দলে থাকে এবং তারা দল বেঁধে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়। এই সব ক্রিয়াকলাপের মাদকতা এত বেশি যে অন্য পাড়া থেকে ছেলেমেয়েরা এসে দলের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে। এদের পরস্পরের মধ্যে খুব বেশি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দু' একজন লেখাপড়ায় ভাল ছেলেও মধ্যে মধ্যে দলের মোহে লেখাপড়ার ক্ষতি করে দলে মিশে আড্ডা দেবার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। মাতাপিতার দুশ্চিন্তার অন্ত থাকেনা (Stephans, Educational Psychology, New York, 1964, p. 556)। আমাদের দেশেও আজকাল এই রকমের 'গ্যাং' তৈরী হচ্ছে। উত্তর কলকাতার এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে এই রকম 'গ্যাং' এর প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণের এক নাম করা আবাসিক বিদ্যালয়ে ভরতি করে দিয়েও ছেলেকে মোহমুক্ত করতে পারলেন না। ছেলে দু' একদিন হষ্টেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর পেটের গোলমাল ও নানা রকমের রোগ উপসর্গে ভুগতে লাগল। কর্তৃপক্ষ ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার নির্দেশ দিলেন। আবার সেই পুরনো স্কুল। কয়েকদিন বাবার কড়া নজরে থেকে নিয়মমত স্কুলে যেতে লাগলো। কিছুদিন পরে আবার সেই স্কুল পালানো এবং আড্ডা শুরু হল। এর যে কোনো প্রতিকার আছে ছেলেটির

বাবার তা জানা ছিল না। তাঁর মেয়ের হিস্টিরিয়ার চিকিৎসার পর চিকিৎসকের কাছে তিনি পুত্রের সমস্যার কথা তুললেন। চিকিৎসায় ফল পাওয়া গেল, ছেলেটি এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দিয়েছে।

এতক্ষণ যে কয়েকটি কিশোরের কথা বলা হল, তারা সকলেই সুস্থ পরিবারে পালিত। মা বাবার কাছ থেকে আদর্শ আচরণ না শিখলেও; অস্বভাবী আচরণ বা অস্বাস্থ্যকর আচরণ শেখবার দুর্ভাগ্য হয়নি। এই সব দল দুর্বৃত্তের দলে পরিণত হয় বলেছেন অধ্যাপক ষ্টিভেন্স, আবার সংগে সংগে এও বলেছেন এই ধরনের দুর্বৃত্ত-গ্যাং-এর সংখ্যা খুবই কম। মধ্য কিশোর ও অন্তকিশোররা দলবদ্ধ হয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একসংগে খেলা দেখে, রেডিও শোনে, রেষ্টুরেন্টে বসে আড্ডা দেয়, চলচ্চিত্র, খেলা বা সদ্যপ্রকাশিত কোনো বই নিয়ে আলোচনা করে। তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ধ্বংসপ্রবণতা খুব কমই প্রকাশ পায়। ছোট পার্কে, কোনো বাড়ীর রকে, কারুর বৈঠকখানার ঘরে এরা নিয়মিত মিলবেই এমনি টান জন্মায় পরস্পরের প্রতি এবং দলের প্রতি। (**Ibid**) সেই সময় ভুল করে কোনো অভিভাবক কোনো কিশোরকে এই পারস্পরিক দেখাশোনা কথাবার্তার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি করেন। ছেলে কেন একটা পরীক্ষাতে খারাপ করল, অথবা কোনো প্রতিবেশীর কাছে ছেলের নিন্দা শুনলেন, অমনি অভিভাবক মনে করলেন দলে মিশে ছেলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ছেলেকে নিয়ে হয়তো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয় অথবা ছেলের দুর্বিনীত ব্যবহারের এবং বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য তার সংগে সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে যায়। দেখা গেছে, যে সব পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের ভাল ভাবে মানুষ করে তোলবার জন্য অনেক বই পত্তরও ঘাঁটা-ঘাটি করেন, তাঁরাই অতি-সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে বেশি ভুল করে বসেন। সমবয়সীদের সংগে মেলামেশা না করলে ছেলেদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক থাকেনা, আবার অভিভাবকদের কুসংসর্গে পড়ে যাবার ভয়কেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম বা নির্দিষ্ট কোনো ফরমুলা এবিষয়ে আছে বলে মনে হয় না। কিশোরের ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণ বাধা না পায় আবার তার নিরাপত্তাবোধের অভাব না ঘটে এই দিকে মাতাপিতা দৃষ্টি রেখে নিজেদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করলে ভাল ফল পাবেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা মনস্তত্ত্বের বই পড়লে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাই বেশি।

পারিবারিক সমস্যা ঃ পরিবার, বিশেষ করে মাতাপিতার সংগে মানিয়ে নেবার ব্যাপারে কিশোর মনে নানা রকমের বিশৃংখলা ঘটতে পারে এবং সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এখানে কিশোর ও কিশোরীদের মানসিকতা ও মেজাজের পার্থক্য নিয়ে কিছু বলা দরকার। কিশোররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিশোরীদের তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ও প্রকাশ্যে মনোভাব বিশেষ করে ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে। খেলা-ধুলোতে ও মতবিরোধে দলবদ্ধভাবে অথবা একাকী তারা মারামারি করে। এইভাবে ক্রোধ প্রকাশ করতে মেয়েদের খুব কমই দেখা যায়। পুরুষালী ও মেয়েলি খেলার ধরনও আলাদা। এ-সবই অবশ্য দেশ কাল ও সংস্কৃতি ভেদে স্বতন্ত্র। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েরা পুরুষালী সব খেলাতেই প্রায় অংশগ্রহণ করছে। যদিও পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েদের আচারব্যবহার ভাবভংগী অনেকটা পুরুষ নির্ধারিত বা পুরুষদের মনো-রঞ্জনের জন্য পরিকল্পিত তবুও মেয়েদের স্বাতন্ত্রবোধ, (individuality) আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতার ভাব অনেকটা বেড়েছে। অন্যদেশের মনস্তত্ত্বের কেতাবে দেখি, সাধারণত সমাজে প্রশংসিত ও প্রচলিত আচরণ বিধির ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছেন অনেক নারী। সমাজে পুরুষপ্রাধান্য সম্পর্কে সচেতন হবার ফলে মেয়েদের মানসিকতার এই পরিবর্তন পুরুষদের অনেকেরই সহ্য হচ্ছে না। বিবাহ বিচ্ছেদ ও অন্যধরনের নারী পুরুষের সংঘর্ষ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সনাতনপন্থীদের প্ররোচনায় সমাজের দুর্বল শ্রেণীদের স্বাধীন কার্যকলাপকে ঔদ্ধত্য বিবেচনা করে এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত, নারী ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে। কিশোর দুষ্ক্রিয়তা প্রসংগে বর্তমান নারীর মর্যাদা হানি ও নারীত্বের উপর বর্বর অত্যাচারের ক্রমবৃদ্ধির কারণ নির্ণয়ে এই বিষয় আলোচনা করব। আমাদের বক্তব্য এই যে মেয়েদের ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশের স্বাধীনতা পুরুষ প্রধান সমাজে অননুমোদিত তাই মেয়েদের মেজাজ ও মানসিকতায় ভীরুতা, দুর্বলতা ও আত্মনিপীড়নের আধিক্য। মেয়েদের নিয়ে পারি-বারিক সমস্যা—অনেক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও সেই পুরণো দিনের পাত্র সংগ্রহের মধ্যেই প্রধানত নিবদ্ধ আছে। অবশ্য আজকাল মেয়েরা আগের থেকে অনেক বেশি বাকপটু হয়েছে; বাধানিষেধের প্রাচীর ভাঙ্গতে না পারলেও প্রতিবাদ জানাবার ক্ষমতা কিছু কিছু কিশোরী আয়ত্ত করেছে। আদি কৈশোর ও মধ্য কৈশোরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পারিবারিক ও

সমাজপিতাদের আধিপত্য বজায় রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যতটা খোলাখুলি-ভাবে প্রকাশ পায়, অন্তকৈশোরে ততটা পায় না। অন্তকিশোর তার আত্ম-সংযম ক্ষমতা আয়ত্ত করে, মাতাপিতার আচরণে ততটা বেদনা অনুভব করেনা, যতটা আদি কৈশোরে বা মধ্যকৈশোরে করত। আগে, যখন মাতাপিতাকে আদর্শস্থানীয় মনে করতো, তখন তাঁদের মধ্যে কোনো ত্রুটী দেখলে দুঃখবোধ, হতাশাবোধ ও ক্রোধ দেখা দিতো। এখন হতাশাবোধ নেই; পিতার দোষ গুণ সমেত তাঁকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে। আমেরিকার কিশোররা পিতাকে প্রতিপক্ষ মনে করে। পিতৃবিরোধিতা, অবশ্য, আগেই বলেছি, অন্তকিশোররা বাচ্চাদের মত হৈচৈ করে প্রকাশ করে না, মনের মধ্যে চেপে রেখে নিজের খুশীমত চলার চেষ্টা করে। এই বিরোধিতাকে আজকালকার মনস্তাত্বিকরা ইডিপাস গুঢ়েষার সংগে সম্পর্কিত করেন না। তাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে আমল না দিয়ে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারকে অন্তকিশোররা শত্রুতা বলেই মনে করে (Stephans, **Ibid** p 521)। পারিবারিক ও সামাজিক পিতাদের বিরুদ্ধে অন্তকিশোরদের ক্রোধ ও ঘৃণা তাদের বুকের মধ্যে ধুমায়িত হতে থাকে। কল্পনায়, বিশেষ করে উদ্ভট কল্পনা ও অভিক্ষেপের (fantasy and projects) মাধ্যমে এই ক্রোধ ও বিরোধিতা অভিব্যক্ত হয়। (Symonds P. M. Inventory of themes in adolescent fantasy. American Journal of Orthopsychiat, 1945 ও 15, 318-328)। ওদের দেশে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা থেকে সব ব্যাপারই গ্রাহ্য করা অর্থাৎ permissive societyতে রূপান্তরণে পিতাপুত্র সম্পর্ক কি উন্নত হয়েছে? মনে হয়,—প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার এই পিতাপুত্র সম্পর্ক আজ আরো তিক্ত, আরো বিষাক্ত হয়েছে। ষাটের দশক থেকে ওখানকার বিভিন্ন আন্দোলন থেকে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। তখনকার পরিবারে পিতাপুত্রের সম্পর্কজনিত সমস্যা খুব বড়দরের সমস্যা বলে ধরা হত না, কেননা সমস্যার সরব বহিঃপ্রকাশ খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটতো। আজ বোধ হয় আর সে কথা বলা চলে না। আমাদের দেশের কিশোরদের মধ্যে পিতৃবিরোধিতা আজকের দিনে বাইরে যতটা অভিব্যক্ত, তার থেকে অনেক বেশি অব্যক্ত ও অবদমিত। তাই সমস্যা হিসেবে গুরুত্ব খুব বেশি দেওয়া চলে না। কিন্তু যে মধ্যবিত্ত নাগরিক শিক্ষিত পরিবারের সংগে আমাদের ঘনিষ্ঠতা, তাদের মধ্যে পিতৃদ্রোহিতা ষাটের দশক থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং গুরু সমস্যা রূপেই পরিগণিত

হয়েছিল। আজ অবস্থাটা হয়তো ততটা গুরুতর নয়। তাবলে সমস্যা কমেছে মনে হয় না। বলা যায়, সমস্যার ভংগী বদলেছে, রূপ বদলেছে। আজ আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সংগে আমাদের পুরণো দিনের সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা আপোষ রফা করে তাকেই নতুন সংস্কৃতি বলে চালাতে চাচ্ছি। তাতে সমস্যার প্রকৃতি বদলাবে গুরুত্ব কমবে না। সন্তান লালনে ও শিক্ষাপ্রদানে আমরা কঠোর নীতির বদলে পশ্চিমী দেশের মতই সর্বব্যাপারে সন্তানদের দাবিদাওয়া মেনে নেবার পন্থা গ্রহণ করেছি, বেশ কিছুদিন ধরে আমরাও 'পারমিসিভ' সমাজের সভ্য বলে নিজেদের মনে করছি। কিন্তু কিশোরদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করতে পারিনি। যুবকদের সংগে ক্ষমতা ভাগ করে নেবার আশ্বাস দিয়ে তাদের রোষবহ্নি কিছটা প্রশমিত করেছি, কিন্তু কিশোররা আগের মতই নিরাপত্তা বোধের অভাবে ভুগছে। যৌথ পরিবারের অতিমাত্রায় শাসন, কঠোর বিধিনিষেধ, অচলায়তনের অবরোধ কিশোরদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখতো; আর আজকের 'নিউক্লিয়ার' পরিবারের অবাধ স্বাধীনতা কিশোরদের আত্মপ্রত্যয়হীন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম, অস্থির ও অকারণে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। কিশোর, বিশেষ করে অন্তকিশোররা জানে না তারা কি অথবা কোথায় তারা যাবে। এই অতি-সাধারণ স্বভাবী সমস্যা আজ পিতাদের অতি-সাবধানতার দরুণ জটিল-সমস্যা বলে পরিগণিত হচ্ছে এবং স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে অস্বাভাবিক রোগ-উপসর্গ মনে করে মনোরোগ চিকিৎসককে অযথা ডাকা হচ্ছে। কিশোর নিজেকে মানসিক রোগাক্রান্ত মনে করে সত্যিই কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভয় পেয়ে পাগলের মত ব্যবহার করছে; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধপত্র চিকিৎসক ও পিতামাতার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে সত্যিকারের রোগের আক্রমণেও ডাক্তারের কাছে যেতে চাচ্ছে না বা ওষুধ খাচ্ছে না। যেখানে কিশোরকে পরোক্ষভাবে শিক্ষা দিলে তার ভয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তাও নিরাপত্তার অভাব দূর করা যায়; অথবা খোলাখুলি প্রত্যক্ষ আলোচনার ফলে তার পিতামাতা সম্পর্কে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস দূর করা যায়; সেখানে পাপবোধে পীড়িত, সর্বদা ব্যস্ত পিতা তাকে চিকিৎসকেরও ওষুধের হাতে সমর্পণ করে নিজের দায়িত্ব ও ভয় থেকে অব্যাহতি চাইছেন। দু'একটা বিবরণ দিলে আমার বক্তব্য বোধ হয় পরিষ্কার হবে।

(ক) বাবা নিয়ে এলেন ছেলেকে। বয়স ১৯।২০, মুখে কথা নেই, স্কুলে যেতে অনিচ্ছা, মাঝে মাঝে বাড়ী থেকে পালায়, আবার ফিরে আসে, কোনো

কিছু শেখার বা করার ইচ্ছে নেই, আগ্রহ নেই, ভুগছে ১৬ বছর থেকে, মাধ্যমিকে পরীক্ষা না দিয়েই মানসিক রোগী বলে চিহ্নিত হয়েছে। মাথা নীচু করে বসে রইল ছেলেটি, কোনো কথার জবাব নেই। বাবাকে বাইরে পাঠিয়ে বোঝান হল, বাবার সংগে আমার কোনো পরিচয় নেই, বন্ধুত্ব নেই, আজই প্রথম দেখা। ছেলেটি মুখ খুললো। বলল : তার বাচ্চা বয়স থেকে শুনে আসছে যে তার কিছু হবে না, ভিক্ষে করে খেতে হবে। দিদিরা কেমন টপাটপ ক্লাসের সিঁড়ি বেয়ে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের বেড়া টপকে গ্রাজুয়েট হয়েছে ; স্টেনোগ্রাফার হয়ে মোটা মাইনে পাচ্ছে। মাধ্যমিকের বেড়া টপকানো তার দ্বারা হয়নি। সে ঠিকই করেছিল পরীক্ষা দেবে না ; বাবা জোর করলেন, তাই একদিন গিয়ে আর যায়নি। সে জানে তার কিছু হবে না, তাই বই পত্তরের দিকে সে তাকায় না। মাঝে মাঝে পালিয়ে গিয়ে ভিক্ষে করা অভ্যাস করে দেখেছে। সে কাজেও সে অচল। অনেকদিন ওষুধ খাচ্ছে, ওষুধ না খেলে ঘুম হয় না, খিদে হয় না। বাবা বড় ফার্মে বড় দরের না হলেও মোটা মাইনের চাকরি করেন। ছেলেটাকে গ্রাজুয়েট স্টেনোগ্রাফার করে নিজে অবসর গ্রহণের আগে ওখানে ঢুকিয়ে দেবার আশা করেছিলেন। ছেলের বাবার ওপরে আস্থা নেই, বাবা সদুপায়ে যা রোজগার করেন, অসদুপায়ে বোধ হয় তার থেকে বেশি পান—এই তার ধারণা। ধারণা হয়তো ভুল, কিন্তু পিতৃদেবের আচরণেই এই ভুল ধারণা তার মনে বাসা বেঁধেছে। বাবাকে মিথ্যে বলতে শুনেছে, ধাপ্পা দিতে দেখেছে। অগাধ কালো টাকার মালিকদের তিনি শ্রদ্ধা করেন, বাড়ীতে কোনো কারণে মেসোমশাই এলে (তাঁর বাড়ী সার্চ করে অনেক সোনা পাওয়া গেছে) তিনি ধন্য হয়ে যান। মাও বাবার মতে সব ব্যাপারে সায় দেন। বাবা বলেন, ওরা তো অনেকে টুকে পাশ করেছে, আমি এত অপদার্থ যে টুকতেও পারি না। সত্যিই আমি অপদার্থ। পড়তে পারি না, ভিক্ষে করতে পারি না, এমন কি টুকতেও পারি না। আমার কিছু হবে না। এই একটা ব্যাপারে বাবা ঠিক বলেছেন।

ভদ্রলোককে জানালাম যে, "পড়াশুনোয় অমনোযোগিতা বা অক্ষমতাকে আপনারা বর্তমান কালের মাতাপিতারা যে-চোখে দেখেন, আমরা চিকিৎসকরা সে চোখে দেখি না। লেখাপড়ায় খাটো হলেই—মানে পরীক্ষা দিতে না চাইলে বা পরীক্ষায় ফেল করলেই ছেলে রোগে ভুগছে—এ ধারণা ঠিক নয়। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির মোহ আজ কিশোরদের কমে আসছে,

চোখের সামনে দেখছে গ্রাজুয়েট বেকারদের দুর্দশা। আপনার আমার সময়ের মত গ্রাজুয়েটদের সামাজিক মর্যাদা এখন নেই, কাজেই ওরা আনুষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়াকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। খুব ভাল ফল করবার মত মেধা আপনার ছেলের নেই, যেনতেন প্রকারেন পাশ করে 'শর্ট'হ্যাণ্ড' শিখে আপনার মত চাকরি করার ইচ্ছে ওর নেই। শুধু ও নয়, বেশ কিছু ওর বয়সী ছেলেমেয়ে বাবার পথে যেতে চায় না, বাবাকে আগের মত সব ব্যাপারে ওরা অনুসরণ করতে চায়না, বাবাকে অভ্রান্ত মনে করে না। বাবার ওপর ওদের আর্থিক নির্ভরতা বেড়েছে, কিন্তু মানসিক নির্ভরতা কমেছে। ওরা নানা মাধ্যমের মারফত অনেক কিছু জানছে, অনেক কিছু শিখছে—যার দাম স্কুল কলেজের বিদ্যার চেয়ে ওদের কাছে অন্তত বেশি। মোট কথা, ছেলে আপনার যতবার ফেল করবে, ওর নিজের ওপর ততই আস্থা কমবে; কিন্তু আপনার আমার মত হিতৈষীদের ওপর আস্থা বাড়বে না। আমাদের কথামত ওরা পথ চলবে না। এটা একটা সামাজিক সমস্যা। আপনার ও আপনার ছেলের মধ্যেকার মতান্তর পারিবারিক অশান্তি ও সমস্যার সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ছেলে মনের রোগে ভুগছে বলে মনে হয় না। "কিন্তু ওর ভবিষ্যৎ ?"—পিতার কণ্ঠস্বরে হতাশা। "ভবিষ্যতে ওর কি আছে, সে কথা আমরা কি বলতে পারি ? তবে আপনি নিজের মনোমত একটা ছাঁচে ফেলে ওকে গড়বার পরিকল্পনা ছেড়ে দিন। কিছুদিন ওর দিক থেকে মন ও দৃষ্টি সরিয়ে আনুন। শুধু ঘুমের ওষুধ ছাড়া অন্য সব বন্ধ করুন। ঘুমের ওষুধটাও ধীরে ধীরে কমিয়ে আনুন। দেখুন না, ওর মনোভাবের পরিবর্তন হয় কিনা, শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারে কিনা।" এত গেল পুরণো আমলের বাপের সঙ্গে সন্তানের মতবিরোধের ফলে সৃষ্ট সমস্যা। এবার পারমিসিভ সমাজের পিতার 'খুশীমত চল' নীতির থেকে উদ্ভূত একটি সমস্যার ইতিহাস বিবৃত করছি।

(খ) বাবা মাঝারী মাইনের চাকরী করেন। মায়ের মস্তিষ্কে প্রক্ষোভাধিক্য। পাভলভীয় পরিভাষায় প্রাথমিক সাংকেতিক তন্ত্রের প্রাধান্য। তাঁর সামান্যতম ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ গেলেই তাঁর ফিট হয়। বাবা বেশ সুস্থিত ও বুদ্ধিমান। একমাত্র ছেলের এবার উচ্চ-মাধ্যমিক দেবার কথা। সে পড়াশুনোয় মন বসাতে চায় না। আঠারো বছরের ছেলে, নাটক লেখে, গল্প লেখে, রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখে। বাবা তার খেয়ালে কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি কোনো দিন। মায়ের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তিনি ছেলের কথা

তুললেন। ছেলের মানসিক অবস্থা ভাল নয়, দলের ছেলেরা তার লেখা নাটকে ত্রুটি ধরেছে, তার পরিচালনায় তুষ্ট নয়, আকাশবাণীর দপ্তর থেকে তার একটা রচনা অমনোনীত হয়ে ফেরত এসেছে। মাঝে মাঝে তার এই রকম বিষণ্ণতার আবেশ আসে, এর জন্য ডাক্তার দেখানো হয়েছে। তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া গেলেও ছেলের এই সামান্য আঘাতে মুষড়ে পড়া ভাবটা যাচ্ছে না। এর কোনো উপায় আছে কিনা জানতে চাইলেন এবং পরদিন ছেলেকে নিয়ে হাজির হলেন। বয়সের তুলনায় ছেলেটিকে বড় দেখায়। মুখশ্রীতে এমন একটা ভাব, যা দেখে মনে হবে সে যেন ষ্টেজে নেমেছে এবং দর্শকদের বোঝাতে চাইছে তার মনের আকাশে বিষাদের মেঘ জমেছে। ছেলের সংগে বাপের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের। বাবা ছেলেকে প্রতিভাশালী বলে মনে করেন, নাটক সংগীত চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করেন, তার লেখার একটু আধটু অদলবদলের পরামর্শও দিয়ে থাকেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাটা পাশ করা দরকার একথা বলেন; কিন্তু পড়ার ব্যাপারে কোনো চাপ দিতে চান না। মায়ের মনের অসুখ আছে, ছেলেকে সেইজন্যই ডাক্তার দেখিয়েছেন। খুব একটা ভুল করেছেন বলে তিনি মনে করেন না। এই অসুস্থতাকেও তিনি 'শিল্পীর রোগ' বলে মনে করেন। বিষণ্ণতা মহৎ শিল্পসৃষ্টির সহায়ক—একথা তিনি একাধিক জায়গায় পড়েছেন, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। কেননা এই বিষণ্ণতা পর্বে ছেলে কিছু লিখতে পারে না, পড়তে পারে না, ওষুধ ছাড়া ঘুমুতে পারে না। ডাক্তারের সাহায্য ছাড়া তার চলে না। আঠারো বছরের ছেলেটি শিল্পীজনোচিত 'অহং' বোধ ও স্পর্শকাতরতায় ভুগছে, যদিও আচরণে ও কথাবার্তায় মনে হবে সে অতি বিনয়ী ও বাধ্য, কিন্তু আসলে সে নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে এবং কোনো বিষয়েই অন্যের অভিমতের সংগে আপোষ করতে রাজি নয়। তাই গত দু বছরে তার থিয়েটারের দলে অনেকবার ভাঙন ধরেছে, তার একনায়তন্ত্রসুলভ মনোভাবের জন্য সমবয়সীদের সংগে পা মিলিয়ে চলতে পারছে না। তার ধারণা সফল প্রযোজনার জন্য নাটকের মহড়ায় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন। স্কানিন্সলাভস্কি, ব্রেখট্ থেকে শুরু করে কোলকাতার দু চার জন সুপরিচিত পরিচালকের নাম করল—যারা নাকি শুধু কড়া শাসন ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জোরেই সফলতা লাভ করেছেন। বাবা তার সব মতে 'ডিটো' দিয়ে এসেছেন বলে বাবাকে সে ভালবাসে কিন্তু শ্রদ্ধা করে না। মেরুদণ্ডহীনপ্রাণীদের বিবর্তনের সিঁড়ির অনেক নীচুধাপে অবস্থিত। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও

আমাদের দেশে একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজন। মৃদু ভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করল আঠারো বছরের ছেলেটি।.....দু একদিন কথা বলার পর বুঝলাম তার মায়ের সব ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করে বাবা, মায়ের অসুখ জীইয়ে রেখেছেন। এ ভুল সে কোনোদিন করবে না। তবে তার নিজের মতামতের ওপর আস্থা যতটা, ঠিক ততটা অনাস্থা নিজের কর্মক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের ওপর। দিবাস্বপ্ন ও 'ফ্যানটাসির' মাধ্যমে সে নিজের ইচ্ছা পূরণ করছে। তার লেখা নাটকেও উদ্ভট কল্পনার ছড়াছড়ি, আর একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় পিতৃ বা কর্তৃত্ব-বিরোধিতা তার প্রধান বক্তব্য, অথচ নিজে অসীম কর্তৃত্বাভিলাষী। এই স্ববিরোধিতা এই কালের কিশোরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এখানে পিতার সর্বানুমোদন-অভ্যাস-'পারমিসিভনেস্' ছেলেটির দুর্বল ও মায়ের মত হিস্টেরিক টাইপের মস্তিষ্কে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকে তার ক্ষুদে জগতের সর্বাধিনায়ক করে তুলতে চাইছে।

আলোচনার ফলে, ভদ্রলোক বুঝলেন যে ছেলেটি ঠিক মায়ের মত অসুস্থ নয়। ছেলেটি তার পরিবারে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, নিজের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে, কিন্তু তার বিষাদ,তার হর্ষ, তার অভিলাস – সব দিক থেকেই বর্তমান সমাজের পিতা-পুত্র সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া। তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করা অসম্ভব নয়; কিন্তু তাকে ঠিক পথে চালাতে হলে তার পিতার সহযোগিতা দরকার। তাঁর পরিবার-পরিচালনার পদ্ধতি ও রীতি নীতি বদলানো দরকার। পিতাপুত্রের সংলাপ ও আলোচনায় পিতাকে তাঁর অভিমত আরো দৃঢ়ভাবে ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে : তাঁর ছেলের সর্বজ্ঞ মন্যতার-অহমিকা দূর না হলে সে মানুষ হয়ে উঠবে না। ভদ্রলোক কিছুটা সহযোগিতা করলেন, ছেলেটি নাট্যচর্চা স্থগিত রেখে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসল ও পাশ করল। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে তাকে কলেজে পাঠাতে পেরেছিলেন কিনা জানা নেই।

কিছুদিন আগে অন্য অঞ্চলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যার রীডারের পুত্রের চিকিৎসাসূত্রে তার মুখে তার পিতার উপদেশ শুনে চমক লেগেছিল। তিনি খুবই অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী ও প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রিয় লোক ছিলেন। ছেলেটির ভাষায়—এই বঞ্চনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সভ্যতার যোগ্যতম প্রতিনিধি। সংগ্রাম করে প্রতিকূল অবস্থায় অনেক কৌশলে আয়ত্তে এনেও আঞ্চলিক প্রতিযোগীর কাছে হেরে যান। অনেক তদ্বির তদারক করেও অধ্যাপকের পদে উন্নীত হতে পারেননি। একমাসের মধ্যে 'করোনারি থ্রম্ব-

সিসে' তাঁর মৃত্যু হয়। পুত্রটি পিতার পদাংক অনুসরণের চেষ্টা করতে গিয়ে মাঝপথে থেমে পড়েছে। তার মন পুরো সায় দেয়নি। পিতার সংকল্প ও অধ্যাবসায় তার ছিল না অথবা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার ভয় ছিল—হারার ভয় হয়তো বা থ্রম্বসিসের ভয়। পিতাকে সে ভালবাসতো খুবই ভাল-বাসতো, কিন্তু যেনতেন প্রকারেণ উঁচুতে ওঠার ব্যাপারে তাঁর নীতিহীন আচরণের জন্য সে তাঁকে মনে মনে ঘৃণাও করতো। কোনো প্রতিযোগিতা থেকে শেষ পর্যন্ত না লড়ে ফিরে আসার পর সে মানসিক অশান্তিতে ভুগতো। তখন সে বলতো—বাবা বলতেন, আমি যা বলছি সেই মত চলবে, আমি যা করছি সে রকম করবে না (ফলো হোয়াট আই সে বাট্ নেভার ডু হোয়াট আই ডু)। মনোবিদ্যার পণ্ডিত রীডার মহাশয় জানতেন তিনি যা করছেন, ছেলে তা করলে মানসিক শান্তি পাবেনা। তিনি এই বিষম প্রতি-দ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বড় করে দেখেছিলেন। কিশোর পুত্রকে সত্যিই ভালবাসতেন তাই জীবনে বড় হবার জন্য যাতে আত্মসম্মান ও মানসিক শান্তি না হারায়, সেই জন্য কিশোরকে মাঝে মাঝেই শোনাতেন 'ফলো হোয়াট আই সে, বাট্ নেভার ডু হোয়াট আই ডু'। তার উপদেশ পুত্রকে মানসিক অশান্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দূরে থাকতে বলেও ওর চোখের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সম্পর্কিত নানা রকমের চক্রান্ত ও হীন ক্রিয়াকলাপের সংগে জড়িত থেকে কিশোরের চোখে নিজেকে ছোট করে ফেলেছিলেন।

এবার সেই ছেলেটির কথা উল্লেখ না করে পারছি না, যার বাবা ছেলের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব জাগাবার জন্য ছেলেকে অনবরত পড়তে বলতেন, ভাতের থালায় দাগ কেটে জ্যামিতি পড়াতেন, প্রথম হওয়া শুধু নয়, দ্বিতীয়ের থেকে অনেক নম্বর বেশি না পেলে হতাশ হয়ে চোখের জল ফেলতেন। সে অনেক দিন আগের কথা, তখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য 'ইঁদর দৌড়' শুরু হয়নি। তিনি চোদ্দ বছরের ছেলেকে ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে নিয়ে জকিরা জীবনপণ রেখে কেমন করে ঘোড়া চালাচ্ছে দেখিয়ে তার মধ্যে বড় হবার প্রেরণা—এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রথম হবার চেষ্টা —সঞ্চারিত করতেন। ছেলেটির কৈশোরে আমি তাকে দেখিনি। তাকে যখন দেখি, তখন তার পিতা মৃত, সে সরকারী করণিক, বয়স বোধ হয় পঁচিশ। প্রবেশিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে বাবার তাড়না থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে বিজ্ঞান পড়তে মনস্থ করে। বাবা ছিলেন 'আর্টস'

এর ছাত্র। এই প্রথম সে অবাধ্য হল। বাবার নিজের মনস্কামনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সব পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করা (এতেই মোক্ষলাভ ঘটবে—এধারণা তাঁর মনকে অনুপ্রবিষ্ট করেছিল—সে কথা ছেলেও জানতো না)—ছেলেকে দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে তার বাবা প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত সবকটাতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন; প্রথম স্থানটি নাকি সংরক্ষিত ছিল এক হোমরা চোমরা ব্যক্তির সুযোগ্য পুত্রের জন্য। এই ব্যর্থতা তাঁকে এতদূর অভিভূত করেছিল যে, ওকালতিতে তিনি পশার জমাতে পারেননি। ছেলে যখন প্রথম হতে পারল না এবং বিজ্ঞান পড়ার অজুহাতে তার হাতের বাইরে চলে গেল, তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধের দরুণ তাঁর মৃত্যু হয়। ছেলেটি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার সংগে নিজেকে তুলনা করে বলেছিল, উপযুক্ত জকির অভাবে পরীক্ষার ফল আর ভাল হল না। বি, এস, সি পরীক্ষা পাশ করতেই পারল না, কেরানীগিরি ছাড়া নিজেকে ও মাকে বাঁচিয়ে রাখার অন্য উপায় খুঁজে পেল না। শৈশব থেকে বাবার উচ্চাশা ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অংশ গ্রহণ করার ফলে মধ্য কৈশোরেই তার স্নায়ুসংস্থা অতিপীড়নে দুর্বল ও অক্রিয় হয়ে পড়ে। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে তার মনে অপরাধ বোধ জাগে, কেননা বাবার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সে অল্প বয়স থেকেই পিতার মৃত্যু কামনা করে এসেছে। তাই স্নায়ুসংস্থা বোধ হয় আর সুস্থ সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

পুরনো দিনের যৌথ পরিবার ও আজকের 'নিউক্লিয়র পরিবারে শিশু চর্যা ও কিশোরদের উপর পিতামাতার প্রভাব নিয়ে অন্যত্র যা বলা হয়েছে তার মধ্যে সমস্যার যে সব সম্ভাবনা ছিল, তার দুচারটির বিশ্লেষণমূলক বিবরণ দেওয়া হল। স্নেহশীল পিতার সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার ব্যাপারে অতি উৎকণ্ঠার ফল সব সময়ে যে ভাল হয় না সেইটে বোঝাবার জন্য বিবরণ কোনো কোনো স্থানে হয়তো দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর কিন্তু আমার বিশ্বাস কম কথায় আমার বক্তব্য পরিষ্কার হত না। 'পিউনিটিভ্' ও 'পারমিসিভ' দু' ধরনের পিতার চিত্রই আমার অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে পাওয়া গেছে। কিশোরদের, বিশেষ করে মধ্য-কিশোর ও অন্ত-কিশোরদের পিতৃ-বিরোধিতার কারণ সম্পর্কে আবার কিছু বলা যাক। কিশোর, আগেই বলেছি অনেক সময় স্বপ্নরাজ্যে, উদ্ভট কল্পনাশ্রয়ী জগতে বাস করে। বাস্তব—, রূঢ় বাস্তবের সংগে প্রথম পরিচয়ে তার স্বপ্নরাজ্যে তোলপাড় ঘটে, তার কল্পনার

জাল বোনায় ব্যাঘাত ঘটে ; তাই সে অস্থির হয় ; তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত বলে মনে করে। পরিবারের উষ্ণ স্নেহনীড় থেকে নির্বাসিত, বৃহত্তর সমাজের পক্ষে তার প্রয়োজন নেই, সামাজিক জটিলতার গ্রন্থিমোচনে তার কোনো ভূমিকা নেই, আছে শুধু নিজের 'পিয়ার গ্রুপের' কাছে প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজন। অল্প বয়সে বাবা-মায়ের সব কিছুই সুন্দর ও অনুকরণীয় বলে মনে হয়েছে, অনুগামিতা ও বাধ্যতাকে স্নেহ দিয়েছে, নিরাপত্তাবোধ দিয়েছে। এখন সে জ্ঞান অর্জন করেছে, ভালমন্দ বিচার করতে শিখেছে, বাবা মায়ের দোষগুণ সমালোচনা করতে পারে, অভিভাবন প্রবণতা (suggestibility) কমেছে, দোষদর্শী (critic) হয়ে উঠেছে। সব সমাজেই ভালমন্দ বিচারের একটা মাপকাঠি, (standard) একটা আদর্শ থাকে ; কিন্তু বাস্তবে আর আদর্শে খুব কম ক্ষেত্রেই মিল হয়। আরো বড় হয়ে যখন সমাজের সংগে সম্পর্কিত হবে, তখন বাস্তব আর আদর্শতার অমিলতাকে হয়তো খুব বেশি পীড়িত করবে না। কিন্তু এখন সে কিশোর, সমাজের বাইরে থেকে সমাজকে দেখছে। তাই আদর্শকে কলুষিত হতে দেখলে তার মনে ক্রোধ ও ঘৃণার উন্মেশ হওয়া স্বাভাবিক। আবার অন্তর্কৈশোরে বিবেচনা শক্তি বেড়েছে, সংযম বেড়েছে, প্রক্ষোভকে দমন করার ইচ্ছে ও প্রয়োজনীয়তা বুঝেছে—তাই আচরণে আপাতদৃষ্টিতে ব্যতিক্রম ও চিন্তাধারায় বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে ; ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটছে না।

সমাজে দ্বন্দ্ব বিরোধ যত তীব্র হয়, বৈষম্য যত প্রকট হয়, ব্যক্তির আচরণে ও চিন্তাধারায় ততই বৈপরীত্য দেখা যায়। বর্তমানে শুধু আমাদের দেশে নয়, যুক্তরাষ্ট্রে, পশ্চিম ইয়োরোপে, পূর্ব ইয়োরোপের অনেক জায়গায়, চীনে, জাপানে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র—অস্থিরতা ও দুর্যোগের আবহাওয়া। অস্থিরতা ও দুর্যোগ অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের, কারণও আলাদা। এই দ্বন্দ্ব বিরোধ ; অস্থিরতা কিশোরমনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তাদের বড়দের সংগে বিরোধ ও নিজের সংগে বিরোধের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সরব প্রকাশ সত্তরের দশকের মত নয়।

বিদ্যায়তনের সমস্যা : কিশোরদের সমস্যার ও মানসিক দ্বন্দ্ববিরোধের প্রতিফলন অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখা যায় বিদ্যায়তনের চত্বরে, পরীক্ষার হলে ও শিক্ষকদের প্রতি আচরণে। এখানে সব কিছুই দলগত ব্যাপার। ব্যক্তি মানসিকতার চেয়ে গোষ্ঠী সচেতনতার অভিব্যক্তি ও প্রকোপ এখানে

বেশি। সমাজের অস্থিরতা, অন্যায়, বৈষম্য, বিরোধের সংগে বিদ্যায়তনের সমস্যাও এই সংগে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আদি কিশোরদের শিক্ষায়তনে সমস্যা থাকলেও, কিশোরদের সে সমস্যা বিশেষ বিচলিত করে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও বয়োবৃদ্ধির সংগে বিদ্যায়তনের সমস্যা কিশোরদের মনকে নাড়া দিতে থাকে। শিক্ষকের আচরণ ও শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কজনিত সমস্যা সব বয়সের কিশোরকেই প্রভাবান্বিত করে। শিক্ষক খুব কমক্ষেত্রেই আজকাল দ্বিতীয় পিতার ভূমিকা পালন করে থাকেন, যদিও আজকের দিনেই শিক্ষকের পিতৃজনোচিত আচরণের প্রয়োজন খুব বেশি। "যৌথ পরিবারের মধ্যে যে নিরাপত্তাবোধ ও উষ্ণতার অস্তিত্ব ছিল, তার অভাবে আদি কিশোরের মন আজ ক্ষুব্ধ ও পীড়িত। বিদ্যালয়ে তার শুধু প্রতিষ্ঠানিক বা পরীক্ষা পাশের শিক্ষালাভ ঘটেছে, সামাজিকীকরণ ও মানসিক স্বস্তিদানের দায়িত্ব শিক্ষকরা আজ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। আদিযুগে গুরুগৃহে, প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে পাঠশালায় বা বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা যে অভিভাবকের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, সেখান থেকে তিনি অপসৃত। শাসন করার ক্ষমতা তাঁর সীমিত, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অনেক বেশি ফর্মাল। আরুণি-উপমন্যুর যুগের কথা তুলছি না, পঞ্চাশ বছর আগেও কিশোররা শিক্ষকদের যে ভয় ভক্তির চোখে দেখতো, আজকের ছাত্রদের পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। শিক্ষা এখন অনেক বেশি যান্ত্রিক। ছাত্র ও শিক্ষকের অন্তরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। শিক্ষাজগতে আমল্যাতান্ত্রিক প্রভাবের বিরুদ্ধে বছর বারো তেরো আগে যে ব্যাপক আন্দোলন হয়ে গেছে তার ফলে গলদ কোথায় বোঝা গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে অন্তত, শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার ব্যবস্থা বা সেই গলদ দূর করার কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষায়তনে, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে, শিক্ষক ও ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে আগের থেকে বেশি বিরোধ ও অনন্বয় দেখা দিয়েছে। সমস্যার পর সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সমাধানের পথ দেখা যাচ্ছে না। বিশ পঁচিশ বছর আগে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ করে কিশোর কিশোরীদের মানসিকতা বিশ্লেষণ, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের উন্নতিবিধানের উপায় ইত্যাদি নিয়ে যে সব সমীক্ষা চালানো হয়েছিলো তার ফলে কোনো বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ছে না।* প্রশিক্ষণের দেশোপযোগী

* (1) Cormach Margarett : She who rides a peacock,

কোনো তত্ত্ব প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ হয়েছে বলে মনে হয় না। বারো বছর আগে ছাত্র বিক্ষোভের মনস্তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে যা লিখেছিলাম তাই আবার এখানে উদ্ধৃত করলে বক্তব্যটি খুব বেশি পুরনো হবে না, কেননা মূল অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।**

"এ যুগের বিদ্যার্থীর মন কেবলমাত্র বিদ্যার্জনেই নিবদ্ধ নয়, দুনিয়ার যাবতীয় ঘটনা ও সংবাদে সে আগ্রহী, সর্বব্যাপারে সে উৎসাহী। কিশোর মানসের বৈচিত্র্য-গ্রাহিতা ও অনুসন্ধিৎসা সর্বজনবিদিত। অতিমাত্রায় সমাজ-সচেতন হয়েছে সে সাম্প্রতিক কালে, তার বিক্ষোভ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, ...বয়ঃসন্ধিকালীন দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য কিশোর ছাত্র স্বভাবত অস্থির ও উল্লসিত।...এক জটিল মানসিকতা ও বৈপরিত্যবোধের উন্মেষে কৈশোর চাঞ্চল্য ঈষৎ স্তিমিত। ...নিজেকে সনাক্তীকরণ, নিজের সংজ্ঞানিরূপণ, সমাজে নিজের স্থান অনেন্বষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের চিন্তায় কিশোরমানস পীড়িত ও চিন্তান্বিত। পরিবার নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর সমাজের সংগে যুক্ত হতে চায়, 'ফ্যামিলি কালচার' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'পীয়ার কালচার' অর্থাৎ সমবয়সীদের সমাজে প্রবিষ্ট হতে চায়। সমাজ ও পরিবারে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধকে নানা ভাবে যাচাই করে দেখার সুযোগ পায় ছাত্র কিশোর, যাচাই করার দেখার প্রয়োজনও ঘটে।...শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবকে পরিণত হবার পথ মসৃণ ও সুগম নয়। দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবৃত্তিকালীন সংকট বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। সমাজ যখন সুস্থিত, এ সংকট তখন মৃদু ও অগভীর।...আবার সমাজ যখন অস্থির, ব্যাপক পরিবর্তন যখন সমাসন্ন, বিভিন্ন সম্প্রদায় বা শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে যখন সমাজ জীবন উদ্বেল, ছাত্র-মানসের সংকট তখন তীব্র ও গভীরভাবে অনুভূত।...সামাজিক বিততির ফলে তখন কিশোরমানস পীড়িত হয়ে পড়ে।...নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। বিক্ষোভ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে ছাত্র সমাজ।...দেশকালের বিশেষ ধর্ম আরোপিত হয়ে এই বিক্ষোভ আলোড়ন বিশেষ মূর্তি ধারণ করে।

Asia Publising, 1961. (2) R. Mukherjee, S. Bandopadhyay K. Chattopodhyay; Field studies in the Sociology of Education, 1965-66.

** গঙ্গোপাধ্যায়, বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৩৮১, পৃঃ ২৪৬-২৪৭।

..."আমাদের দেশের গুরু কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু এ-যাবত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বীকৃত 'হায়রার্কির' ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের মধ্যে কিশোর ও তরুণের নির্দিষ্ট স্থান ও কর্তব্য নির্ধারিত ছিল। ব্যতিক্রম ঘটলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষক, মাতাপিতা এবং সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।... বিক্ষোভের মূলে থাকত দেশ বা দেশনেতাদের প্রতি কোনো অবমাননা লাঞ্ছনার ঘটনা অথবা উক্তি। গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতা আজকের ছাত্রবিক্ষোভের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।...প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস পোষণ, বোধ হয়, আজ তরুণ মানসের এক সামান্য ধর্ম। অভিভাবক ও শিক্ষককে তারা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে অনিচ্ছুক।

...সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত ও বিবাহিত হয়ে সংসার ধর্ম নির্বাহ করত যারা, তাদের অধিকাংশ এখন বিদ্যার্থী। উচ্চশিক্ষার সময় দীর্ঘ ও বিলম্বিত, উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যাও অগণিত। একদিকে তারা আর্থিক ব্যাপারে অভিভাবকদের উপর নির্ভর করতে হয় বলে, অনুগত থাকতে চায়, অন্যদিকে আবার নিজেদের বয়োপ্রাপ্ত ও দায়িত্বশীল মনে করে সমাজ পরিবর্তনে স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণে উৎসুক। এই 'সাইকোলজিক্যাল উইনিং' (psychological weaning) এর সময় অনেকখানি বেড়েছে এবং এই ব্যাপারে জড়িত কিশোর তরুণের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। বলা চলে, বয়ঃসন্ধিকাল দীর্ঘায়িত হয়েছে।"

এই 'সাইকোলজিক্যাল উইনিং' নিয়ে সেই সময় অনেক ফ্রয়েডবাদী লেখক বাস্তব পরিস্থিতি এড়িয়ে গিয়ে 'ইডিপাস গুটেষা' ইত্যাদি অন্তর্নিহিত জৈবক্ষুধার ভিত্তিতে কিশোরদের বিদ্রোহের ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন ; এখন অবশ্য অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক অনেক বেশি পরিবেশ-নির্ভর আলোচনা ও বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন (Cormach Margarett, o. p, cit, p 206)। পুরনো লেখা থেকে যে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেছি, দেখা যাবে আজকের পরিবেশে এই সব বক্তব্যের গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। তবে সে সময় এই গুরুদ্রোহিতা ছিল একটা তীব্র সমস্যা যা তখনকার দিনে সকলকার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এখন সমস্যাটা, আমার মতে, সাময়িক ভাবে তার তীব্রতা হারিয়েছে বটে কিন্তু যে ভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল ও ঘোরালো হচ্ছে তা থেকে অনুমান করা অসংগত নয় যে আবার কিশোর ও তরুণদের অসন্তোষ শিক্ষা জগতকে তোলপাড় করতে পারে। তবে বর্তমানে আমি

এই অসন্তোষ ও শিক্ষক ছাত্র সমস্যা 'মাইনর প্রব্লেম', স্বভাবী প্রতিক্রিয়া বলেই গণ্য করছি। কিশোর কিশোরীর বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ গত এক দশকে যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। আবার বিপরীতে রহস্যময়তা ও অলৌকিক শক্তির প্রতি আকর্ষণও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রহতুষ্টির জন্য রত্নধারণের ভুয়ো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনছি কিশোর ও অভিভাবকদের মুখে। যেমন গত শতাব্দীতে মস্তকে শিখা (টিকি) ধারণেরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পরামনোবিদ্যা তো দেশবিদেশের বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আবার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও রহস্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের এক নাম করা বৈজ্ঞানিক ও আমেরিকার একজন প্রগতিবাদী প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন (ছোটখাটো অনেকে পত্রপত্রিকা মারফত এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন ও চালাচ্ছেন)। সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে, যতদূর জানি, কোনো পরামনোবিদ্যার parapsychology) অধ্যাপক ও ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধির অধিকারী কোনো 'মহাপুরুষ' এগিয়ে আসেননি। অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা যতদিন সমাজে থাকবে ততদিন অলৌকিক শক্তি ও রহস্যময়তা কিছুসংখ্যক কিশোর কিশোরীকে আকৃষ্ট করবেই। একদল প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ, অন্যদল ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা অনুসন্ধানে সচেষ্ট। বাড়ী থেকে পালিয়ে কিছু কিশোর 'সিনেমা ষ্টার' হবার স্বপ্নচালিত হয়ে বম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, আবার একদল কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সেবক হবার জন্য গোপনে গৃহত্যাগ করছে (আনন্দবাজার, ২৩. ৭. ৮২)। যারা অসামাজিক, সমাজদ্রোহী বা অপরাধী হচ্ছে, যেগুলো গুরুতর সমস্যা—সেই সব নিয়ে আলোচনা এখানে করছি না। এখানে যে সমস্যার কথা তুলেছি, এই ধরণের সমস্যাপীড়িত কিশোর কিশোরী ও তাদের সংগে সম্পর্কিত শিক্ষক—অভিভাবকদের দুচারজনের সংস্পর্শে এসেছি, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি, এবং দেখেছি সামান্য কিছু ওষুধ (আগে অন্য জায়গা থেকে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছিল যে সব ক্ষেত্রে) এবং কয়েক ঘণ্টার আলোচনায় সমস্যা মিটে গেছে। তাই আমি এই সব সমস্যাকে লঘু সমস্যা ও সমাধানসাধ্য সমস্যা বলে গণ্য করেছি।

এইরকম সমস্যা সমাধানে সাহায্যপ্রার্থী আরো দুজনের কথা বলছি।

(ক) বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এই 'ক' বাবু এতদিন ছোট খাটো মফঃস্বল কলেজের কুড়ি বাইশ জন নিরীহ গোছের পল্লীগ্রাম

থেকে আসা ছেলেদের ক্লাসে পড়িয়েছেন। 'ডক্টরেট' পাবার পর এখানে চাকরী পেয়েছেন। এখানে সেই ৬৮।৬৯ তে শিক্ষক-নির্যাতনের কিছু ঘটনা ঘটেছিল ও বর্তমানেও ছাত্ররা সন্তুষ্ট নয়। মাঝে মাঝেই গোলমাল হয়, পিকেটিং হয়, দাবী দাওয়া তোলা হয়—তবে এমন কিছু ভয়াবহ পরিস্থিতি নয়। কিন্তু 'শ্রী ক' যখন ১০০।১২০ জনের ক্লাসের একটি সেকশনে পড়াবার নির্দেশ পেলেন, তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। এখানে যোগদান করার আনন্দ তাঁর আগেই কমেছিল ; যখন তিনি শুনেছিলেন যে তাঁর আগে এই ক্লাসটি যিনি নিতেন, তিনি ৭০ সালের পরেও নানাভাবে বিড়ম্বিত হয়েছেন। বুক গুর গুর করতে লাগল, অনার্স ক্লাসে (১০/১২ জন ছাত্র) পড়াতে গিয়ে গলা দিয়ে কথা বেরুল না। এক বন্ধুর পরামর্শে ডাক্তার দেখালেন। তাঁকে কিশোর মানসিকতা নিয়ে আমার কিছু বক্তব্য তাঁকে শোনালাম। বললাম... "মনে রাখা দরকার, ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়েনি, শিক্ষানিকেতনের আয়তন ও শিক্ষার উপকরণও আগের মতই আছে। অনেক পাঠ্যসূচির, পঠনপদ্ধতির পরিবর্তন মাঝে মাঝেই করা হচ্ছে, কিন্তু পরীক্ষামূলক এই পরিবর্তনের ফল পাবার জন্য সময় চাই। আপনি ছাত্রদের বুঝিয়ে বলবেন যেতারা জেট প্লেনের গতিতে এগিয়ে যেতে চাইছে। তাদের একদশক আগেকার পূর্বসূরীরা সব কিছু ভেঙে চুরে রাতারাতি আমূল পরিবর্তন চেয়েছিল, সেই আমূল পরিবর্তন তখন সম্ভব ছিল না তাই ঘটেনি। তারা যা চেয়েছিল তা পায়নি, শুধু নিজেরা কষ্ট পেয়েছে, অন্যদের কষ্ট দিয়েছে। তাদের অসহিষ্ণুতা বা দাবিদাওয়া অন্যায় নয় তবে এই দাবিদাওয়া মেটাতে সময় যদি না দেয় তাহলে তারাই তাদের জ্যেষ্ঠদের মত ঠকবে ; তোমাদের দাবিদাওয়া কোনোদিনই মিটবে না। আপনি ভয় পেলে বা অতিমাত্রায় নিয়মশৃংখলা বজায় রাখার চেষ্টা করলে কোনো লাভই হবে না। ওদের চিন্তা করার সুযোগ দিন। শুধু জ্ঞান ভান্ডার বাড়াবার চেষ্টা না করে বন্ধুর মত ওদের সংগে আলোচনায় যোগ দিন। ওদের নেতাদের আপনার প্ল্যাটফর্ম থেকেই বক্তব্য রাখতে বলুন, ওদের উষ্মা ও ক্রোধ প্রকাশ করার পথে বাধা সৃষ্টি না করে ওদের প্রক্ষোভের চাপ হালকা করতে সাহায্য করুন। এই ভাবেই প্রথম দুচারদিন ক্লাস নিন। আপনি দুচার কথা বলেই ওদের বলার সুযোগ দিন। তা হলে কিছু দিন পরেই ক্লাস নিতে পারবেন।" অবশ্য এই কথা গুলো একদিনে বা একটানা বলিনি ; দিনচারেক তাঁর সংগে সংলাপ চালাতে

হয়েছিল। ফল ভালই হল। ভয়ে ভয়ে শুরু করে তিনি শেষ পর্যন্ত কিশোরদের জয় করতে পেরেছিলেন। এটা কিশোরের নিজস্ব সমস্যা না হলেও সমাজ সৃষ্ট কিশোরকেন্দ্রিক সমস্যা—তাই এই ঘটনাটি বিবৃত করলাম।

শিক্ষকদের অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবসায়িক রূঢ় ব্যবহারে অনেক আদি-কিশোরদের মনে ভয় বা অশ্রদ্ধা ঢোকে, যা অনেক বেশি বয়সেও তাদের যায় না। অনেক সময় এর ফলে তারা সত্যিকারের মনের রোগে ভোগে। এ-সম্পর্কে দুচারটে কথা শিক্ষকদের জানানো দরকার। শিক্ষক হয়তো বুঝতেই পারেন না যে তাঁর ব্যবহার রূঢ় হয়েছে।

(ক) শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন। ছাত্রদের দিকেও নজর ছিল। একটি ছেলে (বয়স ১৩) চোখ নিচু করে আছে। তাকে লক্ষ করে জিগ্‌গেস করলেন, সে কি করছে। ছেলেটি প্রথমটায় তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। পাশের ছেলেটি তাকে ঈষৎ ধাক্কা মারতে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিক্ষক বললেন,—"তুমি ক্লাসে গল্পের বই পড়ে আমাকেও ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের অপমান করেছ, তুমি ক্লাসের বাইরে যাও।" ছেলেটি দাঁড়িয়েই রইল। বাইরে গেল না, চোখ তুলে শিক্ষকের দিকে তাকাল না। শিক্ষক গলা না চড়িয়ে আবার বললেন, "তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করে আরো বেশি অপমান করেছ, আমি তোমার নামে হেড্ মাস্টারের কাছে রিপোর্ট করব।" ছেলেটি চোখ মুছতে মুছতে বই খাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল। পাশের ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল যে ও গল্পের বই পড়ছিল না, ওর বই নেই, তাই আপনি যা বলছিলেন তাই খাতায় লিখে নিচ্ছিল। মাস্টার মশায় শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "সে কথা আমাকে জানালে কি ওর মাথা কাটা যেত। গরীবের এত অহংকার কেন?" ছেলেটি ক্লাসের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনতে পেল। তারপর থেকে ঐ শিক্ষকের ক্লাসে গেলেই তার ভয় করত, কান্না পেত। এ-নিয়ে দু'একজন দুষ্টছেলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করতে লাগল। ছেলেটির ভয় ও লজ্জা বেড়ে গেল। ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করল। বাড়ীতে সাধ্য সাধনা বকাঝকা করেও কোনো ফল হল না। তার বাবা স্কুল বদল করলেন। কোনো লাভ হল না। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে সে পাশ করে চাকরী পেয়েছিল। কিন্তু চাকরী করতে গিয়েও মুস্কিলে পড়ল। বড়বাবুর কাছে কোনো কাজে যেতে হলেই সেই স্কুলে পাওয়া ভয় আবার তাকে পেয়ে বসত, অনেক বার 'টয়লেটে' যেতে হত,

কয়েক গেলাস জল খেতে হত। এই ভয় যে ছোট বেলাকার শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া অপমান ও নিগ্রহের ভেবে তার একটা প্রমাণ এই যে ঐ স্কুলের ঘটনা নিয়ে সে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখত, এবং তার পর বড়বাবু, ছোট সাহেবের কাছে যাবার ডাক না পড়লেও তার অফিসে যেতে ভয় হত, সেই স্কুলে যাবার ভয়ের মতই উপসর্গ দেখা দিত। আমার মনে হয়, ছেলেটির ভয় সেই ছোটবেলাতেই দূর করা বোধ হয় সম্ভব হত, যদি মাস্টার মশায়ের সংগে ছেলেটির তখন দেখা করিয়ে দেওয়া হত, মাস্টার মশায় দুচারটে মিষ্টি কথা বলে, আশ্বাস দিয়ে তার বিদ্যালয়-ভীতি দূর করে দিতে পারতেন। আগেকার দিনে গ্রামের স্কুলে, যেখানে প্রতিটি ছাত্রকে ও তার বাড়ীর লোকজনদের শিক্ষকরা চিনতেন, এরকম ঘটলে ঐ ভাবেই ভয় ভেঙে দেওয়া হত। এরকম দু'একটি ঘটনা আমার জানা আছে। কিছুকাল আগে পড়া সোভিয়েট দেশের মনের অসুখের চিকিৎসা সংক্রান্ত একখানি বইতে পড়েছিলাম যে নীচু ক্লাসের ছেলেদের ছোট খাটো মানসিক বিশৃংখলা বা ব্যবহারের গোলমালে শিক্ষকরাই প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। প্রয়োজন হলে মা বাবা অভিভাবকদের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে বিদ্যালয়ে না আসা বা সাপ্তাহিক, মাসিক পরীক্ষায়—খারাপ ফল সম্পর্কে আলোচনা করেন। (Wortis, Soviet Psychiatry, William Wilkins, Baltimore 1950. pp 103—128)। যে-ছেলেটি শিক্ষকের বেরিয়ে যাবার নির্দেশে ভয় পেয়েছিল, তার নিশ্চয়ই সে সময় অন্য কোনো কারণে মস্তিষ্কের ওপর চাপ পড়েছিল। কোনো ভয়ের উদ্দীপক, সামান্যতম হলেও, বিশেষ কোনো মুহূর্তে মস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আবেশে (obsession) পরিণত হয়। সেই দিন সকালেই কিশোরটি জেনেছিল যে তার বাবার নাম ছাঁটাইয়ের তালিকায় উঠেছে. দুমাস পর থেকে বাবার চাকরি থাকবে না।

আরো মনে রাখা দরকার, কৈশোরে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসংস্থার ক্রমপরিণতি ঘটতে থাকে। মস্তিষ্কের সব অংশের পরিণতি সমান হারে ঘটে না (Ibid p 125),—তাই চিন্তা ও কাজে ঠিকমত সংহতি (integration) গড়ে ওঠে না। মৃদুতম উদ্দীপকে সময় বিশেষে তীব্রতম প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিশেষ করে আদিকৈশোরে এই প্রতিক্রিয়া চরমে ওঠে, কারণ তখন কিশোর সবে পরিবারের স্নেহাশ্রয় থেকে বেরিয়ে নতুন নিরাপত্তাশ্রয় খুঁজছে। শিশু বয়সে অতি সহজেই মা কিম্বা বাবার কাছে বলে বা খানিকটা কান্নাকাটি করে বা

মাকে দুচারটে চড়চাপড় মেরে নিজের ভয়ের বা মনের আঘাতের নিজেই বেশ খানিকটা চিকিৎসা করতে পারত, এখন সে তা পারে না। এই বোধ জন্মেছে যে সে বড় হয়েছে, এখন শৈশবের আচরণ নিন্দনীয়। আদি কিশোরদের সমস্যা বাড়ীর লোকের চেয়ে শিক্ষকদের নজরে পড়বারই সম্ভাবনা বেশি : অবশ্য যদি এ-বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ থাকে এবং নিজেদের তাঁরা সজাগ রাখেন। কিশোরদের সংগে আচরণে ও কথাবার্তায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন দরকার—এ বিষয়ে শিক্ষকদের ধারণা যথেষ্ট পরিষ্কার এবং তাত্ত্বিক দিক-এর গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক কি ভাবে কোন ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে হবে এ সম্পর্কে তাঁদের সকলের হয়তো সমান জ্ঞান নেই। তাছাড়া, কিশোরদের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা বেশি হলে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান বা প্রতিটি কিশোরের ওপর নজর রাখা কোনো শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব নয়। নীচু ক্লাসে যাঁরা পড়ান তাঁদের জন্য বিশেষ প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আদি-কিশোরদের মানসিক অস্থিরতার ও ছোটখাটো সমস্যার কারণ নির্ণয় ও সমাধানের ভার শিক্ষকদের ওপর থাকলে পরবর্তীকালে বড়দরের সমস্যা অনেক কম হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ বিষয়েও শিক্ষকদের এবং অভিভাবকদেরও অবহিত হওয়া দরকার যে আচরণগত ব্যতিক্রম, ভয় বা রাগের আকস্মিক বৃদ্ধি যেমন সব সময়ে মনোরোগের লক্ষণ নয়, বিকাশ ও বৃদ্ধিসংক্রান্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক সমস্যা ; তেমনি আবার এই ধরনের সব কিছুই আপনা থেকে ভাল হয়ে যাবে - এই সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কালহরণ করলে সাধারণ অসাধারণ, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে—একথাও তাঁদের মনে রাখা দরকার। সমস্যার মূল খুঁজে বের করার পর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেও যদি অবস্থার উন্নতি না হয়, তবেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। চিকিৎসার বদলে তুক্‌তাক্‌ ঝাড়ফুঁক করার ফলে অনেক কিশোরের ভবিষ্যৎ চিরকালের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

শৈশবে কি ধরনের শিক্ষা পেয়েছে, কি ধরনের পারিবারিক পরিবেশে, নার্সারী ও কিন্‌ডারগার্টেনে তার প্রাথমিক অভ্যাস বা শর্তাধীন পরাবর্ত-গুলো গঠিত হয়েছে এই সবের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে কিশোরের বিদ্যালয়সংক্রান্ত সমস্যা। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয় শৈশবের আবাস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। সেখানেই তার অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহের প্রথম উন্মেষ ঘটেছে এবং তার প্রেষণা (motivation) ও লক্ষ

সম্পর্কে তার কিছুটা ধারণা জন্মেছে। কৈশোরে অনেক সময় তার প্রেষণা ও লক্ষের অদলবদল ঘটতে পারে। এ বিষয়ে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা কোনো সময়েই উচিত নয়; কড়া বিধিনিষেধ দিয়ে তার নিজের প্রবণতা ও আকর্ষণকে ব্যাহত করা খুবই ক্ষতিকারক। কিশোরকে অভিভাবক বা শিক্ষকের অভিলাসপূরণের যন্ত্র মনে করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। এ কথা একটি কিশোরের জীবন-ইতিহাস বিবৃত করার সময় বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, যুক্তি বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনার মাধ্যমে কিশোরকে প্রভাবিত করা যায়, ও অধ্যবসায় ও চেষ্টা আন্তরিক হলে তার ভুল ধারণা দূর করা যায় (যতক্ষণ না কোনো ধারণা আবেশ বা অবসেশনে পরিণত হয়)। শিশুদের যতটা 'ছেলেমানুষ' বা বুদ্ধিহীন মনে করা হয়, তারা ততটা 'ছেলেমানুষ' নয়; কিশোররা তো নয়ই। 'লজিক' না পড়েও ছেলেরা যুক্তিবাদী হতে পারে,—আমাদের অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা বা উপদেশের মর্ম বুঝতে পারে। সেটা বড়রা জানেন না বা ভুলে যান, ফলে কিশোরদের সংগে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হবার সম্ভাবনা থাকে এবং বাস্তবে ভুল বোঝাবুঝি ঘটেও থাকে। এই ভুল বোঝাবুঝি থেকে শুধু কিশোরদের নয়; পরিবারের, বিদ্যায়তনেরও ক্ষতি হয়। কিশোরদের বিশেষ করে বারো থেকে ষোলো বছরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিদ্যালয়ে ও গৃহে অনেক সময় এমন সব গোলযোগের সৃষ্টি হয় যার জন্যে শিক্ষক বা অভিভাবক কেউই প্রস্তুত থাকেন না; এই অকল্পিত গণ্ডগোলের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রথমটায় কিশোর-দেরই দায়ী করা হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোধ হয় পিতামাতা ও শিক্ষক বুঝতে পারবেন যে দায়ী তাঁদের কিশোরমন সম্পর্কে অজ্ঞতা। তারা আর শিশু নেই, শুধু দেহ নয়, মনের দিক থেকে, বুদ্ধির দিক থেকেও তারা বড় হয়েছে; কিশোরের মনে পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবার-সমাজ-জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা ও জ্ঞান বদলেছে; পিতামাতার মন এক জায়গাতেই রয়ে গেছে। যে-শিক্ষক এগারো-বারো বছরের বেশি ছেলেমেয়েদের পড়ান, তাঁদের কমবয়সী বাচ্চাদের পড়াতে দেওয়া উচিত নয়। তাহলে তাঁরাও কিশোরদের পরিবর্তিত মানসিকতা ও বোধশক্তি সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন, সঠিকভাবে তাদের বুঝতে পারবেন না। শুধু ধমক দিয়ে বা আদর করে তাদের অভ্যাস বদলানো যাবে না—নতুন কিছু শেখানোর ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। তাদের উদ্যম বা শক্তি পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে তাঁদের বোঝা দরকার—কিশোর আর শিশু নয়। কৈশোরের শারীরবৃত্তিক

ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তবজ্ঞান ছাড়া কৈশোর সমস্যা বোঝা ও তার সমাধান সম্ভব নয়।

যে-সব মনস্তাত্ত্বিক মনে করেন যে কৈশোরে সংকট অনিবার্য ও পূর্ব-নির্ধারিত, তাদের সংগে সকলে একমত হবেন না। প্রধান সমস্যা কি যৌন-সমস্যা?—সে বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কৈশোরের দিবাস্বপ্ন ও উদ্ভট কল্পনার মধ্যে কামেচ্ছা পূরণের কল্পনা বা স্বপ্ন যতটা থাকে তার থেকে ঢের বেশি থাকে পরিবারের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে অনেক কিছু করবার আরো সুযোগ পাবার কল্পনা ও কঠিন কঠিন কাজ করার বাসনা। এ-বিষয়ে আমেরিকাতে এক বিজ্ঞানী (Symonds, Inventory of Themes in Adolescent Fantasy; O.P. cit) যা বলেছেন সোভিয়েট রাশিয়ার একজন শিশু মনস্তাত্ত্বিকও প্রায় তাই বলেছেন (Davydova, Psychological Pecularities of the Adolescents—reported by Wortis in Soviet Psychiatry, Baltimore, 1950, p. 117)।

কিশোর যখন আবিষ্কার করে প্রক্ষোভের প্রাচুর্য দেহমনকে অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে, শুধু অকারণ পুলকের বন্যাস্রোতে কিম্বা বিষাদসিন্ধুর উদ্বেল তরঙ্গ তাড়না তাকে কোন এক অজানা নিরুদ্দিষ্ট রাজ্যে নিয়ে চলেছে ; তখন তার আত্মসংবরণের প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে ওঠে। নিজের জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে ভাবনাচিন্তা শুরু করে এবং লক্ষে পৌঁছুতে, উদ্দেশ্য সফল করতে নিজের অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াতে হবে বুঝতে পারে। নতুন দেশে নতুন মানুষের সংস্পর্শে নতুন নতুন দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য তাকে যেন কেউ সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ সে গান গেয়ে ওঠে, হঠাৎ একা থাকলে বিচিত্র অঙ্গভংগী করে নাচতে শুরু করে—যে বাড়তি শক্তি, বাড়তি তেজ ভেতরে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে, তার কিছুটা সে এইভাবে প্রকাশ করে। একলা বা দল বেঁধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। দুষ্টের দমন করার সব দায়িত্ব যেন তার,—এমনিভাবে কথা বলে, দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়। খেলার মাঠে অপরপক্ষের সংগে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে নিজের প্রাণ প্রাচুর্যের কিছুটা খরচ করে। তার উদ্দেশ্য কি? লক্ষ কি? আজকে যা ভাবে, কাল সেটাকে পরিত্যাগ করে। নিজের মনের কথা খুলে বলার জন্য সঙ্গী খোঁজে, বন্ধু খোঁজে ; বন্ধুত্ব করতে না পারলে জীবন বৃথা মনে হয়। মনে অনেক চিন্তা এক সংগে ভিড় করে আসতে চায়। অসামাজিক

সামাজিকের, ন্যায় অন্যায়ের, ভালমন্দের চিন্তা তাকে মাঝে মাঝে পাগল করে তোলে। অনির্দিষ্ট যৌন আকর্ষণ বোধ করে ভয় পায়, নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আমাদের দেশে কিশোরের যৌনজিজ্ঞাসার ঠিক ঠিক উত্তর দেবার মত কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, তাই তারা ধর্মীয় সংস্থার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে। ভাবে সাধু সন্ন্যাসীর কাছে হয়তো জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে, তাঁদের কাছে মনের কথা খুলে বলে হয়তো মনের ভার লাঘব হবে! নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের কিশোর—যাদের অভাব অনটনের সংসারে আনন্দের রোশনাই খুব কমই জ্বলতে দেখে,—আনন্দের সন্ধানে, বলা উচিত নিরানন্দের আবহাওয়া থেকে মুক্ত হতে ভবঘুরে হয় কিম্বা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় খোঁজে। আমাদের দেশে ধর্মের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বেশি। তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করতে অনেক দেশীবিদেশী গুপ্ত সংস্থা, শোনা যায়, এখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশে তাদের কাজকর্ম চালাচ্ছে। এইসব জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু, অভাবপীড়িত কিশোরদের আশ্রয় দিতে এই সব প্রতিষ্ঠান খুবই আগ্রহী। অনেক কিশোর নামকরা জনসেবক প্রতিষ্ঠান, মিশন ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে থাকে এই সব প্রতিষ্ঠানের সেবাধর্মে আকৃষ্ট হয়ে। পরাধীন ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী গুপ্তসম্প্রদায় সাহসী, বুদ্ধিমান ও সবলদেহী কিশোরদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করত। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলা মধ্যকিশোর ও অন্তকিশোরদের কাছে বিশেষ রোমাঞ্চকর ও গৌরবজনক মনে হত। সমাজের সংগে অভিযোজন মানে সমাজের সব কিছু মেনে নিয়ে সমাজকে কোনোমতে টিকিয়ে রাখা—এ বিশ্বাস অনেক কিশোরেরই থাকে না; বিশেষ করে যদি উপযুক্ত পরিবেশে তারা বেড়ে ওঠে। সমাজ ব্যবস্থা পালটাবার প্রতিজ্ঞা করে যে সব কিশোর বিপ্লবী গোষ্ঠীর সভ্য হয় বা সভ্যদের সংগে মেলামেশা করে এবং যারা সৎ সমাজসেবক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে, অথবা প্রগতিশীল রাজনৈতিক পার্টির কর্মী হয়ে নিজের লেখাপড়ায় অবহেলা করে, তারা পিতামাতার সমস্যা বা দুঃখের কারণ হতে পারে, কিন্তু সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে না। তারা আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অন্যদের কথা ভাবতে শেখে; তাদের মধ্যে অনেকেই বয়স বাড়ার পর বাবা মায়ের কথা ভেবে পারিবারিক দায়দায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলে নিতে পারে। কৈশোরে পরার্থবাদে দীক্ষিত হবার ফলে পরবর্তী জীবনে দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত হবার, সমাজের মধ্যে থেকে অসামাজিক ও অসৎ কাজে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা তাদের অপেক্ষাকৃত কম। প্রতিযোগিতামূলক

বিষম সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকে অর্থ, মান, প্রতিপত্তির মোহে আকৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু তার জন্য আত্মবিক্রয় করতে বা যে কোনো মূল্য দিতে এদের সবাই রাজি হয় না। নিজের মূল্যবোধ, মর্যাদা, আদর্শ ও ভাবমূর্তি রাখতে প্রতিকূল পরিবেশের সংগে সংগ্রামে এদের অনেকেই হয়তো ক্ষত-বিক্ষত হয়, রোগগ্রস্ত হয়। সামাজিক সাফল্য লাভ করে এক সময়কার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন প্রায়ই এদের অবহেলা করে, বোকা বা 'পাগল' আখ্যা দিয়ে থাকে। মনের ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে মাঝে মাঝে এঁরা মনোরোগচিকিৎসকের সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাই এঁদের মূল্য চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন। যে সব সমাজতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকদের এদের সংগে পরিচয় আছে, তারা সমাজের বা দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হয়ে পড়েন না, তাঁদের লেখায় বারবার অসুস্থ সমাজের (sick society) উল্লেখ থাকে না। এই ক্লেদ ও গ্লানিভরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, আমূল পরিবর্তন সম্ভব, একথা ঘোষণা করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। কিছু অভিভাবক বা শিক্ষক কিশোরদের কেতাবী বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য, কলেজ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির বাইরের পুস্তকে মনোনিবেশের জন্য, কোনো প্রগতিবাদী সংস্থা বা সেবাপ্রতিষ্ঠানের কাজ করে সময় নষ্ট করার জন্য ব্যাকুল হয়ে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে পরামর্শ নিতে ছুটে আসেন। সন্তান বা ছাত্র বিপথগামী হয়েছে, অস্বাভাবিক বা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়েছে মনে করে আতংক বোধ করেন। তাঁরা নিজেদের সৃষ্ট সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন, কিশোরকে অযৌক্তিক ভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করে তাদের বিদ্রোহী বা নিউরোটিক করে তোলেন। এই সব শিক্ষক-অভিভাবকের সংখ্যা নগণ্য নয় বলেই আপাতদৃষ্টিতে কৈশোর সমস্যায় অপ্রাসংগিক এত কথা লিখতে হল।

যে কৈশোর সংকটের কথা ভেবে এক শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত, সে সংকট কিশোর-মনের সংকট নয়; পরিবৃত্তিকালীন সামাজিক সংকট এবং কিছু কিশোর মনে তার প্রতিফলন।

গণমাধ্যম সমস্যা :—গণমাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্রের, রেডিও এবং টেলি-ভিশনের প্রভাব কিশোর মানস গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য কিশোরদের জন্য পত্রপত্রিকা ও কমিকস্-এর প্রভাবও কম নয়। আমাদের দেশে এখনও পশ্চিমী দেশের মত ঘরে ঘরে টেলিভিশন আসেনি; চলচ্চিত্রকেই আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কিশোর মনকে সাধারণত যে সব ছবি

বেশিমাত্রায় আকর্ষণ করে (বা আকর্ষণ করা উচিত)—তা হচ্ছে উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও উদ্ভট কল্পনামূলক ছবি। সব কিশোর যেমন একই ধরনের খাদ্য পছন্দ করে না, তেমনি গল্প ও চলচ্চিত্রের বেলাতেও বলা চলে না সব কিশোরের পছন্দ একরকমের হবে। অন্য সব মাধ্যমের চেয়ে চলচ্চিত্রের প্রভাব নিয়ে বেশী সংখ্যক সমীক্ষা হয়েছে। কাজেই মোটামুটি বিশেষজ্ঞদের অভিমত পেশ করা যেতে পারে। সমীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে চলচ্চিত্র জনমত, গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভংগী ও আচরণকে প্রভাবিত করে। একটি দুর্বৃত্তদলের কার্যকলাপের ছবি দেখার ফলে ছাত্রদের জুয়াখেলার কুফল সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয় এবং তারা জুয়াখেলার নিন্দা করে। আবার দেখা গেছে, দরদের সংগে চলচ্চিত্রে রূপায়িত এক জার্মান পরিবারের চিত্র ছাত্রদের জার্মান সম্পর্কিত সহানুভূতির মনোভাব বৃদ্ধি করে। সমীক্ষাটি এল. এল. থার্সটনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং এর উল্লেখ পাই জে. এম. স্টিফেন্স্ রচিত ১৯৬২ সালে নিউইয়র্কে প্রকাশিত 'এডুকেশনাল সাইকোলজি' বইটিতে (পৃ ৬০৪)। ঐ বইটিতে আরো কিছু সমীক্ষার উল্লেখ আছে। তা থেকে জানা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রপক্ষের বিভিন্ন শক্তির প্রতি সুস্থ ও প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সৈন্যদের যে সব ছবি দেখানো হয়, তার প্রভাবে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয় না। লেখক মন্তব্য করেছেন, শিশু ও কিশোরদের মানসিক পরিবর্তনে নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্রের ভূমিকা আছে; কিন্তু বড়দের বেলায় সে কথা বলা চলে না (Lindzey G., ed. Hand Book of Social Psychology Addison Wesley, 1954, Chap 27—reported by Stephens, op. cit) শিক্ষকের বক্তৃতা বা পুস্তকপাঠের চেয়ে চলচ্চিত্রের আবেদন অনেক গভীর ও মর্মস্পর্শী। শিশু ও কিশোররা চলচ্চিত্রে দেখা ঘটনা অনেকদিন অবধি মনে রাখে। দেখবার সময় তারা বিচলিত ও প্রভাবিত হয়, চলচ্চিত্র দেখার পর ঘুম বিঘ্নিত হয়, স্বপ্নে তারা ঐ ঘটনা ও সম্পর্কিত আনুষংগিক অনেক কিছু দেখে। রেডিওতে নাটক শোনার পর, থিয়েটার দেখার পরও শিশুদের মনে প্রতিক্রিয়া ঘটে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, (Ibid) কিন্তু তীব্রতা বোধ হয় কম।

সমীক্ষার সবখবর আমাদের জানা নেই। যতটুকু পড়েছি বা জেনেছি, তা থেকে নিঃসংকোচে বলতে পারি যে এই প্রভাবের চরিত্র ও মাত্রা সম্পর্কে এবং কি ধরনের চলচ্চিত্র কোন ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, (কেন দুর্বৃত্তদের কার্যকলাপের ছবি দেখে কিশোরদের মনে জুয়া ও আনুষংগিক দুর্বৃত্তসুলভ

ক্রিয়াকলাপের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় না, বরং উল্টোটা ঘটে) তা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি। লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিবরণ শোনাতে পারি যা ঠিকবিপরীতধারণার সৃষ্টি করবে। শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী ও লেখকের কয়েকবছর আগে ট্রেনের কামরায় দুটি যুবকদ্বারা আক্রান্ত হবার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। তারা টাকাপয়সার লোভে আক্রমণ করেনি, মৈত্রেয়ী দেবীর হাতের সোনার চুড়ি, গলার হার ইত্যাদি তারা সুযোগ সত্ত্বেও অপহরণ করেনি। বছরখানেক পরে তারা ধরা পড়ে এবং পুলিশের কাছে জানতে পারি যে তারা বেশ ধনী পরিবারের সন্তান; চলচ্চিত্রে খুন জখমের ছবি দেখে তারা দুঃসাহসিক কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। ঐটেই তাদের প্রথম 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার', এর পরও দু-চারটে ঐ রকম কাজ করেছে। স্রেফ্ রোমাঞ্চকর 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার' করার প্রেরণা জুগিয়েছে চলচ্চিত্র। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক কিছু কিছু ছবি দেখানো হয় পর্দায়। যৌনব্যাধি-নিবারক এমনি একটা চলচ্চিত্র দেখে লেখকের কাছে এবং তার পরিচিত চিকিৎসকের কাছে যৌনরোগের ভয়ে আক্রান্ত কিছু যুবক ছুটে এসেছিল। প্রথম অভিজ্ঞতা থারষ্টনের সমীক্ষার দুর্বৃত্তদের ছবি দেখার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বিতীয়টি রোগাতংক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে নিঃসন্দেহে, যারা আতংক দূর করার জন্য চিকিৎসার্থে এসেছিল তারা যৌনব্যাধি হতে পারে, এমন কোনো কাজ করেনি। ছবিটি ভয় ছড়িয়েছে, কিন্তু রোগ নিবারণে খুব সফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। কিভাবে রোগ সংক্রমিত হতে পারে, কি কাজ করলে এই ব্যাধির সম্ভাবনা আছে—সেশিক্ষা ছবিটি দিতে পারেনি। দিতে পারলে যুবকদের মনে অকারণে ভয়ের ভাব আসত না। দর্শকদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা, মস্তিষ্কের টাইপ, তখনকার মনের অবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব সৃষ্টি করবে চলচ্চিত্র। শিশুরা ভূতের ভয় পায়, তবুও বারবার ভূতের গল্প শুনতে চায়, ভূতের ছবি দেখতে চায়। কিশোর দুষ্কৃতকারীরা (Juvenile delinquents) 'কমিক্‌স' দেখতে ভালবাসে, সুস্থ কিশোর কমিক্‌স দ্বারা প্রভাবিত হয় না। (Lewin H. S., Facts and Fears about the Comics, Nations sch, 1953. 52, 46-48 and Hoult T. Comic Books and Juvenile Delinquency, Sociological Soc. Res, 1949, 33, 279-84, quoted by Stephens, o. p. cit)। শিশুরা গল্প শুনে ভয় পায়, না ভয় পাবার জন্য গল্প শুনতে চায়, ভয়ের চলচ্চিত্র ভয় বাড়ায় না ভয় দূর করে? ভয়ের মূর্ত কারণ বা

বস্তুর চেয়ে বিমূর্ত ভয়কে (কারণহীন ভয়) ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই বেশি ভয় করে। কেন ? কিশোর দুর্বৃত্তরা দুর্বৃত্ত বলে 'কমিকস' পড়তে চায় ; না 'কমিকস' পড়ার ফলে দুর্বৃত্ত হয় ? এসব প্রশ্নের যেমন ঠিকমত উত্তর দেওয়া কঠিন, তেমনি কঠিন কিশোর মনে চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশনের প্রভাব নির্ণয় করা। অনেকগুলো পরিবর্তনশীল উপাদানকে (variable components) নিয়ন্ত্রিত করে কিশোর মনের উপর পরিবেশের যে কোনো একটি উদ্দীপকের প্রভাব নির্ণয় করা সহজ নয়। গণমাধ্যম সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব নয়। তবু সব রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা এই গণমাধ্যম ও অভিভাবনের সাহায্যে তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজের উপযোগী মানসিকতা গঠনে তৎপর। আমরাও এইসব মাধ্যম—বিশেষ করে চলচ্চিত্রকে আশ্রয় করে অস্পৃশ্যতা দূর করতে চাই, আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক বিরোধের অবসান চাই, পণপ্রথা রহিত করে নারী জাতিকে সম্মান দেখাতে চাই, সাম্প্রদায়িক সন্দেহ মনোমালিন্যের অবসান ঘটাতে চাই। সব রকমের জাতীয় উপজাতীয় ঘৃণা বিদ্বেষ সংস্কার দূর করে সংহতি আনার ব্যাপারে গণ-মাধ্যমকে ব্যবহার করতে চাই। অবশ্য আমাদের পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতেই হবে কিশোরদের উপর। কেননা, আমরা দেখেছি যে চলচ্চিত্রের মত শক্তিশালী গণমাধ্যমও বড়দের মনে নাড়া দিতে পারে না। কিশোরমন সম্পর্কে সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। কৈশোর সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে, সমাধান খুঁজতে হয়েছে। তা থেকে এইটুকু জ্ঞান লাভ করেছি যে কিশোরদের মধ্যে সংবেদনশীল ও বুদ্ধিমান যারা তাদের গণমাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষিত করে, আঞ্চলিক, জাতি ও ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণতা ও সংস্কার দূর করতে হলে তাদের প্রাথমিক বাধা প্রথমে দূর করার চেষ্টা করা বিধেয়। সে বাধা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব। যদিও ষাটের দশকের শেষ ও সত্তর দশকের প্রথম দিকের মত এই অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাবে প্রকাশ্য পিতৃদ্রোহিতা গুরুদ্রোহিতায় দরুণ ধ্বংসাত্মক কাজে তারা জড়িয়ে পড়ছে খুব কম ক্ষেত্রে। কিন্তু তাদের ভয় ও অবিশ্বাস কাটেনি। বড়দের, মানে সমাজপতি দলপতিদের ওপর তারা আস্থা রাখতে পারছে না। শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের যে-সব পদ্ধতি এতদিন অনুসৃত হয়েছে, সেই সব পদ্ধতিকে নতুন করে পরীক্ষা দরকার। আমার নিজস্ব চিন্তাভাবনার ভিত্তি কিন্তু খুবই সীমিত অভিজ্ঞতা ও যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন। তা থেকে কোনো

সামান্যীকরণ করা চলে না, আমি জানি। কিন্তু বলা দরকার যে, একই ধরনের সমস্যা আমি দেখেছি নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর কিশোরদের মধ্যে ও পল্লীগ্রামের অল্পশিক্ষিতদের মধ্যে যারা মাত্র এই প্রজন্মে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছে, আর দেখেছি কোলকাতার পুরনো বস্তির কিশোরকিশোরীদের মধ্যে যারা দু-এক বছর পুরসভার বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেছে। এই একই মনোভাব দেখেছি নগরপ্রান্তিক জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনির কিশোরদের মধ্যে। যারাই নাগরিক সভ্যতা সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র জাতীয় গণমাধ্যমের সংস্পর্শে আসছে তাদের সকলের সমস্যাই যেন একরকম হয়ে যাচ্ছে। পল্লীবাসী চাষীর ছেলেকে দেখেছি দলগড়ে যাত্রা করতে গিয়ে দলের শৃংখলা রাখতে না পেরে নগরের সেই হিস্টিরিক মায়ের সন্তানটির (এই অধ্যায়ের প্রথম দিক দেখুন) মত একই সমস্যায় পড়েছে : বিষন্নতার পরিবর্তে উত্তেজনা (ম্যানিক) প্রকাশ করে নিজের সহকর্মীদের সংগে বিচ্ছেদ-বেদনা ব্যক্ত করছে। বস্তির এক ১৩।১৪ বছরের কিশোরী পুরসভার বিদ্যালয়ের সব থেকে উঁচু শ্রেণীতে প্রথম হয়ে প্রোমোশন পাবার কিছুদিনের মধ্যে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা মেটাতে মধ্যবিত্তের রোমান্টিক প্রবণতায় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আর একটি বস্তির কিশোর—বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান—অভিভাবকের অবৈধ অসামাজিক পেশায় দীক্ষিত হতে অস্বীকার করার পর হিস্টিরিক ফিটে ভুগছে। কিশোর মনে—প্রায় সব আর্থিক স্তরে—প্রায় একই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে চলেছে।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও সার্বিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া কোনো কিছু হবে না বলে মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও অন্যান্য সমাজহিতৈষীরা নিশ্চয়ই চুপচাপ থাকতে পারবেন না। হতাশা, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা-ভাবের ভীতি দূর করতে অন্তকিশোররা বয়স্কদের মত 'সিনিক ও স্টোইক' হয়ে যাচ্ছে, নিষ্ক্রিয়তা তাদের পেয়ে বসেছে। যারা দুষ্ক্রিয়, অসুস্থ ও অপরাধী তাদের ভার প্রধানত চিকিৎসক ও পুলিশের। কিন্তু যাদের সমস্যা সদ্ভাবী ও বড়দরের নয়, যাদের উৎসাহজনক অভিভাবন, যুক্তিভিত্তিক আলোচনা এবং শিক্ষা ও পরামর্শের সাহায্যে অনেকখানি বদলানো যায়, তাদের জন্য সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। শিক্ষায়তন এবং পরিবার কতটা অনুমতিদায়ক (permissive) ও নরম হবে, আগের দিনের কঠোর শৃংখলা বজায় রাখা ও শাস্তিদানকে কতটা পরিবর্তন পরিবর্জন করা হবে, পাঠ্যসূচিতে কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার

পাবে, এ-নিয়ে বিশেষ চিন্তা দরকার। কিশোর মনথেকে—এই শ্রেণীবিভক্ত দ্বন্দ্বাকীর্ণ বঞ্চনাভিত্তিক সমাজের ভয় ও নিরাপত্তাভাব দূর করে তাদের পরার্থবাদে উদ্বুদ্ধ করা খুব কঠিন সমস্যা বলে মনে করি না। এখনও তাদের মস্তিষ্ককোষ নমনীয় ও পরিবর্তনসাধ্য। আর কয়েক বছরের মধ্যে রূঢ় বাস্তবের সংগে যখন সংস্পর্শে আসবে, তখন মস্তিষ্ককোষের পরিবর্তন আর সহজসাধ্য থাকবে না। স্বভাবী, সাধারণ কৈশোর সমস্যার বেশির ভাগেরই সমাধান সম্ভব। প্রয়োজন নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনা। এই কিশোরদের মধ্যে হিস্টিরিক উন্মাদনা এনে সাময়িকভাবে উদ্বুদ্ধ করার কথা বলছিনা। কোনো গঠনাত্মক কার্যকলাপের পরিকল্পনা এদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার জন্য কোন বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, এ নিয়ে সমীক্ষা ও চিন্তাভাবনায় অবিলম্বে ব্রতী হওয়া দরকার। আমাদের ভেবে দেখা দরকার গণমাধ্যমে প্রচারের বিষয়বস্তুতে কি ভাবে নতুনত্ব আনা যায়। কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে? আজকের দিনের সবচেয়ে মারাত্মক—মানবপ্রজাতির সকলের পক্ষে মারাত্মক ও সমান গুরুত্বপূর্ণ—সমস্যা, আমার মতে, পারমাণবিক ও জীবাণুযুদ্ধের সম্ভাবনা এবং সেই সম্ভাবনাজাত ভয় দূর করার সমস্যা। আমাদের দেশের কিশোরদের মনে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয় নেই। তবে খুব জোর করে একথা বলা যায় না। এ-নিয়ে কোনো বিশেষ সমীক্ষা হয়নি, যার ভিত্তিতে বলা চলে যে এ ভয় আছে কি নেই। তবে আমার মত অনেকেই স্বীকার করবেন যে ভয়ের রোগী বেড়েছে। একসময়, যখন পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে গণমাধ্যম, বিশেষ করে পত্রপত্রিকায়, খুব আলোচনা চলতো, তখনো মনে হয়, প্রত্যক্ষভাবে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়-পাওয়া রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেনি। এখন তো পারমাণবিক যুদ্ধের ভয় নিয়ে আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম। তবে শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই জানেন ও বোঝেন যে এই সম্ভাবনা কাল্পনিক নয়, বাস্তব। এবং পারমাণবিক যুদ্ধ যেখানেই ঘটুক, আমরাও পারমাণবিক বিস্ফোরণের তাপ ও নিউট্রন বোমার ঝলসানি থেকে নিস্তার পাব না। এ-ভয় যদি বাস্তব হয়; যুদ্ধের সম্ভাবনা সত্যিই যদি বেড়ে থাকে তবে সেই ভয় সম্পর্কে, সেই সম্ভাবনাকে অবহিত করাই তো যুক্তিযুক্ত। অবহিত করার ফলে, মনে হয়, নতুন করে কিছু কিশোর হয়তো আতংকগ্রস্ত হয়ে মনোরোগচিকিৎসকদের চেম্বারে ভিড় বাড়াবে; কিন্তু কিশোর মনের চাপা অসন্তোষ কমবে; কেননা, বিশ্বরাজনীতির সংগে পরিচয় হবার ফলে তার

কল্পনার পরিধি বাড়বে, দেশজ সমস্যার সংগে আন্তর্জাতিক সমস্যার সম্পর্ক কিছুটা বুঝতে পারবে। ক্ষমতার লড়াই-এ জয়ী হবার আশায় ও ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে মানুষ কিভাবে অন্ধ হয়ে মানবপ্রজাতির সাধারণ ও সর্বজনীন স্বার্থ উপেক্ষা করতে পারে সেই রূঢ় সত্যটা বুঝতে পারবে। দেশে দেশে ভাষা, সংস্কৃতি, আলাদা হওয়া সত্ত্বেও সব মানুষেরই মধ্যে সাধারণ ও অতি শক্তিশালী প্রবৃত্তি প্রজাতি, সংরক্ষক প্রবৃত্তি (যার জৈবরূপ কাম; সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম) বিদ্যমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণভিত্তিক পার্থক্য সহজাত নয়, গঠিত; পরবর্তীকালে সমাজের ক্ষমতাভোগী শ্রেণীকর্তৃক অগ্রগতির সুবিধার জন্য দৃঢ়ীকৃত ও সমৃদ্ধ। এ-ছাড়া নানা ধরনের সর্বজনীন ও কল্যাণমূলক চিন্তা এবং যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ বন্ধ হলে মানুষের অন্নবস্ত্র সংস্থানের সমস্যা আয়ত্তাধীন হবে—এই জ্ঞান কিশোরের বহু জটিল সমস্যা সহজ করবে। কৈশোর সমস্যার দেশ ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে ও থাকবে, কিন্তু আমার মনে হয় ক্রমশ সবদেশের কিশোরের সাধারণ সমস্যা—প্রজাতি সংরক্ষণ সমস্যা জোরদার হতে থাকবে। এ-ছাড়া বিশ্বভ্রাতৃত্বের—সদ্য কিশোর থেকে বয়স্ক, সব মানুষই সাম্প্রতিক কালে দেখছে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

গণমাধ্যম ছাড়াও রোমান্টিক উপন্যাস-গল্প, দুঃসাহসিক অভিযান, বিপ্লবকাহিনী, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকাহিনী এবং যৌন-কাম উদ্দীপক নিষিদ্ধ পুস্তক ও ছবি কিশোর কিশোরীকে মনের দিক থেকে প্রভাবিত করে। নিষিদ্ধ পুস্তক (কাম-উদ্দীপক) ও ছবির প্রভাব পরের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

অস্বভাবী সমস্যা

যৌন সমস্যা : এই সমস্যা অনেকাংশে স্বভাবী, কিন্তু কিছু দিক থেকে আবার অস্বভাবী। তাই এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি। বয়ঃসন্ধি ছেলেমেয়ে উভয়ের কাছেই নতুন অনুভূতি। কৈশোর প্রাপ্তির আদি পর্বে, যৌন গ্রন্থি, যৌনাংগ ইত্যাদি যখন অপরিণত কিন্তু পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন থেকেই আদি কিশোরের মনে জাগে অদ্ভুত সংবেদন, আদি কিশোরী নিজের দেহে নতুন একজনকে আবিষ্কার করে। দুজনেই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কি ঘটছে ঠিক বুঝতে পারে না। এই পর্বে যৌনভাব কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ অভিমুখী নয়, কোনো বিশেষ যৌনক্রিয়ায় রত করায় না। ক্রমশ মধ্যকৈশোরে পৌঁছে কিশোরকিশোরী নিজের নিজের দেহের পরিবর্তন আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এবং দেহের নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হয়। ছেলেরা চুল সম্পর্কে, পোষাকআসাক সম্পর্কে অন্যদের দেখাদেখি আগের থেকে বেশি যত্ন নিতে শুরু করে; মেয়েদের পরিবর্তন আরো পরিদৃশ্যমান বলে তাদের শরীরের দিকে আরো বেশি নজর পড়ে। এক দেশ থেকে অন্যদেশে গেলে যে বিস্ময় আনন্দে মানুষ উদ্বেল হয়, বয়ঃসন্ধিকালে অনেকটা সেই ধরনের আনন্দ উল্লাসের প্লাবন দেহ-মনকে ভাসিয়ে নিতে থাকে। দুজনেরই দেহে মনে নতুন শক্তির সঞ্চারে তারা আগের থেকে বেশি কলহপ্রিয় ও আক্রমণমুখী। কোনো কিছু

সহ্য করা পরাজয়ের সামিল মনে হয়। পিতামাতা, গুরুজনদের ডাকে আগের মত সাড়া দেয় না, তাঁদের সংগে বশংবদ আচরণ করে না, অবাধ্য হওয়াটা আত্মপ্রকাশের, নিজেকে জাহির করার একটা উপায় বলে গণ্য করে। সমবয়সী ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে, কিন্তু সমবয়সী মেয়েদের প্রতি ততটা বাড়ে না বরং এক্ষেত্রে কিছুটা অস্বস্তি ভাব প্রকাশ পায়। মেয়েদের পেছনে লাগে, অযথা বিরক্ত করে, ঝগড়া বাধায়, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই এসব ব্যাপারে যৌন আকর্ষণ দেখা যায়। ক্রমশ কিশোরকিশোরীর দেহে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির পরিণতির সংগে সংগে যৌবনোদ্গমের—প্রধান (primary) ও আনুষঙ্গিক অপ্রধান (secondary) সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মধ্য কৈশোরে শেষ দিক থেকেই শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন সম্পৃক্ত মানসিক পরিবর্তনও ঘটতে থাকে। রজঃস্বলা হবার পর বেশির ভাগ মেয়ের মেজাজ ও আচরণে অনেকটা নম্রতা আসে, তারা ধীর-স্থির ভাবে চলাফেরা করে, যুবতীদের হাবভাব অনুকরণ করে অনেকটা ভারিক্কি হবার চেষ্টা করে। আদি কৈশোরের আগ্রাসন ভাব মধ্য কৈশোরের শেষের দিক থেকেই কমতে আরম্ভ করে; ছেলেমেয়েরা আত্মসংযম ও সবরকমের প্রক্ষোভ প্রশমনে সচেষ্ট হয় অন্তকৈশোরে। যৌনভাব এখন আর অনির্দিষ্ট আকারশূন্য নয়। ছেলেমেয়ে দুজনেরই আদি ও মধ্য কৈশোরের সমকামিতা প্রবণতা হ্রাস পায় এবং ছেলেরা মেয়েদের প্রতি ও মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

এসবই স্বভাবী মনোভাব ও আচরণ, সাধারণত এই রকমই ঘটে। অবশ্য বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতির পারিবারিক প্রথা, শিক্ষার মান ও আর্থিক সংগতি দ্বারা এইসব পরিবর্তন প্রভাবিত—এ কথা অনেকবারই বলা হয়েছে। কিন্তু এইসব স্বাভাবিক পরিবর্তন, বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির দরুণ যে সব শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে জ্ঞান অনেকেরই থাকে না। প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর না পেলে বা কোনো ভয়ের কথা শুনলে কিশোর মনে এই সময় ভয় দেখা দিতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে এর পরিণামে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন অভিভাবক।

অজ্ঞতার দরুণ সমস্যা :—সব থেকে বেশি সমস্যা দেখা যায় ছেলেদের বীর্য নিঃসরণকে কেন্দ্র করে। শুক্রপাতের দরুণ ভয় পাওয়ার কারণ পারিবারিক ও সামাজিক গোঁড়ামি। যৌন শিক্ষা আমাদের দেশে খুব কমক্ষেত্রেই কিশোরকিশোরীরা লাভ করে। পারিবারিক চিকিৎসার ও ব্রহ্মচর্য-সংক্রান্ত বইতে এবং পঞ্জিকায় ও বিজ্ঞাপনে বীর্য বা শুক্র সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি

হবার মত অনেক কথা থাকে। বিন্দুধারণ জীবনকে দীর্ঘায়িত করে এবং 'মরণং বিন্দুপাতেন'—এই ধরনের নীতিবাক্য পড়ে বহু কিশোর ভয়ে পাগলের মত হয়ে গেছে—এখবর সব চিকিৎসকই দিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে এ বিন্দু শুক্রবিন্দু। এই ভয়ের সুযোগ নিয়ে অর্থ রোজগার করার মত কিছু নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তি লেনিন সরণি ও বড়বাজার অঞ্চলে ফাঁদ পেতে বসে আছে এবং সংবাদপত্রে কৌশলে, হ্যান্ডবিল ইত্যাদিতে খোলাখুলি শুক্র-বিন্দু স্খলনের ভয়াবহ ছবি তুলে ধরে অনেক কিশোরকে আরো ভয় পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। দ্বিজত্বের (উপবীত ধারণের) সময়-পাওয়া আংটি বেচে এদের কাছে চিকিৎসা করার পর প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া এবং আরো অনেক বেশি ভয় পাওয়া কয়েকটি কিশোরের কথা এই সূত্রে মনে পড়ছে। বাবার পকেট বা মায়ের বাক্স থেকে টাকা চুরি করে এইসব হাতুড়েদের দিয়েছে এমন অনেক ছেলের সংগে পরিচয় ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে চুরি ধরা পড়ার পর অভিভাবকের ভর্ৎসনা ও প্রহারের ফলে এরা বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। কিছু কিশোর-নিরুদ্দেশের কারণ বীর্যপাতের ভয়। এই ভয়ের দরুণ এক সমস্যা থেকে আর এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই ভয় মনে লালিত করে যারা বড় হয়ে ওঠে, বিয়ের পর প্রায়ই যৌনশক্তির অভাবের (Impotency) জন্য এরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। এখানেও হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে আগে যায় যুবকেরা, কেননা তাদের বিজ্ঞাপন এদের আকৃষ্ট করে এবং ব্যাপারটা তারা গোপন রাখতে চায়। ভুল চিকিৎসায় ও কু-চিকিৎসায় আরো ক্ষতি হবার পর অবস্থা যখন অতি শোচনীয় হয়ে ওঠে তখন এরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে আসে। এদের অনেকে হয়তো বুঝতে পারে না কোন ধরনের ডাক্তার এই ধরনের চিকিৎসা করেন। আবার অনেকে পরিবারের চেনাজানা ডাক্তারকে লজ্জায় এড়িয়ে চলে। হাতুড়েদের কাছে যাবার আগে সংবাদপত্রে ও অনেক মর্যাদাশালী সাপ্তাহিক মাসিকে বিজ্ঞাপিত 'অব্যর্থ' ওষুধ খেয়ে নিজেরা নিজেদের চিকিৎসার চেষ্টা করেন। এই সব ওষুধের বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্য সরকার ও সমাজনেতাদের আরো সচেষ্ট হওয়া উচিত। হাতুড়ে ডাক্তারদের চিকিৎসা বন্ধ করার জন্য ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনে বিশেষ ফল হয়নি। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আন্দোলন আরো জোরালো হওয়া দরকার।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের দায়িত্ব এ বিষয়ে অনেক বেশি। তাঁদের অনবধানতার জন্য এবং 'যৌন' কথাটিকে তাঁদের অভিধান থেকে

বাইরে রাখার অভ্যাস ও সংস্কার পরিত্যাগ না করার জন্য কত কিশোর যে ক্ষতিগ্রস্ত সে খবর তাঁরা রাখেন না বা সে খবরে তাঁদের কোনোরকম আগ্রহও নেই। অভিভাবকরা বোধ হয়, তাঁদের ছেলের ব্যাপারটা একটা ব্যতিক্রম এই মনে করে তুষ্ট থাকেন। অবশ্য একথা বলা উচিত, গত দুই দশকে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। আগের তুলনায় বীর্যপাত ভীতি কিয়ৎপরিমাণে কমেছে।

অজ্ঞতার আর এক নিদর্শন হস্তমৈথুন সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা। কিছু বিজ্ঞান পত্রপত্রিকা এখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে; দৈনিক পত্রিকাতেও অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে; তা সত্ত্বেও, আগের তুলনায় কম হলেও এ বিষয়ে অজ্ঞতা রয়েই গেছে। অন্য দেশের তথ্যের সংগে আমাদের দেশের তথ্য হুবহু মিলবে, একথা বলছি না। কিছুপার্থক্য থাকবেই। তবুও কিন্‌সে (Kinsey) ও সেম্‌মেনস এ্যাণ্ড সেম্‌মেন্‌স (Semmens and Semmens) কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত কিশোর-হস্তমৈথুন সম্পর্কিত তথ্য আমরা অনায়াসে মেনে নিতে পারি। কিন্‌সের (Kinsey A.C. et. al. Sexual Behavior in Human Male, Philadephia, Saunders, 1948 and Sexual Behavior in Human Female, Philadelphia 1953) সেম্‌মেনস এ্যাণ্ড সেম্‌মেনসের, (Semmens J. P & Semmens J. H, Sex Education of Adolescent Female : Ped. Elin. North America, 19,765,1972) এবং মাস্টারস এ্যাণ্ড জনসনের (Masters and Johnson, Human Sexual Response, 1966) সমীক্ষালব্ধ তথ্যের মধ্যে খুব বেশি অমিল নেই। আমরা মোটামুটি ধরে নিতে পারি কিশোরদের মধ্যে শতকরা অন্তত নব্বই জন, কিশোরীদের পঞ্চাশজন হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন। মেয়েদের সংখ্যা অনেকের হিসেবে আরো কম। অন্তকৈশোরে মেয়েদের এই অভ্যাস বৃদ্ধি পায়। এই অভ্যাসকে কেন্দ্র করে ছেলেদেরই আতংকে অভিভূত হতে দেখা যায়। পড়াশুনায় মন বসছে না, পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে, খালি বাইরে বাইরে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে—এইসব অভিযোগ নিয়ে মধ্যকিশোরের পিতারা প্রায়ই হাজির হন ডাক্তারের কাছে। প্রথমটায় অস্বীকার করলেও, কিশোর শেষ পর্যন্ত বলে যে সে হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হয়েছে এবং তার জন্যে উৎকণ্ঠা ও ভয়ে ভুগছে; এই বদ্ অভ্যাস ছাড়বার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিফল হয়েছে। বেশির ভাগ ছেলেদের বেলায়, 'হস্তমৈথুন স্বাভাবিক ব্যাপার, তার বাবা দাদাদেরও অনেকের এক বয়সে এই অভ্যাস

ছিল'—এইটুকু বোঝালেই কাজ হয়। ভয় চলে যায়, পড়াশুনোয় মন বসে, গুরুজনদের দিকে তাকাতে বা মেয়েমহলে মিশতে আর সংকোচ বোধ করে না। সময় পেলে অন্তর্কিশোরদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—বীর্য কিভাবে তৈরী হয়, কিভাবে ও কি কারণে বীর্য স্খলিত হয় ইত্যাদি। আমাদের শিক্ষিত সমাজেও অনেকের মধ্যে সেই ভিক্টোরিয়ান যুগের অতি শুচিতার ও এই ব্যাপারে গোপনীয়তার মনোভাব এখনও আছে। এবং কিছু কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের এই মনোভাব বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়; বাধ্যকারী অভ্যাস ও আবেশ জাতীয় রোগ দেখা দেয় (**Compulsive obsessive neurosis**)।

একটি কিশোরকে কিছুদিন আগে তার বাবা আমার কাছে নিয়ে আসেন। বয়স ১৪/১৫, দেখতে ১০/১১ বছরের মত, বুদ্ধির দিক থেকে পেছিয়ে নেই, দু বছর আগেও পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। বছর দেড়েক হল তার স্নান করতে, পায়খানা যেতে, ভাত খেতে এত সময় লাগছে, যে স্কুলে যেতে পারছে না। প্রথমদিকে বাবা তার এই দীর্ঘসূত্রতার জন্য, পায়খানা, স্নানে অযথা সময়ক্ষেপের জন্য তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। আমার কাছে যখন এল, তখন সব ব্যাপারেই তাকে সাহায্য করতে হয়। শৌচকার্য, স্নানের জল মাথায় ঢেলে গা মোছানো, খাইয়ে দেওয়া, জামা কাপড় জুতো পরিয়ে দেওয়ার পুরো দায়িত্ব বাবা নিয়েছেন, তবু সময়মত স্কুলে যেতে পারছে না, পড়াশুনোও করছে না। তার প্রত্যাগতি (**regression**) হয়েছে, যা কিছু এতদিন শিখেছিল তার সব কিন্তু ভোলেনি, শুধু শৌচকার্য, খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড় পরা ইত্যাদি জৈব ও প্রাথমিক অভ্যাসগুলো যেন ভুলে গেছে। লেখাপড়া বা চলাফেরার ব্যাপারে কিছু ভুলেছে বলে মনে হয় না। ঐ কাজ গুলোও ভোলেনি, নিজের হাতে করতে চাইছে না। সব কাজেই ভয়; পায়খানার দরজা খুলে রাখে ভয়ের জন্য। অনেক দিন চেষ্টার পর (কথা বার্তার উত্তর প্রথমদিকটায় দিত না) জানা গেল পায়খানা ও বাথরুমে গেলেই হস্তমৈথুন করার ইচ্ছে হয় বলে সে পায়খানা, বাথরুম খুলে রাখে। সব ব্যাপার বাবার চোখের সামনে হলে তাকে হস্তমৈথুন করতে হবে না—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে পিতার ওপর সব ভার অর্পণ করেছে। একমাত্র সন্তানকে বাবা শৈশব থেকেই সব বিষয়ে প্রশ্রয় দিয়েছেন; এখনও দিয়ে যাচ্ছেন। তাকে এখন চার বছরের শিশু করে ফেলেছেন। পুত্রের হস্তমৈথুনের ভয় দূর করার চেষ্টা এবং পিতার প্রশ্রয়দানের সমালোচনা পিতা-ভালভাবে নেননি।

ছেলের পড়াশুনোয় অমনোযোগ ও পরীক্ষায় খারাপ ফল করছে, উৎকণ্ঠিত পিতা বলেন, 'পর্নোগ্রাফি' পড়তে গিয়ে ছেলে স্কুলে ধরা পড়েছে, স্কুলে আর রাখবেন না বলে হেড্‌মাষ্টার জানিয়েছেন, এখন কিভাবে ছেলেকে শোধরানো যায়? এ ধরনের সমস্যার সমাধানে প্রায়ই চিকিৎসকদের সাহায্য চাওয়া হয়। অশ্লীল পুস্তক ও চিত্র, পত্রপত্রিকায় মেয়েদের অর্ধনগ্ন ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন, 'A' মার্কা চলচ্চিত্র—সবই কিশোরদের কামেচ্ছাকে বাড়ায়। বাড়ীর লোকের কাছে কিশোর নিজের মনের কথা বলতে পারে না, সমবয়সীদের মধ্যে যারা এবিষয়ে অনভিজ্ঞ তাদের কাছে অনেক কিছু শেখে—যা আদৌ তার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। 'সেক্স ইজ ব্যাড'—মেয়ে ও ছেলে সবার মনেই এই সনাতনী ধারণা। কেন খারাপ? কি হয়, বীর্যপাতে, হস্তমৈথুনে? এইসব প্রশ্নের বিজ্ঞানভিত্তিক জবাব পেলে কামেচ্ছা দমন করার নানাবিধ অসফল প্রয়াস ও তদ্দরুন দুশ্চিন্তা ও অপরাধ বোধ থেকে কিশোরকে রক্ষা করা যায়।

কামেচ্ছা দমন করার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে, বীর্য স্খলনের ফলে মেধা স্মৃতি শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, হস্তমৈথুন ছাড়া যাচ্ছে না—ইত্যাদি চিঠির আকারে লিখে নিয়ে অনেক অন্তর্কিশোর চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হয়। পারিবারিক অশান্তি, স্কুলে বা খেলার মাঠে অসাফল্য, স্কুলে বাড়ীতে কড়া শাস্তি ইত্যাদি না থাকলে—এদের জ্ঞান ও সাহস দিয়েই অনেকখানি সাহায্য করা যায়। কিন্তু যারা জীবনের অশান্তি অসাফল্য দূর করতে চায় হস্তমৈথুনের তাৎক্ষণিক আনন্দ উত্তেজনা দিয়ে, তাদের অভ্যাস থেকে মুক্ত করতে হলে দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। তেমনি, যারা কোনো নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে অবৈধ মিলনের কথা ভেবে হস্তমৈথুন অভ্যাস করেছে, তাদেরও অভ্যাস দূর করা খুব সহজ নয়—হস্তমৈথুনের ভয়ের সংগে 'অজাচার'—ইচ্ছার জন্য অপরাধবোধ যুক্ত হয়ে অবস্থা আরো জটিল হয়ে পড়ে।

যৌন সমস্যার আর একটি দিকে দেখা যায় বাছবিচারহীন যৌন সম্ভোগের চেষ্টা (sexual promiscuity)। সাধারণত নিজেদের যৌনশক্তির আংশিক অক্ষমতার দরুন হীনমন্যতার ভাব দূর করার জন্য অন্তর্কিশোর এই যৌনক্রীড়ায় মেতে উঠতে পারে। তবে আমাদের সমাজে এই ধরনের আচরণের সুযোগ সুবিধা খুবই সীমিত। এই আচরণ বা অবৈধ যৌন সংগমে অভিলাষী যারা, তারা খুব কম ক্ষেত্রে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়। আর

যে-সব ভ্রষ্ট যৌন আচরণের কথা মনস্তত্ত্বের পুস্তকে উল্লেখ আছে, তার মধ্যে 'সমকামিতা' (homo-sexuality) সব দেশের কিশোরদের মধ্যেই প্রচলিত। যদিও সমাজে এই আচরণ এখনও অনেক দেশে নিন্দিত ও অপরাধ বলে গণ্য, তা হলেও আমরা জানি প্রাচীনকাল থেকেই এই আচরণ সব দেশের মানুষের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ইংলণ্ডে এই অপরাধের জন্য 'দি পিক্‌চার অফ্‌ ডোরিয়ান গ্রে'র লেখক প্রখ্যাত সাহিত্যিক অস্‌কার ওয়াইল্ড-এর কারাদণ্ড হয়েছিল; এখন কিন্তু বয়স্কদের মধ্যে, দুই পক্ষের সম্মতি থাকলে, সমকামিতা আইনানুসারে দণ্ডনীয় নয়। স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে সমকামিতা প্রায়ই অস্বাভাবিক সমস্যা বলে মনে করা হয় না। বয়স বাড়লে বা বিবাহের পর যদি নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভূতি না হয়, স্বাভাবিক বিপরীতকামিতার জন্য অনেকেই চিকিৎসার জন্য আসেন। তখনই সমকামিতা অস্বাভাবিক সমস্যা হয়ে ওঠে।

অন্য যে-সব ভ্রষ্ট যৌনাচারের জন্য কিশোরদের অভিযুক্ত করা হয় বা চিকিৎসার্থে আনা হয় তার উল্লেখ করাই হয়তো যথেষ্ট হতো, কিন্তু বর্তমানে নারী ধর্ষণ বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে শুনছি, (সংবাদপত্রানুযায়ী) তাই ধর্ষণকারীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিছু বলা দরকার মনে করছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বলাৎকার বা ধর্ষণ যারা করে তারা খেদোন্মত্ত বাতুলতার রোগী। উন্মাদ ছাড়া যারা ধর্ষণ করে, তারাও মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি সুস্থ নয়। তারা কিশোর বয়স থেকেই সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, গায়ে পড়ে কলহ মারামারি করে, আক্রমকের ভূমিকাতে তাদের দেখা যায়। নীতিজ্ঞান, সৌন্দর্যজ্ঞানবর্জিত এই অসামাজিক কিশোর বড় হয়ে সমাজ থেকে প্রায়ই আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নারী সম্ভোগে তারা বয়স বা চেহারার বিচার করে না; আয়ত্তের মধ্যে পেলেই আক্রমণ করে লালসা চরিতার্থ করে। পুরুষকে আক্রমণ করে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে তৃপ্তি পায়, আর মেয়েদের আক্রমণ করে, মেয়েদের কাছে সব চেয়ে মূল্যবান জিনিষ জোর করে আহরণ করে পাশব আনন্দ উপভোগ করে। বাধা পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েটিকে গুরুতর ভাবে আহত করতে বা একেবারে নিহত করতে তারা এতটুকু ইতস্তত করে না। বর্তমানে নারী ধর্ষণের সংখ্যা বেড়েছে কিনা বলা কঠিন; সংবাদপত্রে বেশি সংখ্যক বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধর্ষকামদের মধ্যে কিশোরের সংখ্যা কত তা বলা যায় না। বেকারী, অভাব, অনটন, দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তারের

সংগে সমাজে সব রকমের অপরাধ বৃদ্ধি পায়। ছিনতাইকারী আর নারী-ধর্ষণকারীর মনস্তত্ত্ব অনেকটা এক রকমের। উভয়ক্ষেত্রেই মূল্যবান সম্পদ বলপূর্বক লুণ্ঠন করা হয়। ধর্ষণের ঘটনা বর্তমানে বেশি করে সংবাদপত্রে প্রকাশ হবার কারণ ধর্ষিতার বাধাদানের ফলে গুরুতর আহত হওয়া বা নিহত হওয়া। যেমন নীচুতলার মানুষ আজ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোবল পেয়েছে বলে নীচুতলার মানুষদের ওপর অত্যাচারের সংখ্যা ও মাত্রা বেড়েছে। তেমনি পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েরা তাদের দেহের জবর-দখলের বিরুদ্ধে আজ রুখে দাঁড়িয়েছে বলে তারা দেহের সংগে প্রাণ দিতে বাধ্য হচ্ছে। সংবাদপত্রে তাই ধর্ষণ এখন দামী 'নিউজ' হয়ে উঠেছে।

শিশুকামিতা (pedophilia) কম সংখ্যক কিশোরের মধ্যে দেখা যায়। শিশুর সংগে যৌনসংসর্গ করে যারা কামতৃপ্তি করতে চায় তাদের অপরাধ সমকামীদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। এর ফলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি বলে এই শ্রেণীর যৌনাচার একটা বিশেষ ধরনের সামাজিক সমস্যা। বিশেষজ্ঞের মতে এই সব কিশোর (অনেক বয়স্ক বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের যৌন আচরণ দেখা যায়) আপাতদৃষ্টিতে আত্মজাহিরকারী ও দৃঢ়চেতা; অন্য সব দিক থেকে স্বাভাবিক। তারা বয়োপ্রাপ্তদের সঙ্গে যৌনসংসর্গে বিফল হবার লজ্জা এড়াবার জন্য বালিকাদের ওপর জোরজবরদস্তি করে যৌনলালসা মেটায়। কিছু সংখ্যক শিশুকামী ধর্ষকামের পর্যায়ে পড়ে; তারা মানসিক রোগগ্রস্ত। 'লোলিতা' জাতীয় বই প্রকাশিত হবার পর শিশুকামিতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা জানা যায়নি।

যৌন সমস্যা প্রসঙ্গ শেষ করার আগে সমকামিতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দু'একটি তথ্য জানানো দরকার। কিন্‌সে'র প্রতিবেদনে (Kinsey, O.P. cit-, 1948) বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৪ জন (বয়স্কদের কথা বলা হয়েছে) সমকামী আর ১৮ জন উভকামী। এ-সম্পর্কে সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ, কেননা সমকামিতাকে গৌরবের ব্যাপার বলে কেউ মনে করে না; (যদিও অনেক সমাজে দণ্ডদানযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত নয়) কাজেই অনেকেই সমকামী বলে চিহ্নিত হতে চায় না। সমকামিতা অনেক শহরের শিল্পী-সাহিত্যিকদের—বোহেমিয়ান ও র‍্যাডিক্যাল, দু জাতের শিল্পীর মধ্যেই খুব একটা লজ্জার ব্যাপার নয়। সমকামীরা দল বেঁধে একজায়গায় বাস করে ও নিজেদের একটা আলাদা অব-সংস্কৃতির (subculture) অধিকারী বলে মনে করে। তাদের পোষাকআসাকে, হাবভাবে বৈশিষ্ট্য

আছে। বিপরীতকামিতার ঐতিহ্যক আচরণের বিরোধিতাকে তারা একটা বৈপ্লবিক আচরণ বলে মনে করে (Hooker, E. The Homosexual Community, In Proceedings of the XIV International Congress of Applied Psychology. Vol II : Personality Research, Copenhagen. 1962)। প্যারিসে এমনি দু'একটা সমকামী সংঘের অস্তিত্ব থাকা বিচিত্র নয়। সেই কারণে কিনা বলা যায় না, ফরাসী সরকার সম্প্রতি আইন করেছেন যৌনশিক্ষা সব ছাত্রছাত্রীদের দিতেই হবে। ১১ থেকে ১৪ বছরের কিশোরকিশোরীদের শেখাতে হবে দেহের অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, শারীরবৃত্তিক বিদ্যা, রজঃস্রাব সংক্রান্ত ও গৌণ ও আনুষংগিক যৌনলক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি। আর ১৫-১৯ বছরের অন্ত-কিশোর কিশোরীদের শেখাতে হবে জন্মনিরোধ, গর্ভপাত, যৌনব্যাধি সম্পর্কিত তথ্যাবলী।

যৌনশিক্ষা দিলেই যৌন সমস্যার সমাধান হবে, ভ্রষ্ট যৌন আচরণ থাকবে না—এ বিশ্বাস অবশ্য সকলে পোষণ করেন না। যে সব দেশে যৌনশিক্ষা পাবার সুযোগ সুবিধে আছে সেই দেশের একজন ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ বলেছেন যৌনজ্ঞান বাড়লেই কিশোরকিশোরী যৌনজীবনে নিজেদের ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারবে, এ বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই (Jeffcoate 1975)*।

আমাদের দেশে অজ্ঞতার দরুন যে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, এ বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে ; কাজেই যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা কোনো সন্দেহ পোষণ করি না। তবে শিক্ষা দিতে গেলে দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও অন্যান্য মানসিকতা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদান ও প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আরো সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দরকার হবে এবং ফরাসী দেশের মত কৈশোরকে দুই বা তিন পর্বে ভাগ করে পাঠক্রম তৈরী করতে হবে। আমরা ডাঃ জেফকোটের অভিমত আংশিক ভাবে সমর্থন করি।

---

* "If sex-education was neglected in the past, it may now suffer from over-emphasis and the un-inhibited adolescent who knows everything can be less well fitted for maturity than the demure miss whose innocence thrives on ignorance (Jeffcoate, T.N. Principles of Gynocology, 4th edition, Butterworth, London, 1975—quoted by Nag in Adolescent in India, op. cit.)

যৌন সমস্যা সামাজিক সমস্যারই অন্তর্গত। যৌনবিকার, ভ্রষ্ট যৌন আচরণ ও অন্যান্য যৌন সমস্যা শুধু যৌনশিক্ষা দ্বারা সমাধান-সাধ্য নয়। শরীর-সংস্থানের ত্রুটী, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রোগ, যৌন ব্যাধি, জন্মনিরোধ প্রভৃতির জ্ঞান নিশ্চয়ই কিশোরকিশোরীর পক্ষে দরকারী, কিন্তু নারী-স্বাধীনতার সুস্থ অভিব্যক্তি, নরনারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আরো বহুবিধ সামাজিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া সুস্থ যৌনজীবন,—কিশোরকিশোরী বা বয়স্ক, কারুরই গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। যৌনশিক্ষা শুধু কিশোরকিশোরী নয়, তাদের মাতাপিতারও দরকার। আমাদের সমাজে শিক্ষিত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাও বাচ্চাদের যৌন-অনুসন্ধিৎসা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নন। স্থানাভাবের জন্য নয়, বিবেচনার অভাবের জন্য অনেক বাবা মা প্রাক্ ও আদি কিশোরকিশোরীদের নিজেদের বিছানায় স্থান দিয়ে থাকেন। তারা সকলেই প্রায় পিতামাতার যৌনক্রিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করলেও অনেকটা বুঝতে পারে এবং প্রথমটায় দারুণ ভয় পায়; পরে নিজেরাও ঐ সময়ে ঘুম ভেঙে গেলে খুবই অস্বস্তি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তেজনা বোধ করে। একটি পনেরো বছরের মেয়েকে তার বাবা চিকিৎসার জন্য আনেন তার নিজেকে গুটিয়ে নেবার ও মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলবার জন্য। বাবার সামনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম, হঠাৎ মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে ও নাটকীয় ভংগীতে বাবার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে ইংরিজিতে বলে—"ঐ লোকটা আমার অদ্ভুত আচরণের জন্য দায়ী; ও আর ওর স্ত্রী (সৎমা নয়) আমার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে রাতে যা তা কান্ড করেছিল বছর খানেক আগে, সেই থেকে পুরুষ দেখলেই আমার যৌন উত্তেজনা হয়, আমার নজর শুধু তাদের প্যান্টের দিকে যায়—আমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছি, মানুষ সমাজের অযোগ্য। কিন্তু দায়ী আমি নয়, দায়ী ওরা—ঐ লোকটা আর ওর স্ত্রী।"

উচুদরের চাকরীতে নিযুক্ত ৪০ বছরের উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক একেবারে চুপসে গেলেন। মেয়েটিকে ও তার বাবাকে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝলাম মেয়েটি যা বলেছে তা সত্যি; 'ডিলিউশন' নয়, প্রলাপ নয়। এই তথ্যটি অজানা থেকে গেলে মেয়েটিকে স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী বলে মনে হত। বাবার সামনে, সে যতটুকু জানতো, তার থেকে আরো পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দেওয়া হল। বললাম, সব বাবা মা, ঐ ধরনের কার্যকলাপ করেন, জীবমাত্রেরই ধর্ম এই যৌনমিলন। প্রজাতি

সংরক্ষণ সব মানবমানবীর ধর্ম ; বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার ফলে তার বাবা-মায়ের মিলন সুস্থ, স্বাভাবিক ও বৈধ। জীববিদ্যার বই পড়ে সন্তান উৎপাদনের রহস্য জানার পর বা কিছু বয়স বাড়ার পরে সে নিজেই কল্পনা করতে পারতো এই ধরনের মিলনের ফলেই তার জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। তবে তার বাবামা ভুল করেছেন। সন্তান দুই বছরে পড়ার পর হয় তার শোবার ব্যবস্থা আলাদা করতে হয়, না হয় অন্য কোনো জায়গায় মিলনাকাংখা মেটাতে হয়। এই যৌনজ্ঞান দেবার পর থেকে মেয়েটির অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। বাবার ওপর শ্রদ্ধা পুরোপুরি ফিরে এসেছিল কিনা বলা সম্ভব নয়, তবে পরের বারে পরীক্ষায় পাশ করেছিল ও মানুষের সংগে মেলামেশার জড়তা ও সংকোচ তার পুরোপুরি দূর হয়েছিল।

কিশোরীদের যৌনসমস্যা কিশোরদের তুলনায় কম। সবই প্রায় পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সংগে জড়িত। পৃথকভাবে আলোচনার তবুও কিছুটা প্রয়োজন আছে। কৈশোরে শারীরিক পরিবর্তনের, বিশেষ করে কুচযুগের বৃদ্ধি ও পরিণতির সংগে কিশোরীর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বিশেষ ভাবে জড়িত। সমানবয়স্ক অন্য মেয়েদের তুলনায় তার বৃদ্ধি যদি বেশি হয়, পরিণতি যদি দ্রুত ঘটে, স্বভাবতই ছেলেদের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হওয়ার দরুন তার অহম্মন্যতা বাড়া বিচিত্র নয়। অন্য দিকে যার বৃদ্ধি স্বাভাবিক নয় বা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কম, তার মনে হীনমন্যতার ও লজ্জার ভাব জাগতে পারে। যদি লেখাপড়ায় নাচগানে বা খেলাধুলায় সে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারে তা হলে অবশ্য গোলমাল ঘটবে না। কোনো কোনো চিকিৎসক-সমীক্ষক কিশোরীদের মধ্যে অতি-সংবেদনশীলতা, অস্থিরতা সন্দেহপ্রবণতা, অতি-মাত্রায় বিষাদপ্রবণতা লক্ষ করেছেন অল্প কিছুকালের জন্য ঃ এই সময়ে তারা কিছুতেই পরিবার বা বিদ্যালয়ে বা সমাজের সংগে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে না।(Nag op cit, p 115)। হিষ্টিরিয়া ও আবেশিক নিউরোসিসের (obsessional neurosis), প্রাদুর্ভাব বয়ঃসন্ধিকালে বেশি,—আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে—একথা বলা চলে। কৈশোরান্তে এই সব অভিযোজন সমস্যামূলক উপসর্গ প্রায়ই আপনা থেকে দূর হয়ে যায়।

বর্তমান কালে বড় শহরে, স্কুল কলেজে, ক্লাবে ছেলেমেয়েদের অবাধ মিশ্রণের ফলে যৌন সমস্যা, বিশেষ করে বিবাহ-পূর্ব দৈহিক মিলনের সংখ্যা

বেড়েছে কিনা—এ নিয়ে আমাদের দেশের সমাজতাত্ত্বিকদের হাতে কোনো সমীক্ষালব্ধ তথ্য ও পরিসংখ্যান নেই ; অন্তত এই লেখকের চোখে পড়েনি। কিন্‌সের পরবর্তী সমীক্ষকরা মনে করছেন শিল্পোন্নত দেশে ভ্রষ্ট যৌনাচার বিবাহপূর্ব মিলন, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির মূলে রয়েছে অশ্লীল কাহিনী ও চিত্র, চলচ্চিত্রে অবৈধ মিলনের উত্তেজক কাহিনী। নারী মুক্তি আন্দোলন, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুরুষের বশ্যতা স্বীকারে আপত্তি যে বিবাহ-বহির্ভূত ও বিবাহ-পূর্ব যৌন মিলনের বৃদ্ধির অন্যতম কারণ : অন্তত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এ কথা বলা চলে। কিশোরদের প্রায় শতকরা ৬০ জন ও কিশোরীদের ৪৩ জন সমাজ অননুমোদিত যৌনমিলন উপভোগ করেছেন (Luckey and Nash—A Comparison of sexual attitudes and behaviors in an international Sample - Journal of Marriage & Family, 31 364, 1969)। যৌন ব্যাধির বৃদ্ধি দিয়ে এই যৌনতৃপ্তি বৃদ্ধির প্রমাণ দেওয়া যায়। আমাদের দেশে কিশোরকিশোরীদের যৌনক্ষুধা তৃপ্তি বৃদ্ধির প্রমাণ পেতে হলে হাসপাতালে সিফিলিস, গণোরিয়া জাতীয় যৌনব্যাধির হার কি পরিমাণে কিশোরকিশোরীদের মধ্যে বেড়েছে—তার প্রামাণ্য নথিপত্র ঘাটতে হবে। ডাঃ নাগের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি একটি বড় হাসপাতালের রেকর্ড থেকে বেশ পরিশ্রম করে কিশোরদের যৌন ব্যাধির ব্যাপ্তির ও বৃদ্ধির প্রমাণ পেয়েছেন, আর এও দেখেছেন অবিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে গর্ভবতীর সংখ্যা বেড়েছে। (Nag, Adolescents in India (op cit p. 119)। এই পরোক্ষ প্রমাণ নিঃসন্দেহে খুবই মূল্যবান। এ ছাড়া ঐ বইটির ১২০ পৃষ্ঠায় তিনি মাদ্রাজ ও পুনার দুটি যৌনরোগ সমীক্ষার বিবরণ দিয়ে আমাদের দেশের কিশোরকিশোরীদের মধ্যেও যৌনাবেগ ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলনের সংখ্যা বর্ধমান—এই বক্তব্য পেশ করেছেন। অবশ্য পশ্চিমী দেশের তুলনায় বৃদ্ধির হার তিনি অনেক কম বলে দাবী করেছেন ; কারণ এই যে আমাদের সংস্কৃতি, আচার, ব্যবহার আলাদা। দারিদ্র্য এবং গ্রামীণ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অন্য সব দেশের মত বল্গাছাড়া বাছবিচারহীন যৌনমিলনের প্রতিবন্ধক। এখানে ডাক্তার নাগের সংগে আমরা সব দিক থেকে একমত হতে পারছি না। প্রথমত, যৌনব্যাধি বৃদ্ধির ইতিহাস—এস. টি. ডি. (Sexually transmitted disease) নিঃসন্দেহে যৌন স্বেচ্ছাচারিতার খুবই একটা মূল্যবান পরোক্ষ প্রমাণ কিন্তু এটা

একটা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী নির্দেশক নয় কি? আমাদের দেশে এই সব রোগের চিকিৎসার জন্য আগের দিনে খুব কম লোকই হাসপাতালে যেত। টোটকাটুটকি, গোপন ব্যাধির অব্যর্থ দাওয়াই এবং হাতুড়েদের—যারা 'মিরাক্‌লহিলার' বলে নিজেদের প্রচার করত—তাদের হাতে নিজেদের সমর্পণ করত। আর তখন কটাই বা হাসপাতাল ছিল? জনসংখ্যা কতটা বেড়েছে নিশ্চয়ই ডাঃ নাগ জানেন আর এও জানেন গ্রামীণ কিশোর—যারা মোট কিশোরদের শতকরা ৭০ ভাগ—চিকিৎসিত হবার ইচ্ছে বিশেষ বাড়েনি, চিকিৎসার ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয় গ্রামাঞ্চলে। কাজেই গ্রামাঞ্চলের এই সব হাসপাতালের রেকর্ডএর কোনো বিশেষ দাম নেই—অবাধ যৌন মিলনের পরিমাপক হিসেবে। আগের থেকে চিকিৎসার্থী-সংখ্যা সব রোগেরই বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে আগেও পরিবারের মধ্যে বিধবারা ও দরিদ্র ঘরের মেয়েরা ক্ষমতাশালী পুরুষের কামানলের খোরাক হওয়াটা পূর্বজন্মের ফল বা বিধিলিপি বলে মেনে নিত। ইংরিজি শিক্ষা শহরাঞ্চলের শিক্ষিতদের মধ্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের যৌনশুচিতা আনে। বীর্যপাতের বিরুদ্ধে প্রচার ও বীর্যক্ষয়কে দেহ মনের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করা খুব বেশি দিনের কথা নয়। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত যৌন স্বেচ্ছাচারের ও যৌনভ্রষ্টতার কাহিনীতে ভরপুর। ব্রহ্মচর্য পালন (কিশোর বয়সে) হিন্দু ধর্মের সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম। নাগরিক জীবনে ধনীদের রক্ষিতা থাকত এবং সেটা অসামাজিক প্রথা বলে গণ্য হত না। উনিশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে—বিশেষ করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ থেকে ব্রহ্মচর্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শহরে শিক্ষায়তনে 'পারমিসিভনেস' নিঃসন্দেহে বেড়েছে, 'পর্নোগ্রাফি' বিক্রি একটা লাভের ব্যবসায় দাঁড়িয়েছে। কেননা আমরা ব্যাপারটাকে নিন্দনীয় দোষণীয় মনে করি। কয়েক দশক আগে স্কান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে ভ্রমণকারীরা যৌন উদ্দীপক ছবি ও বই সংগ্রহ করতে যেতেন। এখন ঐ সম্পর্কিত বাধানিষেধ উঠে যাওয়ায়—ঐ দিকে ভ্রমণকারীদের উৎসাহ ও আগ্রহ কমে এসেছে। চলচ্চিত্রের প্রভাব সম্পর্কিত অভিমত আগেই বলা হয়েছে। ডাঃ নাগেরও প্রচলিত ধারণা—আমাদের কিশোরকিশোরীরা আগের তুলনায় যৌনাচারে, ভ্রষ্ট যৌনাচারে অনেক বেশি লিপ্ত—এই ধারণাটা জনপ্রিয় ও মুখরোচক; কিন্তু এ সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে কোনো কিছু বলা যায় না। যৌনালোচনার উপর থেকে নিষেধ শিথিল হয়েছে, গর্ভপাত আইনানুগ হয়েছে, কিশোরকিশোরীর মেলামেশা, অবাধ না হলেও, বেড়েছে—কিন্তু এর ফলে ভ্রষ্ট

যৌনাচার, অসামাজিক যৌনমিলন কমেছে না বেড়েছে—সে সম্পর্কে কোনো অভিমত প্রকাশ করা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে ডাঃ নাগ এদিকে অল্প হলেও কিছু পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন বলে তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। মেয়েরা খোলাখুলি 'সেক্স' নিয়ে কথা বলার সাহস ও স্বাধীনতা পেয়েছে, কিশোরকিশোরীরা নিজেদের জাহির করার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে কৌলীন্যপ্রথা সংক্রামিত শতাব্দীপূর্ব বাংলাদেশে অবৈধ যৌনাচারের যে ব্যাপকতা ছিল তার তুলনায় ভ্রষ্টাচার বেড়েছে কি কমেছে এ নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়তো সম্ভব নয়; কিন্তু আরো বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সম্ভব।

ভ্রষ্ট যৌনাচার, ব্যাভিচার জাতীয় যৌন সমস্যা, আমাদের মতে, সামাজিক সমস্যারই অংশবিশেষ, সাধারণ সামাজিক সমস্যার আলোচনা ও বিশ্লেষণের উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। মানবমন এখন আর প্রধানত ব্যক্তি বা সমষ্টি নির্জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত বলে বেশির ভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন না। মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আগের অধ্যায়ে সাধ্যমত বিচার বিশ্লেষণ করেছি। এবার অভিযোজন ব্যর্থতায় যে সব তীব্র সমস্যা সৃষ্ট হয়, যা নিয়ে সকলেই ভাবিত—সেই কিশোর অপরাধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

অপরাধ-সমস্যা

পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশে, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই দেশে সমীক্ষকের সংখ্যা বেশি, বই, প্রকাশিত হয় বেশি এবং আমাদের বোধ্য ভাষা ইংরিজিতে; তাই এদের খবর আমরা বেশি জানি। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত একটি অতিপ্রচলিত পুস্তক (Coleman—Abnormal Psychology and Modern Life, Indian edition, 1975) থেকে জানতে পারি যে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে অপরাধের জন্য ১৮ বছরের কম বয়সী কিশোর বন্দীর সংখ্যা ১১০ শতাংশ বেড়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাকাতি, ধর্ষণ, খুন—সব অপরাধেরই সংখ্যা বৃদ্ধি দ্রুত হারে ঘটছে। কিশোররা গুরুতর অপরাধের অর্ধেকের বেশির জন্য দায়ী। এক দশক আগে লেখা অন্য একটি মনস্তত্ত্বের পুস্তকে কিন্তু ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও বলা হয়েছে যে কিশোর অপরাধের সংখ্যা দুই

থেকে তিন গুণ বেড়েছে (Stephens, oP. cit., 1962). *আরো বলা হয়েছে কিশোর অপরাধী দলের সংগঠন খুবই শৃংখলাবদ্ধ ও বেপরোয়া, যে কোনো রকমের নিষ্ঠুর ও জঘন্য অপরাধ করতে পিছপা নয়। এও মনে রাখতে হবে পুলিশের ডায়েরীতে সব অপরাধের কথা ওঠে না। আমাদের দেশেই খুনজখম ধর্ষণের ব্যাপার পারতপক্ষে সাধারণ মানুষ পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে না, ভয় এই যে তাহলে তাদের ওপর অত্যাচার আরো বাড়বে। আমেরিকার 'গ্যাং'দের ক্ষমতা ও নৃশংসতা আরো বেশি বলেই মনে হয়, কাজেই সেখানকার সব কিশোর অপরাধ যে পুলিশ জানে না—একথা অনায়াসে ধরা যেতে পারে। অপরাধীর মধ্যে কিশোরদেরই সংখ্যাধিক্য, কিন্তু কিশোরীরা খুব পিছিয়ে নেই। স্কুল-কলেজে শিক্ষকশিক্ষিকাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ১৯৭৬ সালের এফ্. বি. আই-এর হিসেব মত ৭০,০০০ শিক্ষককে প্রহার করা হয়েছে এবং সম্পত্তি ক্ষতি হয়েছে ৬০ কোটি ডলারের (Nag, oP. cit. p. 125). গ্রেট বৃটেন ও অন্যান্য দেশে ঐ একই অবস্থা। কিশোর অপরাধ ও দুষ্ক্রিয়তা নিয়ে যত প্রতিবেদন ইংরেজি ভাষায় বেরিয়েছে, সব গুলিতেই একই সমাচার। এখানে সোভিয়েত রাশিয়ার একটা পরিসংখ্যান দিলে সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্যের সংগে কিশোর অপরাধের সংখ্যার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সে সম্পর্কে আমাদের বিচার বিবেচনা করার সুবিধে হতে পারে।

১৯৭৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার স্থায়ী কমিশনে আলোচ্য বিষয় ছিল কিশোর অপরাধীদের সমস্যা। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশু অপরাধ মূল-গতভাবে কমছে, (শিশু অপরাধীর সংখ্যা ছিল মোট অপরাধীর সংখ্যার, বিভিন্ন রিপাবলিকে তখন ৩·৪ শতাংশ থেকে ৮-১০ শতাংশ)। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন স্থায়ী কমিশনে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল? এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। প্রতিবেদক স্মিরনভ এইভাবে প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন ; "তদন্তের ফলে জানা গেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে কিশোর অপরাধ সংগঠিত হবার কোনো সামাজিক কারণ নেই।... সোভিয়েত ইউনিয়নে

---

* কিছু সমীক্ষক এই মত সমর্থন করেন না। একজন লিখেছেন কিশোর অপরাধীদের সংগঠন দুর্বল ও কিশোরদের মনে একাত্মবোধ ও নিরাপত্তাবোধ আনয়নে অক্ষম (**Yablonsky, The Delinquent gang as a near group.**)

বহুকাল আগেই বেকারী ও সামাজিক বৈষম্য দূর করা হয়েছে, গায়ের চামড়ার রং ও জাতীয়তা যাই হোক্ না কেন, সকল নাগরিকেরই আছে কাজ করার, শিক্ষালাভের ও বিশ্রাম নেবার সমান অধিকার।.....আইনের চোখে সকলেই সমান; তাহলে আইন অমান্য (অপরাধ সংঘটন—লেখক) করার হেতুর উদ্ভব হয় কি করে? অপরাধের হেতুতে আয়নার মত প্রতিফলিত হয় ধীগত পশ্চাৎগামিতা, নিম্নস্তরের সংস্কৃতি, প্রতিকূল পারিবারিক আবাহাওয়া, বিপথগামী কোনো দুষ্ট বন্ধুর প্রভাব ইত্যাদি। কিশোর অপরাধীর সমস্যা দূর করা একটা সামাজিক ব্যাপার। অপরাধের বেশির ভাগের চেহারাটাই এমনি ধরনের যা অচিরেই অনিষ্ট সাধনের চেহারা নিতে পারে।" [মানবমন, ১৯৭৬, ১৫ঃ ১, পৃ ৩৪-৩৫] সংখ্যা যতই আনুপাতিক হারে কম হোক্ (একজন আমেরিকান সাংবাদিক মাইকেল ডেভিডের মতে আমেরিকার মান অনুযায়ী সোভিয়েতে শিশু অপরাধের অস্তিত্বই নেই)—এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, এটাকে গুরুতর সমস্যা হিসেবে গণ্য করা খুবই স্বাভাবিক, কেননা শতকরা অন্তত ৯৫টা অপরাধের জন্য দায়ী সামাজিক পরিবেশ।

আমাদের দেশেও যে অপরাধ বেড়েছে, (এবং অপরাধীদের রেকর্ড দেখলেই জানা যাবে যে এদের অধিকাংশই কৈশোর থেকেই অপরাধের সংগে যুক্ত) এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। যদিও পরিসংখ্যান ও তথ্য অন্য দেশের মত সম্পূর্ণ সঠিক ও বিস্তারিত নয়; তবুও নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য এবং এই পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করেই আমাদের ভাবনাচিন্তা করতে হবে, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণ বের করতে হবে এবং নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনা মত সমাধানের উপায় খুঁজতে হবে। কিছু পশ্চিমী মনস্তাত্ত্বিক পন্ডিত অপরাধীর, তথা কিশোর-অপরাধীর চরিত্র বিশ্লেষণে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, সামাজিক কারণ বিশ্লেষণে ততটা সময়ক্ষেপ করেননি। ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব দিলে, স্বভাবতই ব্যক্তি-মানসিকতা সামাজিক পরিবেশের চেয়ে অপরাধ সংগঠনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হবে। সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্বের কথা বারবার এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, (Coleman, Psychology and affective Behavior, 1970, op. cit, pp258-260) যা থেকে মনে হতে পারে যে, তাঁরা হয়তো পুরনো দিনের 'জন্মঅপরাধী' তত্ত্বে ফিরে যেতে চাইছেন। আসলে হয়তো তাঁদের সে রকম ইচ্ছে নেই। কেননা তাঁরা বলেছেন; এই বিবেকহীন, নিষ্ঠুর নীতিজ্ঞান-

হীন মানুষগুলো অন্য সব দিক থেকেই তো স্বাভাবিক এবং সাধারণের থেকে এদের বুদ্ধি ও শক্তি বেশি ছাড়া কম নয়। উল্লেখ্য যে কোলম্যান ব্যবসাদার, ঝুনো রাজনীতিক, প্রতারক প্রভৃতির সংগে কিশোর অপরাধীদের এক গোত্রে ফেলেছেন। অন্যান্যরা এবং কোলম্যানই অন্য একটি পুস্তকে (Coleman, 1975, op. cit). কিশোর-অপরাধীদের (delinquents) ব্যক্তি মানসিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংগে অন্যান্য দিকও বিবেচনা করেছেন; পারিবারিক ও সামাজিক দিক নিয়েও অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। তার সংগে আমাদের দেশের কিশোর অপরাধবৃদ্ধির অন্তত কিছুটা সম্পর্ক আছে, তাই সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া হল।

ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিত্বগত কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, কিশোর অপরাধীদের ৫ শতাংশ মানসিক প্রতিবন্ধী (Wirt, R.D; Bridge P.F, and Golden J—Delinquency Prove Personalities, The Sociopathic Personality, Minnesota Med, 1962)। বুদ্ধিবিবেচনা কম থাকার দরুন এবং অনেকে কুচক্রীর পাল্লায় পড়ে দুষ্কর্মে রত হয়। এর থেকে অনেক বেশি সংখ্যক অপরাধী মানসিক রোগী, সংখ্যা দশ শতাংশেরও বেশি (Bandura & Walters, Newyork, 1969)। সমাজবিরোধী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কিশোর অপরাধীর সংখ্যা—যাদের বলা হয় 'সাইকোপ্যাথিক ডিলিংকোয়েন্ট, আরো বেশি [Stain & Sarbineta ; Future time Perspective : Its relation to the socialization process and the delinquent role ; J. Cons clin Psychol., 1968, 32 (3)]। এ-ছাড়া আছে মাদকাসক্ত কিশোর অপরাধী—যারা নিজেদের নেশার জিনিষ জোগাড় করবার তাগিদে অপরাধ করে।

এরপর এদের পারিবারিক পরিবেশের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। একদল অপরাধীদের সমীক্ষার ফলে জেনেছেন যে এদের এক চতুর্থাংশ থেকে শতকরা ৫০ জন এসেছে ভাঙা পরিবার থেকে, এদের কারুরই বাড়ীতে বাবা ছিল না। বাবার অভাব এদের সামাজিকীকরণের প্রধান অন্তরায় বলে বিবেচিত হয়েছে [Anderson, Where's Dad ? (Paternal deprivation and delinquency ; Arch. Gen Psycheiat, 1968, 1968 18 (6)]। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত যারা তাদের অপরাধ প্রবণতা বেশি—এই কথা বলেছেন অ্যানড্রি (Andry, Paternal and maternal roles in delinquency, WHO, Publications

1962)। আর একদল সমীক্ষক লক্ষ করেছেন মাবাবার মধ্যে সমাজবিরোধী বা অসামাজিক আচরণের আধিক্য থাকলে কিশোররা অপরাধী হয় [Glueck & Glueck, Family environment & delinquency, (1962)]। মোদ্দা কথা কিন্তু একটাই ঃ শৈশবের পারিবারিক পরিবেশ যে কোনো কারণে অস্বাস্থ্যকর বা নিরানন্দময় হলে কিশোরদের অপরাধী হবার সম্ভাবনা বেশি। সমীক্ষালব্ধ তথ্য, কাজেই এর প্রতিবাদ করা ঠিক হবে না। তবে পারিবারিক পরিবেশে অসুখী হলেই কিশোর অপরাধ অনুষ্ঠানে প্রলুব্ধ হবে—একথা বোধ হয় সব সময়, সব ক্ষেত্রে ঠিক নয়। পরিবেশের অন্যান্য উপাদান ও প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই অপরাধ অনুষ্ঠানে ওদের প্রলুব্ধ করেছে। আমাদের সহজ বুদ্ধি ও পরিবেশ সম্পর্কিত সামান্য জ্ঞান থেকে মনে হয়, পিতামাতার কর্কশ অযৌক্তিক ব্যবহার অথবা যুক্তিহীন নীতিহীন আচরণ কিশোর অপরাধী সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ; বোধ হয় অধিকাংশ দেশ ও সংস্কৃতির পক্ষে এই কারণটি অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো প্রধান। এ-নিয়ে আরো সমীক্ষা, আরো তথ্য সংগ্রহ না হলে, এর থেকে বেশি আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু এ-ছাড়া যে উপাদানের প্রয়োজন সে হল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার এমন অবনতি যার ফলে সমাজকে আর নিজের বলে মনে হয় না। সমাজের অন্য মানুষ ও সামাজিক সম্পত্তির সংগে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই—এবিষয়ে এইসব কিশোর একেবারে স্থিরনিশ্চয়। সে সম্পর্কে অবশ্য কোলম্যান স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে বিচ্ছিন্নতা বোধ ও বিদ্রোহের মনোভাব থেকেই কিশোর অপরাধীর জন্ম।* মারওয়েল এই ব্যাপার নিয়ে ১৯৬৬তে প্রায় ঐ রকম অভিমতই প্রকাশ করেছিলেন; তার সংগে আরো বলেছেন "শৈশবান্তে কিশোরেরা নিজেদের বিশেষ অক্ষম শক্তিহীন মনে করে, তাই নিজেদের জাহির করতে চায় ক্ষোভ, ক্রোধ ও দুষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে।**" "ব্যক্তি নানা কারণে সমাজ বিরোধিতায় লিপ্ত হতে পারে। সমাজের কাছে প্রত্যাশা

---

* Feelings of on unrelatedness and alienation are common to many young people today. However we are referring particularly to middle class youths who are uncommitted to the values of the "establishment" and are at the same time confused about their own values and sense of identity. Often they view the world as a hostile and artificial place.
(Coleman, "Abnormal Psychology and Modern Life 1975 op. cit p 364)

** (See next page 'M')

পূর্ণ না হলে, সমাজের অত্যধিক দাবি মেটাতে না পারলে, সমাজ তার কাছে কোনো কিছু দাবি না করলে, মানুষ সমাজকে অবহেলা করতে শেখে। অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতিতে সামাজিক পরিমন্ডল যখন বিষাক্ত হয়ে যায়, সমাজের প্রতি মানুষ স্বভাবতই বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে।.....আবার আদর্শহীন সমাজবিরোধীর সংখ্যাও কম নয়। জীবিকার তাগিদে ও অন্যান্য কারণে অসামাজিক বে-আইনি ক্রিয়াকলাপে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, অথবা সেই সব রাগী তরুণের দল, বিনা কারণে যারা ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে আনন্দিত, তারাও সমাজের সংগে সংযোগ হারিয়েছে, তারাও বিচ্ছিন্ন। আদর্শবাদীরা হয়তো স্বেচ্ছায় সমাজবিরোধী, আর, এরা আদর্শহীন (কিশোর দুষ্কৃয়-কারী—লেখক) হয়তো সমাজবিরোধী হতে বাধ্য হয়েছে। সমাজকে রুগ্ন মনে করে সমাজের আশ্রয় ত্যাগ করা আর সমাজকর্তৃক আশ্রয়চ্যুত হবার ফল প্রায় একই দাঁড়ায়। একই ধরনের মানসিকতায় এরা সবাই প্রভাবিত (ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, ১৩৮১, পৃ ২৫৮-৫৯) কিশোর অপরাধী বা 'ডিলিংকোয়েন্টরা' সমাজ-পরিত্যক্ত। আমেরিকায়*** পাঠ্যক্রমের চাপ বাড়ছে, 'অটোমেশনের' ফলে ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়নের দরুণ অদক্ষশ্রমের চাহিদা কমছে। এখন তো চলছে শিল্পবাণিজ্যেও পশ্চাদগতি। অনেক কিশোরই স্কুল কলেজের পড়াশুনো, মাঝপথে ফেল করার দরুন ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে অথচ চাকরি

'M' "Adolescents are specially powerless having lost their childhood prerogatives of having others to do for them and not having gained the adult power to do for themselves".....Classic delinquent acts are part of active responses to this situation" (G. Marwell; Social Problems" 1966, Adolescent powerlessness and delinquent behavior—quoted in Social Issues, Spring 1969.

*** Store and Massino, [The Alienated Adolescent. A challenge in the Mental Health Professions, Adolescences, 1969 4(13)] have specifically delineated a "social rejection pattern involving adolescents from lower class suburbs (Coleman, 1975, op. cit).

মিলছে না। এই 'ড্রপ আউট'রা তাই নিজেদের সমাজ-পরিত্যক্ত মনে করছে। এরা বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত, শহরতলীর বাসিন্দা। বাবা ও অভিভাবক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অভাবের দরুন, ইচ্ছে থাকলেও, এই ১৬।১৭ বছরের কিশোরদের কোনো গঠনাত্মক কাজ জুটিয়ে দিতে পারছেন না। মধ্য-কিশোরের দেহমনে অফুরন্ত শক্তি ও উৎসাহর স্রোত বহমান, তার নির্গমপথ চাই। শহরতলীতে ঠিক 'গ্যাং' না থাকলেও আরো 'ড্রপ-আউট', আরো 'সোশ্যাল রিজেক্ট' আছে। সেখানে, উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হলেও—যদি পছন্দমত কাজে কিশোরকে নিযুক্ত করতে না পারেন, এই সব নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কিশোরদের সংগে দল গড়ে তোলে। প্রথম দিকে ছোটাখাটো নির্দোষ দুঃসাহসিক কাজের মাধ্যমে নিজের ভেতরকার টগবগ করা উত্তেজনা-উৎসাহ স্রোত নির্গত করে। তারপর সিনেমা, খেলাদেখা, নেশা করার পয়সা যখন বাড়ী থেকে সংগ্রহ করতে পারে না তখন এই দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ আর নির্দোষ থাকে না; পয়সা সংগ্রহের সহজতম পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য যদি প্রথম দিকের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ না করে, তা হলে হয়তো দল ভেঙে যায়। সফল হলে ক্রমশ ছোট থেকে বড়দরের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, সংগঠন জোরদার হয়। সব দেশের কিশোর অপরাধীদের সংগঠন ঠিক একই ভাবে গড়ে ওঠে না, কিন্তু আমাদের দেশের সংগে অনেক দিক থেকেই, যে ওদের মিল আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিল্পে অটোমেশন ও কমপিউটারের ব্যবহারের দিক থেকে আমরা পেছিয়ে থাকলেও, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যায় খুব সম্ভব এগিয়ে আছি।

আমেরিকার লেখকরা কিশোর অপরাধীদের বিশেষ 'সংস্কৃতির (sub-culture of delinquents) কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশের বয়স্ক অপরাধীদের আলাদা সমাজ, আলাদা ভাষা, আলাদা আচার ব্যবহারের খবর আমাদের জানা আছে; কিন্তু কিশোর অপরাধীদের এই রকম কোনো "সাবকালচার" এর অস্তিত্ব আমাদের জানা নেই। এখানে সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ কিশোর অপরাধীর সংস্থা পশ্চিমীদেশের তুলনায় খুবই কম; কিন্তু ২।৪ জনের ছোট ছোট দল প্রচুর আছে। সংগঠিত দল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়স্ক অপরাধীদের নির্দেশে দন্ডণীয় অপরাধে লিপ্ত। কিন্তু সব দলই যে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করে এমন নয়। পাড়ায় বা মহল্লায় নিজের দলের আধিপত্য বজায় রাখা ও মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য এরা বোমা পাইপগান নিয়ে অন্য দলের বা বেপাড়ার গোষ্ঠীর সংগে হিংসাত্মক লড়াই করে। অন্যদেশেও

কিশোররা এই রকম আঞ্চলিক প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য লড়াই করে অবশ্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র অনেক বেশি আধুনিক ও উচ্চস্তরের। আর একধরনের কিশোর-গোষ্ঠী আছে, তারা নেশাভাঙ ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়াকলাপে মেতে থাকে এবং এইভাবে নিজেদের অক্ষমতা অসাফল্য ভুলে থাকতে চায়, বাস্তব জীবন থেকে দূরে থাকতে চায়। এরা সাধারণত অস্ত্রশস্ত্র রাখে না, বিবাদ বিসম্বাদ থেকে দূরে থাকে, কোনো রকমে নেশার পয়সাটা পেলেই এরা খুশী। এই পয়সা সংগ্রহ প্রায়ই বাড়ী থেকে করতে হয়, নেহাত না পারলে ছোট দরের অপরাধ করতে অবশ্য বাধ্য হয়।" এদের সম্পর্কে আলোচনা অন্যত্র (মাদকাসক্তি সমস্যার অধ্যায়ে) করাই ভাল; এবং এদের ঠিক অপরাধী পর্যায়ে ফেলা আমরা যুক্তিযুক্তও মনে করিনা, যদিও কিছু লেখক এদের 'ডিলিংকোয়েন্ট' গোষ্ঠীতে ফেলেছেন (Cloward and Ohtin ; A Theory of Delinquent Gaugs, New York, Free Press, 1963)।

উন্নত দেশের মত কিশোরী অপরাধীদের 'গ্যাং' এখনও আমাদের দেশে গঠিত হয়েছে বলে মনে হয় না; তবে কিশোরদের দলে কিশোরীরা ঠিক স্থায়ী সভ্য হিসেবে না থাকলেও, ফাইফরমাস খাটা, চোরাই মাল পাচার, সংবাদ আদানপ্রদান ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত থাকে। পকেটমারদের দলের হয়ে কয়েক বছর হল কিছু কিশোরী কাজ করছে বলে জানা গেছে।

'কমিকস্', চলচ্চিত্র, ও টেলিভিশনের ভূমিকা (অপরাধী তৈরীর ব্যাপারে) নিয়ে বিভিন্ন রকমের মতামত প্রকাশ করে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ের উল্লেখ আমরা আগেই বলেছি। এখানে আর একদল সমীক্ষকের অভিমত উদ্ধৃত করছি। এঁদের মতে শহরতলী ও বস্তির হিংস্র ও উগ্র পরিবেশের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ও অল্প বয়স থেকে হিংসাত্মক কার্য-কলাপ দেখতে অভ্যস্ত যে-সব কিশোর তারাই অপরাধীদের দলে যোগ দিয়ে থাকে। শিশু মাত্রেই অনুকরণ প্রিয়। কোনো নায়ক-স্থানীয় ব্যক্তির আচরণ ও হিংসাত্মক কার্যপদ্ধতির অনুকরণ করে আদিকিশোর ক্রমশ হিংস্র ও উগ্র হয়ে উঠে; এবং অবলীলাক্রমে খুন জখম করতে অভ্যস্ত হয় [(1) Bandura ; Principles of Behaviour Modification, New Yok, 1969 ; (2) Wolfgang, Violence in Human Behavior, In M. Werthermer (Ed) Confrontation : Psychology and the Problems of To day ; Glenview ; III : Scott Foreman, 1970]

এইবার দেশের সরকারী সংস্থা, সরকারী বেসরকারী পর্যবেক্ষক ও

গবেষকদের তথ্য ও পরিসংখ্যান, যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, বিশ্লেষণ ও বিচার করে আমাদের সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করা যাক। প্রধানত সেন্ট্রাল ব্যুরো অব্ ইনটেলিজেন্স (১৯৬৬,৬৮); ব্যুরো অব্ পুলিশ রিসার্চ এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, (১৯৭৩) এ্যাসোসিয়েশন অফ্ সোশ্যাল হেল্থ্ ইন্ ইণ্ডিয়া (১৯৭৮) এবং দাশ এ্যান্ড দাশ (১৯৭৪) এর পরিসংখ্যান ও তথ্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে কিশোর অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৬৫-৬৬তে (C.B.I.Report 1966) বৃদ্ধির হার শতকরা ৫·২; আর একটি রিপোর্টে (Bureau of Police Research and Development 1973) বলা হয়েছে ১৯৬৯-৭০ সালে অপরাধ বেড়েছে শতকরা ২৫·৪ ভাগ। বয়স্ক অপরাধের সংগে কোনো তুলনামূলক হিসেব নেই। ১৯৬৮ সালের (C.B.I. 1968) হিসেব থেকে জানা যায় যে ৯টি রাজ্যে কিশোর কর্তৃক অনুষ্ঠিত অপরাধের মোট সংখ্যা ২১৩৫১; মহারাষ্ট্রে সব থেকে বেশি—৪৭২২, আর পশ্চিমবংগে সবচেয়ে কম—৬০৪। আর দাশ এ্যান্ড দাশের প্রতিবেদনে পাই লিলুয়ার সুন্দরভাই মোরাচাঁদ হোম্স-এর আটক অপরাধীর সংখ্যা* খুব একটা পরিষ্কার ধারণা এ-থেকে অবশ্য করা সম্ভব নয়। আর এ খবর আমাদের জানা যে শুধু এ রাজ্যে নয়, ভারতের কোনো রাজ্যেই অপরাধী সংশোধনের ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। এ-থেকে অনুমান করা যায়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য যতটা চিন্তাভাবনা ও চেষ্টা করছেন, কিশোর অপরাধ নিবারণের জন্য ততটা করছেন না। কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের ব্যাপারে অন্যান্য অনেকের মত নাগ (The Adolescents in India, op. cit.) আদৌ আশাবাদী নন। তাঁর হতাশার কারণ আমার মনে হয় দুটি: (১) কিশোর অপরাধীদের শতকরা ৭০।৭১ জন কিশোরই বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পরও অপরাধ করেই চলে আর প্রায়ই ঐ সংখ্যক কিশোরী অপরাধী বিবাহের পর সংসারধর্ম বজায় রাখতে পারে না। (2) কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ব্যবস্থা খুবই অসন্তোষজনক। (ibid pp 128 & 129)। সংশোধন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে, কিশোররা অপরাধীই থেকে যাবে, এ আমরা মনে করি না। তিনি আগের পৃষ্ঠায় বাড়তি y ক্রোমোজোম-এর

১৯৬৭তে ৯২৫, ১৯৬৮তে ১৯৭৪, ১৯৬৯তে ১০৪০ ও ১৯৭০তে ৮৩১।

কথা তুলেছেন, কিন্তু জানাননি যে মোট অপরাধীর শতকরা কত জন, বাড়তি y ক্রোমোজোমের জন্য উগ্র ও হিংস্র। এ নিয়ে ১৯৬৫ থেকে এ পর্যন্ত অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। জেকব স্কটল্যান্ডের এক বন্দীশালার উগ্র ও হিংস্র অপরাধীদের ১৯৭ জনের মধ্যে ৭ জনের (৫.৭%) বাড়তি'y' ক্রোমোজোম পাওয়া যাবার পর থেকে আরো অনেক সমীক্ষা হয়েছে। লোম্‌ব্রোসোর 'জন্ম-অপরাধী' তত্ত্বের অসারতা প্রমাণের পর দেহের গঠনের সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন 'জন্ম-অপরাধী' তত্ত্বের সমর্থকরা। জেকবস্‌এর (Jacobs, Brunton, & Melville, Aggressive Behavior, Mental subnormality and xyy chromosome, Nature, 1965) ক্রোমোজোমতত্ত্ব খুবই উৎসাহের সঞ্চার করল তাঁদের মধ্যে। জনসাধারণের মধ্যে বাড়তি y ক্রোমোজোমওয়ালা পুরুষের সংখ্যা গড়পড়তা ০·৪%—প্রতি ২৫০ জনে একজন। জেকবসের তত্ত্ব অভ্রান্ত হলে পুরোপুরি না হলেও 'জন্ম-অপরাধী' সমর্থকদের দাবী আংশিক ভাবে মেনে নিতে হয়। বাদানুবাদের ইতিহাস বিবৃত না করে, এই কথাটুকু জানানোই যথেষ্ট যে, ১৯৭০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্‌ মেন্টাল হেলথ্‌'-এর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে বাড়তি y ক্রোমোজোমের সংগে অপরাধ ও কিশোর দুষ্কিয়তার কোনো সম্পর্ক নেই।* পরবর্তীকালের অন্যান্য সমীক্ষক গবেষকদের বিবরণী থেকেও জানা গেছে যে কিশোর-অপরাধীদের মধ্যে বাড়তি y ক্রোমোজোমধারীদের সংখ্যা নগণ্য। এক সমীক্ষক ৪৬৪ জন উগ্র অপরাধীদের মধ্যে ১ জনের মধ্যে বাড়তি ক্রোমোজোম পেয়েছে (Welch, Borgaonkar, Herr. Psychopathy, Mental Deficiency and Aggressiveness and the xyy syndrome, Nature, 1967)। আর একজন ১০২১টি কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৩ জন পেয়েছেন (Hunter Chromatin Positive and xyy Boys in approved schools, Lancet, 1968-9)। অপরাধপ্রবণতা জন্মদত্ত ও অপরিবর্তনীয়

---

* Quite clearly, very complex and varied interactions between hereditary and social and environmantal influences appear to be involved. Further it seems unlikely that such variable and socially defined and determined problems as crime and delinquency are primarily and directly linked with the possession of an extra chromosome (NKMH, 1970, p. 19)

নয়; সুতরাং সংশোধনাগারে ও বরণ্টালে [সংশোধনের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংশোধনের ব্যবস্থা করলে, অপরাধীর সংশোধিত না হবার কোনো কারণ নেই।

এই প্রসংগে কিশোর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ নিয়ে আরো কিছু বলা যেতে পারে। যদি বিশেষজ্ঞদের ধারণায় কিশোর অপরাধ সংশোধন অসাধ্য হয়, তাহলে সরকার এই বিষয়ে শ্রম ও অর্থব্যয়ে আদৌ উৎসাহিত হবেন না; না হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের ধারণা কিশোর অপরাধ সমস্যার সমাধান সম্ভব। অবশ্যই সে সমাধান নিশ্চয়ই শর্তসাপেক্ষ এবং হয়তো বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে সব শর্ত পূরণ সম্ভব নয়। কিন্তু মিথ্যা হতাশাকে প্রশ্রয় দেওয়া সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের উচিত নয়। তাই একটি পুরনো লেখা থেকে কিশোর অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিশ্লেষণের নজির বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সূত্র উদ্ধৃত করছি:

"সমস্ত উন্নত দেশে, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির মূল কারণ অনুসন্ধানে বিশেষভাবে ব্যবহৃত। ঐদেশের অপরাধ-বিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে প্রতিটি সাধারণ মানুষ এই সমস্যার সমাধানে ও নিরসনে উৎসুক। এ সমস্যার মূল ব্যক্তিমানসে না সমাজবিন্যাসে? অপরাধপ্রবণতা ব্যক্তিবিশেষের রোগ না সামাজিক অসুস্থতা? অনুযায়িতা ও স্বাভাবিক অনুগামিতার ব্যতিক্রম না সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ?—অপরাধ কেন ও অপরাধ কি? এ নিয়েও বিতর্কের আর শেষ নেই।

আইনের চোখে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিনা? আদালতের বিচার্য মাত্র এই একটি ব্যাপার? কিশোর অপরাধের বেলায় ব্যাপারটা আরো জটিল।...অপরাধ নিবারণের উপায় ও অপরাধীর চিকিৎসা (সংশোধন) নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে জেনেভাতে।...কংগ্রেস (ডিলিনকোয়েনসির) সংজ্ঞা নির্ধারণে সেদিন মধ্য পন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুযায়ী অপরাধের কারণ জটিল। পরস্পর সম্পর্কিত বহু কারণের সমাবেশে কিশোর অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে কারণ মূলত সামাজিক; সামাজিক ও আইনসম্মত বাধা-নিষেধ লংঙন মাত্রেই অপরাধ; আর মনস্তাত্ত্বিকদের মতে অপরাধ অনুষ্ঠিত

হয় হঠকারী ও আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের কিশোরদের দ্বারা। তারা মূলত হীনমন্যতা পীড়িত।

অপরাধতত্ত্ব অন্যান্য তত্ত্বের মত পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। এমন একদিন ছিল মনে করা হত অপরাধ শয়তানের সৃষ্টি।...এ পর্যন্ত অপরাধের মূলতত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতৈক্য গড়ে ওঠেনি। শুধু যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অনৈক্য তাই নয়, একই 'ডিসিপ্লিনের' দল উপদলের মতামতও আলাদা।

জীববিদ্যা ও অপরাধতত্ত্ব: ইতালীয় চিকিৎসক লমব্রোসো সিদ্ধান্ত করেন, অপরাধী মাত্রেই এক বিশেষ অনুন্নত নৃগোষ্ঠীর মানুষ, যাদের মধ্যে বর্বর যুগের কিছু আংগিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। অপরাধী অপরাধের প্রবণতা নিয়েই জন্মায়। লম্ব্রোসোর 'স্বভাব দুর্বৃত্তবাদ' আধুনিক জীববিদ্যা পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু এখনও লম্ব্রোসোর প্রভাব কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীকে প্রভাবিত করা চলেছে। তাঁর মতবাদ পুরোপুরি মেনে না নিয়েও দৈহিক গঠনের সংগে অপরাধকে জড়িত করা হয়েছিল; এখনও নামকরা লেখকদের পুস্তকে এই মতের সমর্থকদের যুক্তির আংশিক সমর্থন দেখা যায়। যাদের হাড়গুলো মোটা, পেশীগুলো দৃঢ়বদ্ধ, শরীর ভারী ও চৌকোস অর্থাৎ যাদের বাহুবল বেশি,—এদের বলা হয় মেসোমরফিক' (mesomorphic)। অপরাধীদের সংখ্যা তাদের মধ্যে বেশি থাকায় (এর দুই তৃতীয়াংশ)—এই ধরনের দৈহিক গঠনের লোকদের স্বভাবঅপরাধী বলার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। এদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি কম তাদের অপরাধীদের দলভুক্ত করা হয়; কেননা তাদের দিয়ে দলপতিদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কুলসংক্রমণ তত্ত্ব এর দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না, এই মন্তব্য করলেন প্রতিপক্ষভুক্ত বিজ্ঞানীরা। মোট কথা কোনো রকমভাবে 'স্বভাব দুর্বৃত্তবাদ' তত্ত্বের সপক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যপ্রমাণ এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। রক্তে চিনির পরিমাণ কম, ক্যালসিয়ামের অভাব ইত্যাদির জন্য হিংস্র অপরাধ সংঘটিত হবার সম্ভাবনা (সাময়িকভাবে উগ্র ও হিংস্র হয় এই কারণে) থাকলেও সেই অভাবকে কিশোর অপরাধের কারণ বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। প্রখ্যাত এক বিজ্ঞানীর অভিমত এই প্রসংগে উদ্ধৃত করা চলে।* হরমোন নিয়ে আগেকার হৈ চৈ এখন থেমে গেছে।

---

* The fact is that so far as the endocrene system and its relationship to personality and behavior are concerned,

মনোবিদ্যা ও অপরাধতত্ত্ব : পশ্চিমী মনস্তাত্ত্বিকরা মানসিক প্রতিবন্ধীদের (জড়বুদ্ধি) মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেশি—এইভাবে 'জন্ম অপরাধী' তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। শুধু সোভিয়েতে নয়, অন্যান্য অনেক দেশের মনস্তাত্ত্বিকরা বুদ্ধ্যংক নির্ণয়ের পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না (দ্রষ্টব্য, Statistical Manual of American Association of Mental Deficiency, 4th edition, 1957 ; (2) Kershow John D ; Handicapped children : London, 1973, pp114, 115 , (3) Woods, The Handicapped Children, London 1975 p174)। তবে জড়বুদ্ধি ছেলেদের দিয়ে মতলববাজ দুষ্ক্রিয়ায় রত করতে পারে।

মনোরোগবিদ্যা ও অপরাধতত্ত্ব : কিশোর অপরাধী মাত্রেই নিউরোটিক ; অপরাধ অবচেতন মনের তাগিদে অনুষ্ঠিত সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া, ধ্বংসাত্মক অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি শিশুকে অপরাধ সাধনে প্রণোদিত করে —এই ধরনের ফ্রয়েডীয় মতবাদের প্রভাব আজকালকার মনোবিদ্যার পুস্তকে খুব কমই নজরে পড়ে। সোভিয়েত মনস্তাত্ত্বিকরা ((Wortis, Soviet Psychiatry, op. cit.) মনে করেন মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সমাজবিরোধী কার্যকলাপ আর কিশোর অপরাধীর কার্যকলাপে একটা মস্ত পার্থক্য দেখা যায়। সে পার্থক্য মানসিক রোগীদের কার্যকলাপের উদ্দেশ্যবিহীনতা।

সমাজবিদ্যা ও অপরাধতত্ত্ব : বিশেষ ধরনের সমাজ-সংস্কৃতির সংগে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ ও বিতর্ক হয়েছে। উন্নত দেশের সমাজব্যবস্থা দায়ী না সাধারণভাবে যন্ত্রযুগ দায়ী—এই অপরাধবৃদ্ধির জন্য ? নোংরা বস্তি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিষাক্ত আবহাওয়া, দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণকে এখনকার পণ্ডিতরা কিশোর-অপরাধ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মৌলিক না হোক্ সাহায্যকারী ও পরোক্ষ কারণ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। দেখা গেছে, শিকাগো, লন্ডন ইত্যাদির শ্রমিক বস্তীগুলোতে 'গ্যাং'এর সংখ্যা বাড়ছে ; মন্দার

---

we are still almost completely in a world of the unknown. (A Montaque, The Biologist looks at crime 1941, pp: 55-56).

বাজারে অন্যান্য অপরাধের সংগে কিশোর অপরাধেরও সংখ্যা বাড়ে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এই প্রতিবেদনে পৃথিবীকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। প্রথম অঞ্চলে 'সামোআ' এর মত গোষ্ঠীশাসন প্রভাবিত অনুন্নত দেশগুলি স্থান পায় (পরে এদের অনেকগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে শিল্পোন্নত দেশের অনুকরণে চলবার চেষ্টায়, তাদের অবস্থা পালটেছে এবং অপরাধ বৃদ্ধি হয়েছে –লেখক); দ্বিতীয় অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই সব দেশকে যেখানে 'ডিলিনকোয়েনসি' সম্প্রতি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যেখানে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছে; (ভারত এই অঞ্চলভুক্ত) দেশবিভাগ ও সীমান্তের রদবদলের জন্য বহু শিশু ও কিশোরের অভিবাসন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, (ভারত, ইস্রায়েল), অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, গ্রামাঞ্চলের উৎপাটিত পরিবার কর্মসংস্থানের জন্য নগরমুখী হয়েছে—সেখানেই কিশোর-অপরাধ বৃদ্ধি সমস্যাকারে দেখা দিয়েছে।* তৃতীয় অঞ্চলে সেই সব দেশ অন্তর্ভুক্ত যেখানে সমাজধ্বংসী কার্যকলাপ বহুকাল ধরেই চলে আসছে। শিল্পোন্নত দেশগুলি এই অঞ্চলভুক্ত।

সমস্যা এখন সেই অঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করেছে। গোষ্ঠী ও পরিবার আধিপত্যের দিন শেষ হয়েছে, তার স্থান অধিকার করেছে নানা রকমের সংস্থা : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, রহস্যবাদী ও সেবাধর্মী। পুরনো মূল্যবোধ, প্রতিবেশী সম্পর্ক পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশেও প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে; বড় নগরীতে একেবারে অন্তর্হিত।

পরিবেশ-প্রভাবে বিশ্বাসী তাত্ত্বিকদের মতে ঐ রিপোর্টে দুই মতের মধ্যে

---

* The fact that most of the Juveniles, whether delinquent or neglected and the illtreated in Ceylon, Burma, India, Pakistan and the Phillipines come from poverty-strieken families and slum areas indicates however that economic maladjustment is a very important factor in the causation of juvenile delinquency. The proverbial poverty and the chronic indebtedness of the labourers in India are certainly contributory factors to this problem (Unesco Report. 1955, pp 22-23)

—(ব্যক্তিমনস্তত্ত্বভিত্তিক ও সামাজিক) একটা আপোষের চেষ্টা করেছেন রিপোর্ট রচয়িতারা। রিপোর্টের শেষ অংশ থেকে সেটা বেশ বোঝা যায়।**

...পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকার আজকাল সামাজিক বিশৃংখলা, বিচ্ছিন্নতা মনোরোগ, কিশোর ও অন্যান্য অপরাধবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈষম্য, 'ঘেটো' ও 'স্লাম এরিয়া', বর্ণবিদ্বেষের কথা বলেন ; আবার (এই সামাজিক ব্যবস্থার গলদ ঢাকতেই বোধ হয় ?) ব্যক্তি-মানসের অন্তর্নিহিত বা জন্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও টেনে আনেন। পিতামাতার খাবার ব্যবহার, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য, পারিবারিক বিশৃংখলার ওপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করার সময় ভাবেন পরিবার বুঝি সমাজ-বহির্ভূত শক্তি। পিতামাতা নিউরোটিক, এঁরা আবার এঁদের প্রয়াত পিতামাতার দোষে নিউরোটিক ; প্রপিতামহ প্রমাতামহও নিউরোটিক ছিলেন—এইভাবে পরিত্যক্ত কুলসংক্রমণতত্ত্বকেই তাঁরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন :—এই রকম সন্দেহ করেন বস্তুবাদী পরিবেশবাদী মনস্তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিকরা।

এ কথা ঠিক কিশোরঅপরাধ শুধু নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এদের কাছাকাছি থাকা অর্থশালী পরিবারের ছেলে কৈশোরের উন্মাদনায় চিন্তাভাবনাহীন এই অপরাধীদের মজাদার 'এ্যাড্-ভেঞ্চারের' প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া আগেই বলেছি, সব 'ডিলিনকোয়েন্টরা' উগ্র বা হিংস্র নয় ; তারা অন্যরকমের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে সমাজবিরোধিতা প্রকাশ করতে পারে, নিজেদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও শক্তির বহির্প্রকাশ ঘটিয়ে মানসিক ভারসাম্য রাখার ব্যবস্থা করতে পারে। গ্রেট বৃটেনের একজন লেখকের মতে অপরাধ (বিশেষ করে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির কারণ অর্থনৈতিক নয়,

** ...In such countries the rates of delinquency are higher than anywhere in the world, yet, paradoxically, the standard of living and the existence of social services are also higher...!! কারণ বলতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন : "neither exclusively biological, nor exclusively socio-cultural, but evidently deriving from an interplay of somatic, temperamental, intellectual and socio-cultural....."

নীতিগত। তাঁর মতে ঈশ্বর ও তাঁর ন্যায়নীতিভিত্তিক বিধানের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত—এই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি তাঁর দেশের দুর্নীতিবৃদ্ধির জন্য দায়ী। তিনি এবং তাঁর মতন কিছু নীতিবাগিশদের মতে পুরনো বিশ্বাস (বাইবেলে বিশ্বাস) ভেঙ্গে পড়ার জন্য দায়ী প্রধানত ডারুইন ও তাঁর পর কার্ল মার্কস। ফ্রেজারের নীতির উদ্ভব সম্পর্কিত নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পুরনো নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধকে ভূমিসাৎ করেছে।

অন্যপক্ষের অভিমত তুলে ধরা যাক। পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সমাজপতিদের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে বাধছে। পুরনো ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের জোরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক বা কয়েকটি শিল্পসংস্থার কব্জায় আছে উৎপাদন ও সম্পদ। পুরনো মূল্যবোধকে জীইয়ে রাখার ও মানবতা ও নীতিকে প্রচার করার দায়িত্ব যাঁদের হাতে, সেই সব রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতারা নিজেদের জীবনে পুরনো মূল্যবোধকে আশ্রয় করে থাকছেন না। শিশুরা নীতিবোধের পাঠ শুধু পুঁথির পাতা বা বড়দের কথা থেকে নেয় না; পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ থেকেও তারা অনেক কিছু শেখে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, উপরতলার প্রায় সকলের মধ্যেই দুর্নীতি। নীতিবাগিশদের নীতি-কথা এইসব পাপ দুর্নীতিকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করছে না,—এ সত্য কিশোরের কাছে অবিদিত থাকছে না। তাছাড়া, 'কমিকস্, সেক্স, থ্রিলার, মার্ডার' গল্প নাটক সিনেমা টেলিভিশন মারফত শিশু ও কিশোর মনকে উত্তেজিত করা হচ্ছে। উন্নত দেশের শিশুদের পারমাণবিক যুদ্ধের মহড়া দিয়ে শিশুমনকে কন্ডিশনিং করা হচ্ছে। প্রয়োগবাদের সার কথা—যে কোনো পন্থায় অর্থ প্রতিপত্তিলাভ (nothing succeed like success) নানাভাবে শিশু কিশোরকে শেখানো হচ্ছে। সমাজে সাফল্য লাভ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ কম, তাই বোধ হয় জীবনের প্রথমকাণ্ডে বঞ্চিত, বিফল, অবহেলিত কিশোররা এই সমাজের সব বিধিনিষেধকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখছে, সুযোগ পেলেই আইন ও বিধিনিষেধ ভঙ্গ করছে।

প্রশ্ন উঠবে—বর্তমান সমাজব্যবস্থা, সভ্যতা সংস্কৃতি যদি এতই খারাপ, সামাজিক পরিবেশই যদি অপরাধ-প্রবণতার জনক তবে এই সমাজে ও কিশোর অপরাধীর সংখ্যা এত কম কেন ?

দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অজ্ঞতা থেকে অনেকেরই মনে এ-প্রশ্ন জাগতে পারে। মাটির তালকে যেমন ছাঁচের চাপে ইচ্ছেমত আকার দেওয়া যায়

শিশুমনকে তেমনি পরিবেশের ছাঁচের চাপে পরিবেশমাফিক গড়ে তোলা যায় না। শিশু মাটির তাল নয়, সার্কাসের জানোয়ার নয়, পরিবেশের হাতের অক্রিয় ক্রীড়নক নয়। শিশুও পরিবেশকে সাধ্যমত পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে। শিশুচৈতন্য যতই অপরিস্ফুট হোক না কেন, নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবেশকে বিশ্লেষণ করে, পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপক ও শর্তগুলি যাচাই করে, পরিবেশের জটিলতা বোঝার চেষ্টা করে, পরিবেশের দোষগুণ ভালমন্দ বিচার করে কিছু বর্জন, কিছু গ্রহণ করে। অবশ্য সব সময়েই এই বিচার বিশ্লেষণমূলক গ্রহণ-বর্জন পদ্ধতি অনুযায়ী শিশুচরিত্র ও ব্যবহার গড়ে নাও উঠতে পারে। মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থায়, স্ববিরোধী বা আধাসম্মোহিত অবস্থায়, বিনা বিশ্লেষণে পরিবেশের অভিভাবন শিশু গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া, পরিবার, বিদ্যালয়, ভাল শিক্ষামূলক বই বা চলচ্চিত্র ইত্যাদি থেকে বেশির ভাগ সময়েই নীতিকথা, অনুযায়িতা, অনুগামিতার নির্দেশ, কর্তৃপক্ষের ও বয়স্কদের আনুগত্য ও বশ্যতা শিক্ষা দেওয়া হয়। সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসংঘাত, নিষ্ঠুরতা, রূঢ় প্রতিযোগিতা যতটা সম্ভব শিশু ও কিশোরদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়। মধ্যযুগীয় সংস্কার ও বিশ্বাস থেকে এ যুগের ভুয়ো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা নানাভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশিত হয়। এ-সবের সংগে বাস্তব পরিস্থিতির-অনৈক্য সব কিশোরের বোঝার ক্ষমতা থাকে না।.....তাছাড়া সহযোগিতা, স্নেহ প্রেম, দয়া মায়া; সৌভ্রাতৃত্বমূলক ও অন্যান্য প্রগতিশালী প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ক্লাব,—এসবও তো পরিবেশে রয়েছে। তাই সব কিশোর অপরাধী, বিদ্রোহী বা উগ্রভাবাপন্ন হয় না। সকলের মধ্যে অসুস্থতা বা অননুগামিতা ও গুরুদ্রোহিতা দেখা যায় না। 'ডিলিনকোয়েনসি' বৃদ্ধি পেলেও সকলেই 'ডিলিনকোয়েন্ট' হয় না। অপরাধী ও অসুস্থের রাজ্যেও সৎ ও সুস্থ লোক থাকে।

সব দেশেই, সাধারণত সামাজিক বৈষম্যের শিকার যারা, তাদের পরিবারেই কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বেশি। তবে বিস্তারিত ও সুপরিকল্পিত সমীক্ষা ছাড়া আমাদের দেশে কোন শ্রেণী ও কি ধরনের পরিবারের মধ্যে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে, নির্ণয় করা কঠিন। আমরা চিকিৎসক হিসেবে অতিসামান্য যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার ভিত্তিতে বলতে পারি: (১) কিশোর দুষ্ক্রিয়তা বা যে-কোনো রকমের অপরাধের জন্য জন্মগত কোনো ত্রুটি দায়ী নয়; এর জন্য দায়ী কোনো 'জীন' আবিষ্কৃত হয়নি;

(২) অভাব অভিযোগ পরিবার অথবা সমাজকর্তৃক না মিটলে, জীবনারম্ভে বিদ্যালয় বা খেলার মাঠে অসফল বা বিড়ম্বিত হলে, অতৃপ্ত অসফল ব্যর্থ সমবয়সীদের সংস্পর্শে এলে, কিশোর দুষ্ক্রিয়ায় ব্রতী হয়; (৩) দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুদের আগমন, অসহায়ত্ব ও পুনর্বাসনের অব্যবস্থা, জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে কর্মসংস্থানের স্বল্পতা ও সর্বোপরি ভেঙেপড়া পুরনো মূল্যবোধ ও প্রাচীন ভাবাদর্শ বনাম নব উন্মেষিত বর্তমানের উপযোগী ভাবাদর্শের সংঘাত—গত তিন দশক ধরে আমাদের দেশে কিশোর-অপরাধ বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য আমাদের সমাজ বিশেষ কিছু করেনি, অথবা যা করেছে তার ফলে তাদের মধ্যে অসহায়তা ও অসন্তোষ আরো বেড়েছে। নদীমাতৃক পূর্ববংগের মানুষকে দণ্ডকারণ্যের মত জায়গায় পুনর্বাসিত করাকে তারা বনবাসে পাঠানোর মত মনে করেছে। তাদের নিরাপত্তার অভাব, অসন্তোষ ও ক্রোধ এদের ও এদের আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সন্তানসন্ততির মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। এর ফলে তারা কিশোর বয়সেই সমাজদ্রোহী হলে তাদের খুব দোষ দেওয়া চলে না। তা'বলে, সমাজ ও তাদের পরিবারের এই সমস্যাকে আমরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি না; এবং সামাজিক অব্যবস্থা ও অন্যায়কে দায়ী করে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করতে পারি না। উঁচু-মহলের দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অপরাধপ্রবণতা নিচুমহলের নৈতিক মানদণ্ড ভেঙ্গে ফেলে তাদের বা তাদের কিশোর সন্তানদেরও সমাজবিদ্বেষী করে তুলবে—এটা স্বাভাবিক ভেবে নিস্পৃহ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি না। মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শের সংঘাতে কিশোর গঠনমূলক সমাজ-উন্নয়ন বা সামাজিক পরিবর্তনের ক্রিয়াকলাপে জড়িত না হয়ে যদি উন্মার্গ-গামী, ও সমাজবিদ্বেষী হয়ে ওঠে,—তবে তার প্রতিকার, প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণের চিন্তা মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্বের অনুরাগী প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য। তাই এবিষয়ে জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমাদের চিন্তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া কর্তব্য মনে করছি।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা: যদিও সমস্যাটা পুরোপুরি সামাজিক, তবুও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিশোরের সম্মতি থাকলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক থেরাপির (পরামর্শ, উপদেশ, আলোচনা জাতীয়) সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে; 'গ্রুপ থেরাপি'র সাহায্য সংশোধনী বিদ্যালয়ে সব সময়ে গ্রহণ করা

দরকার। প্রতিটি কিশোরের স্বতন্ত্র ও বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া সমীচীন। সংশোধনী বিদ্যালয়ে বয়স ও অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কিশোর বাসিন্দাদের আলাদা রাখা উচিত। এদের মেলামেশা সম্পর্কে প্রথম দিকে কড়াকড়ি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষক, পরামর্শদাতা, পরিচালকমণ্ডলী, সেবকসেবিকা, চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী, সকলের জন্য শিশু ও কিশোর মনস্তত্ত্বের অন্তত ৩ থেকে ৬ মাসের একটা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও সংশোধনী বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করতে হবে। অন্য দেশে, বিশেষ করে যেখানে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি গুরুতর সমস্যা হিসেবে গৃহীত এবং যেদেশে অপরাধীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম. এ ব্যাপারে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে—উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দুই বিপরীত ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দেশ—আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকেই জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করা উচিত এবং আমাদের বিশেষ সংস্কৃতি, সামাজিক ব্যবস্থা, আর্থিক সংগতি অনুযায়ী নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ঐ দুই দেশের কিশোর অপরাধের গতিপ্রকৃতি, হ্রাসবৃদ্ধি, প্রতিকার ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার করার পর, আমাদের বিশেষ অবস্থা-অনুযায়ী নিজস্ব পরিকল্পনার কাঠামো তৈরী হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন বিজ্ঞানী (ওটিস মাওরিয়র বিয়াট্রিসের নামই এখন মনে পড়ছে) সোভিয়েতে গিয়েছিলেন ও কিশোর-অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকার কিশোর অপরাধ সমস্যাকে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বহু-সংখ্যক রাস্তার পিতৃপরিচয়হীন বাচ্চাদের, যাদের মধ্যে অনেককেই স্বভাবদুর্বৃত্ত বলে অন্য দেশে জেলে পোরা হত, অথবা একটু বড় হয়ে যারা সোভিয়েতের 'মাফিয়া' হয়ে উঠত,—তাদেরও মাকারেংকো সমাজে পুনর্বাসনের উপযোগী করে তুলেছিলেন। মাকারেংকোর বই পড়লে পিতামাতা শিক্ষকশিক্ষিকা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন।

প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা: এদিক থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থা ও আমেরিকার ব্যবস্থা এক রকমের হতে পারে না এবং আমাদের ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। তবে ওটিস সোভিয়েটের যে ব্যবস্থাগুলো দেখে চমৎকৃত

হয়েছিলেন, তার কিছু যা আমরাও গ্রহণ করিতে পারি, এখানে উল্লেখ করছি। সোভিয়েটের সমাজবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানীদের প্রধান কথা সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রধানত সামাজিক হতে বাধ্য: (১) অভিভাবকহীন রাস্তার ছেলেদের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সংশোধনাগারে সরিয়ে ফেলা, (২) সন্তানদের দুষ্ক্রিয়ার জন্য পিতামাতাকে দায়ী করা, (৩) প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকাকে মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি শিক্ষা দেওয়া, (৪) এইসব শিক্ষকশিক্ষিকার মাধ্যমে বিশৃংখলা ও দুষ্ক্রিয়তার খবর পিতামাতা, অভিভাবকদের জানানো ও সংশোধনের উপায় বাতলানো, (৫) অপরাধ ও দুষ্ক্রিয়তার সংবাদ সংবাদপত্রে আদৌ পরিবেশন না করা (আমাদের দেশে এই সংবাদই প্রধান সংবাদ! —লেখক) (৬) এই সংক্রান্ত পুস্তক পুস্তিকা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করা, (৭) পল্লীতে পল্লীতে ক্লাব ও অন্যান্য সংগঠন গড়ে তুলে স্থানীয় কিশোরকিশোরীদের সুস্থ আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলোর ব্যবস্থা করা ও এইসব সংগঠন মারফত পাড়ার কিশোর অপরাধীদের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা।*

মনে হয়, গ্রামের দিকে প্রথমে অঞ্চল পঞ্চায়েতের সাহায্যেও উৎসাহে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলে সেই ক্লাবের ছেলেমেয়েদের দিয়ে একাজ শুরু করার আগে কোলকাতায় ও পৌরসভার প্রতিটি পল্লীতে এই ধরনের ক্লাব বা সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করা এবং প্রাথমিক ফলাফল নিরীক্ষা করে দেখা উচিত। কিশোরকিশোরীদের সুস্থ সংগঠন অঞ্চলের মস্তানদের দৌরাত্ম্য রোধে সহায়ক হতে পারে। এই ভরসায় প্রতিটি অভিভাবক স্বেচ্ছায় মাসিক চাঁদা দিয়ে এই ধরনের বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠনে ও সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে পারেন। সোভিয়েটের পুরনো দিনের অপরাধ পরিস্থিতির সংগে আজকের পরিস্থিতি নিশ্চয়ই মিলবে না। সদ্যপ্রাপ্ত একটি পুস্তিকা থেকে বর্তমান (**) অবস্থা সম্পর্কে আমরা কয়েকটি মূল্যবান তথ্য এখানে

---

* This combination of basic social measures, social treatment, educational measures, legal sanctions, public pressure and individual responsibility seems to work and juvenile delinquency is not an important problem to day (Wortis, Soviet Psychiatry, Baltimore, 1950, p 255)

(**) Every country faces the problem of crime and its prevention and the Soviet Union is no exception. Ofcourse,

সন্নিবেশিত করছি। এর আগে অন্য একটি সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানিয়েছি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট অপরাধের ৩·৪ থেকে ১০ শতাংশ অপরাধ শিশুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত। যদিও অন্যান্য দেশের (বিশেষ করে পশ্চিমী দেশের, যাদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের বন্দোবস্ত আছে) তুলনায় এই সংখ্যা খুবই কম; তবুও সরকারের মতে খুবই উদ্বেগজনক। তারপর পরিকল্পনাপ্রসূত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কিশোর-অপরাধের সংখ্যা আরো কমেছে; ভল্‌াডিমির অঞ্চলে ৩৭ শতাংশ, লেনিনগ্রাড অঞ্চলে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ, অন্যান্য অঞ্চলে ১১ থেকে ১৩ শতাংশ। যদিও শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশেষ করে পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ভয় যাদের রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে, তাহলেও পূর্বে উল্লিখিত বইটি পড়লে মনে হয় ওখানকার রাষ্ট্রনেতাদের মনে আত্মতুষ্টির ভাব দেখা দেয়নি*। আমাদের দেশে বৃদ্ধির হার পশ্চিমী দেশের তুলনায় কম, এই ধারণা, অথবা শিশু-অপরাধীদের সংশোধন করা অসম্ভব—অপরাধ সংখ্যা বাড়তেই থাকবে—এইসব ভেবে যাতে সরকার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় না থাকেন, এই উদ্দেশ্যে সোভিয়েতের কথা এখানে তুলতে হল। প্রতিবন্ধী সমস্যার চেয়ে এই সমস্যা কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মদ ও মাদকাসক্তি ঃ চিকিৎসকদের কাছে কিশোর দুষ্ক্রিয়তার যে দিকটি বিশেষ সমস্যা হিসেবে উপস্থিত হয়, সেই দিকটি নিয়ে এবার আলোচনা

---

the nature and extent of crime in the Soviet Union are not the same as in the West. In the first place there are no professional criminals like gangsters and racketeers..... No section of the population in the U.S.S.R has any vested interest in the crime business. At the same time we are still faced with acts of theft of Government owned public and private property, with acts of hooliganism especially by adolescents... (Shinin, Crime Prevention and Law, Novosh 1987, p 5)

* The work being done to prevent juvenile delinquency gradually reduces the incidence of juvenile crime in U.S.S.R. In the past ten years, for example, the juvenile

করছি। দুর্বিনীত, দুর্বৃত্তের সংখ্যাবৃদ্ধি নিশ্চয়ই ঘটছে। কিন্তু খুন জখম, চুরি ছিনতাই প্রভৃতির সংগে সংশ্লিষ্ট কিশোরদের চেয়ে সুরাসক্ত ও বিশেষ করে মাদকাসক্ত কিশোরদের সংগেই তাঁদের বেশি পরিচয়। অবশ্য, আগেই জানিয়ে রাখা উচিত, সব দেশেই, বিশেষ করে আমাদের দেশে কিশোরদের সুরাসক্ত হবার সম্ভাবনা কম। কারণ অনেক আছে। দুটি প্রধান কারণ এখানে বিবৃত করছি। এক: আমাদের দেশে খুব কম পরিবারেই খাবারের আগে সুরাপানের নিয়ম আছে। কাজেই বাচ্চাদের আদিকৈশোরের সুরার সংস্পর্শে আসার সুযোগ নেই। যে সব আন্তকিশোর লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে অভিভাবকদের তোয়াক্কা রাখে না ও অপরাধীদের দলে মিশেছে, তারা ছাড়া পরিবারের মধ্যে থেকে, সুরাপানে অভ্যস্ত হবার সম্ভাবনা অন্যদের নেই বললেই চলে। তবে হস্টেলে বাসকারী আই, আই, টি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছেলেদের মধ্যে সুরাপান প্রচলিত আছে। সাধারণত ছুটির দিনে, পিকনিক পার্টিতে, সরস্বতী পুজো বা ঐ ধরনের উৎসবেই তারা পান তো করেই, এছাড়া নিয়ম করে কিছু ছাত্র রাত্রে অল্প এক আধটু পান করেও থাকে। এরা বেশির ভাগই উচ্চমধ্যবিত্ত-ঘরের ছেলে। তারা যখন পুরোপুরি আসক্ত হয়ে ওঠে,—অর্থাৎ যখন সুরাপান না করলে এদের ঘুম হয় না, খিদে হয় না, শরীর ম্যাজম্যাজ করে—তখন আর তারা কিশোর থাকে না। দুই: সুরাপান করার মত পয়সাকড়ি খুব কম ছেলেদের ছাত্রাবস্থায় হাতে আসে, আর গন্ধ থেকে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে বলে নেশার এই পথটি বেপরোয়া প্রকৃতির ছেলে ছাড়া কেউই বিশেষ মাড়ায় না। তবে এক্ষেত্রেও জাতি ও সংস্কৃতি ভেদের কথা মনে রাখা দরকার। আমাদের দেশে কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠী ও তপশিলী জাতি এবং উত্তরাংশের ও শীতপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সুরাপান গর্হিত বা অসামাজিক কাজ বলে বিবেচিত হয় না। সেই সব কিশোরদের মধ্যে সুরা-

---

crime rate has fallen 37 percent in the Vladimir region, 25-30 percent in Leningrad, 13 percent in Vilnius and 11 percent in Lov. But there are still many young people who commit offences sometimes very serious ones, such as stealing and robbery, hooliganism and assault on the health of the people. However, most of the crimes by youngsters ......pose no serious threat to the society (Ibid pp 98-99)

সঙ্গের সংখ্যা বেশি হবারই সম্ভাবনা। এ-ছাড়া খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রায় সকলের মধ্যেই সুরাপান প্রচলিত ও সমাজ অনুমোদিত প্রথা। এও শুনেছি ও জানি উত্তর ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে সুরাপান বেশ প্রচলিত। কিশোর দুষ্ক্রিয়কারীদের মধ্যে যারা উগ্রস্বভাবের ও হিংসাত্মক কাজকর্মে অভ্যস্ত তারা সুরাপান করে। তাদের অভিভাবকরা এ নিয়ে প্রথমটায় বকাবকি মারধোর করা সত্ত্বেও কোনো ফল হয় না। তাদের পয়সার অভাব ঘটে না। এক অসহায় পিতার কাছে শুনেছি, মাইনে পেয়ে বাড়ী আসার আগে বন্ধুদের কাছে বেশির ভাগ টাকা রেখে আসেন। কয়েক-বার বাড়ীতে ঢোকা মাত্রই গুণধর ১৭ বছরের ছেলে জবরদস্তি করে মাইনের টাকা কেড়ে নিয়েছে বলে এই ব্যবস্থা; কিন্তু এর ফলে শারীরিক নির্যাতন বেড়েছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে সাহায্য চাওয়ায় এবং থানায় নিয়ে তাকে ভয় দেখানোর ফলে সে বাড়ী থেকে কিছু গয়নাগাটি নিয়ে উধাও হয়, পরে দলের সংগে রাহাজানি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। আর একটি ছেলে (১৭/১৮) রোজ রাত্রে মদ খেয়ে রিকশা করে বাড়ী ফিরত; রিকশাওয়ালার সংগে ভাড়া নিয়ে বাদানুবাদ হলেই ছুরি বের করত। তার মাতলামিতে ও অশ্লীল গালাগালি শুনে পাড়ার লোকরা কানে আঙ্গুল দিতেন বটে, কিন্তু ঐ ক্ষুদে মস্তানটিকে বাধা দিতে বা ঘাঁটাতে সাহস পেতেন না। আশেপাশের বাড়ী থেকে রেডিও, ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব মাঝে মাঝেই চুরি যেত। সকলেই ওকে সন্দেহ করলেও পুলিশকে জানাতে সাহস পেতেন না। এই দুটি পরিবারই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু, বাবা খুব কম রোজগার করেন, আফিম খান, ছেলেদের লেখাপড়া শেখানো বা শাসন করা—কোনোটাই করার মত শক্তি-সামর্থ্য বা সাহস এঁদের ছিল না। এঁরা পুত্রদের সংশোধনের জন্য আমাদের পরামর্শ নিতে মাঝে মাঝে আসতেন, কিন্তু ছেলেদের কোনোদিনই আনতে পারেননি। বাড়ীতে অভাব অনটন, ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। কিছুদিন পরে জানতে পারলাম এদের ছিনতাই চুরির টাকা অনেকদিন ধরেই মায়েদের নিতে হয়েছে সংসার চালাবার জন্য। এরা সমাজ অনুমোদিত পথে রোজগার করতে পারবে না বাবারা জানতেন, কাজেই স্ত্রীকে শেষের দিকে আর বাধা দিতেন না। এই দুটি পরিবারের খবর আমার ভালভাবে জানা, এ দুটি পরিবারই পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে। মা বাবা দুজনেই মৃত; ছেলেরা জেলে যাতায়াত করা পেশা নিয়েছে। পুরনো অভ্যাসে আরো বেশি করে আসক্ত হয়েছে। দুচারটি বড় ঘরের, মানে পয়সাওয়ালা বনেদি ঘরের ১৮/১৯ বছরের ছেলে-

দের নিয়ে অপেক্ষাকৃত শক্ত ও ব্যক্তিত্বশালী বাবা চিকিৎসার জন্য অনেক সময় এসেছেন। এই ছেলেদের 'ডিলিংকোয়েন্ট'দের দলে ফেলা যায় না। আগে যে দুটি ছেলের কথা বললাম ওদের আসক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে না ফেলে 'ডিলিং-কোয়েন্টদের' দলে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশ, শক্তি-সামর্থ্যহীন পিতা, প্রশ্রয়দানকারী মাতা, এদের অপরাধপ্রবণ-তার জন্য দায়ী। এ ছাড়া ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের যে ক্রোধ ও বিদ্বেষ সমাজের বিরুদ্ধে আছে, তার প্রভাবও এদের উগ্র ও সমাজবিদ্বেষে প্রণোদিত করেছে। এই কোলকাতারই বনেদি পয়সাওয়ালা ঘরের যে সব ছেলেদের সুরাসক্তি (সংগে সংগে অনেকের মাদক শক্তিও থাকে) দূর করার সূত্রে পরিচয় হয়েছে, তাদের মধ্যে দেখেছি মায়ের ও বাবার প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা। এদের কিশোর অপরাধী বলে অভিহিত করা যায় না। এরা বেশির ভাগই দলে মেশে না, মারপিট করে না, অশ্লীল কথা বলে না, কিন্তু অসন্তোষ ও ক্রোধে এরা সবাই যেন ছটফট করছে। রাগের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এদের অভি-ভাবক (মা কিম্বা বাবা) বিশেষ করে মা খুব কড়া, পরিবারে সকলেই তাঁকে ভয় পায়, সমীহ করে। ছেলের লেখাপড়ার দিকে বাবার থেকে মায়ের নজর বেশি। এক এক জনের দু' তিনজন করে গৃহশিক্ষক, (আজকালকার উচ্চ-মাধ্যমিকে একজনের পক্ষে সব বিষয় পড়ানো সম্ভব নয়), খেলা বা আড্ডা দেওয়ার এদের সময় নেই। আর আড্ডা যার তার সংগে তো দেওয়া চলে না, আশেপাশে যারা থাকে তারা চাকুরি কৌলীন্যে অথবা সঞ্চিত টাকার দৌলতে এঁদের থেকে অনেক খাটো। ছোট ভাই বা আত্মীয়স্বজনদের ছেলেদের তুল-নায় এরা ছোটবেলায় পরীক্ষার ফল খারাপ করার ফলে গঞ্জনা শুনেছে, ঝি চাকরের সামনে অপমান বোধ করেছে। মাধ্যমিকটা কোনো মতে পাশ করলেও উচ্চমাধ্যমিকের বেড়া কিছুতেই টপকাতে পারছে না। কেউ পড়া ছেড়ে দিয়ে কোনো কারখানায় শিক্ষানবিশী করছে, কেউ বা স্কুলের খাতায় নাম থাকলেও স্কুলে যাচ্ছে না। পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের কোনো বার-রেস্টুরেন্টে দুপুরটা কাটিয়ে, বিকেলটা কোচিং ক্লাসের বদলে খেলার মাঠে কাটিয়ে (ফেল করার জন্য গৃহ-শিক্ষক ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে) রাত্তির করে বাড়ী ফিরছে। কেউবা ব্যবসা করার জন্য পিতৃবন্ধুর 'জুনিয়র পার্টনার' হয়েছে। এদের টাকাপয়সার অভাব হয় না। মাসী, পিসী, দাদা বৌদির কাছে চাইলেই পায়। যখন ব্যাপারটা আরো কিছুদূর গড়ায়, তখন বাবা মায়ের নজরে আসে। বেশির ভাগ বাবা মা ঘরে সুন্দরী বৌ এনে সমস্যা মেটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন, দু'

একজন চেনাজানা বন্ধুবান্ধবদের সংগে পরামর্শ করে চিকিৎসার চেষ্টাও করেন। সফলতা খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে। এদের সংখ্যা সীমিত, সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি এরা বড়একটা করে না। নিজের ভাই. আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ সফল ব্যবসাদার বা বড় ফার্মের ছোট কর্মকর্তা। এরা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ও হীনমন্যতা দূর করার জন্য নেশার মাত্রা ক্রমশ বাড়াতে থাকে। বাবা-মা ও পরিবার এদের কাছে অনেক আশা করে এদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য বড্ড বেশি কড়া হয়েছিলেন, খুব বেশি নিয়মের শৃংখলে এদের বেঁধে রেখেছিলেন। এরা যৌবনপ্রাপ্তির আগেই নেশা করে বন্ধনমুক্ত ও স্বাধীন হতে চায়। মা বাবার কারাগার থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই বলে নেশা করে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে কল্পনায় বন্দীত্ব অস্বীকার করে বিদ্রোহী হতে চায়। এদের সমস্যা পারিবারিক সমস্যা ঃ—অবশ্য পরিবার সমাজেরই একটা ছোট অংশ, সেই দিক থেকে সামাজিক সমস্যা।

সুরার গুণাগুণ জানালে বোধ হয় অদীক্ষিতদের কিছুটা উপকার হতে পারে। জ্ঞান দেওয়া চিকিৎসায় আমাদের বিশ্বাস নেই যদিও, তবুও এখানে সুরা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোর উল্লেখ করছি ঃ (১) সুরাকে উত্তেজক পানীয় মনে করা ভুল। সুরাপানে গুরুমস্তিষ্ক (Cerebral cortex) নিস্তেজিত হয়, ফলে যাকে আমরা জৈবমস্তিষ্ক বলি,—সেই লঘু-মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবার ফলে সুরাপায়ী সাময়িকভাবে বেপরোয়া হয়ে ওঠে, অসামাজিক বা নিষিদ্ধ কাজ করার বা কথা বলার লজ্জাভয় চলে যায়; পরে অবশ্য মাত্রা বাড়ালে সারা দেহ অবসন্ন হয়, সে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। (২) সুরা আদৌ যৌন উত্তেজক (aphrodisiac) নয়, নারী সঙ্গসুখের আশায় যারা সুরাপান করেন, তাঁরা হয়তো সুরার প্রভাবে নীতিহীন, সৌন্দর্যজ্ঞানহীন ও বিচারবিবেচনাশূন্য হয়ে কুৎসিৎ বারবনিতার বা বাড়ীর প্রৌঢ়া পাচিকার সঙ্গে প্রেমহীন যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন এই পর্যন্ত; (৩) আর একটা ভুল ধারণা—সুরাপান মানুষকে সোশ্যাল বা সামাজিক করতে সাহায্য করে, চাপা উত্তেজনা দূর করে মানুষকে সামাজিক করে তোলে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কথাটা বোধহয় ঠিক। বিচ্ছিন্নতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা বুঝি সরাবখানায় পাঁচজনের সঙ্গে বসে সুরাপান করলে দূর হয়ে যায়। কিন্তু নিজে পান না করে সুরাপায়ীদের আলাপ-আলোচনা কিছুক্ষণ শুনলেই বোঝা যাবে যে তারা কথা বলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভাববিনিময় করছে না,

'কমিউনিকেশন' ঘটছে না। প্রত্যেকেই নিজের কথা বলছে, অন্যের কথা শুনছে না।

অনেক কিশোর (১৮।১৯ বছরের) সুরাপানের উপকারিতা সম্পর্কে আমাদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে থাকে। তাই এই কথাগুলো লিখতে হল। বিশেষজ্ঞদের মতে মনের সব রকমের ক্রিয়াকলাপ ও শক্তি সুরাপানে হ্রাস পায়। দেখার ও শোনার গোলমাল ঘটে, কোনো কিছু ইংগিত বুঝতে বেশি সময় লাগে, জানা কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে ভুল হয়, সময়-জ্ঞান লোপ পায়, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়*। অনেক ছাত্র পরীক্ষার আগে অল্পমাত্রায় সুরাপান করে নিজের মননশক্তি বাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মদ্যপ হয়ে উঠেছে। সুরার ক্রিয়া সম্পর্কে এই ভুল ধারণা অনেক বয়স্কেরও আছে।

আমাদের দেশে সুরাপায়ীর সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে; কিন্তু সেই অনুপাতে কিশোর-কিশোরীর সুরাশক্তি বেড়েছে কিনা বলা যাবে না। মনে হয় বড় দরের সামাজিক সমস্যা এখনও পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি আমাদের সুরাসক্ত কিশোর-কিশোরী।

মাদকাসক্তির (Drug addiction) বেলায় কিন্তু সে কথা বলা চলে না।

মাদকাসক্তি ঃ "ড্রাগ-এ্যাডিকশনের" বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'মাদকাসক্তি' কথাটি হয়তো উপযোগী নয়। উপযুক্ততর কথা জানা নেই, কাজেই এইটেই ব্যবহার করছি। 'মাদকাসক্তি'র সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের আগে মাদক কি, আমাদের জানা দরকার। নেশার জিনিষমাত্রেই 'মাদক'—অভিধানে এই

---

* Almost all psychological functions are impaired by Alcohol. Taking any considerable amount of alcohol... ...lessens one's ability to discriminate between letters on a chart, to distinguish between sounds..... to react to a signal quickly, to perform tasks calling for simple motor co-ordination,.....to remember poetry, to solve problems of arithmetic, to judge intervals of time, or to judge one's own success in performing tasks (Jellinck, and McFarland. Analysis of psychological experiments on the effects of Alcohol – Quar J Stud-Alcohol, 1940, I, referred by Stephens O.P. Cit.)

করমই লেখা আছে। কিন্তু সাধারণের ধারণা, যে সব ওষুধে বা দ্রব্যে ঘুমের উদ্রেক হয়, তাদের নাম মাদক। এদের কাজ স্নায়ুতন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বাড়ানো, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া কমানো, মস্তিষ্কের কোষগুলোকে অসাড় করে দেওয়া। মরফিন ও হিরোইন সব থেকে বেশি পরিচিত মাদক। অহিফেন বা চলতি কথায় যাকে বলে আফিম; তৈরী হয় পোস্ত ফলের রস থেকে; মরফিন আফিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপক্ষার (alkaloid)। এই মরফিনের সংগে অন্য একটি রাসায়নিকের ক্রিয়াফলে হিরোইন তৈরী হয়। হিরোইনের চোরাকারবারে সারা পৃথিবীব্যাপী হাজার হাজার লোক নিযুক্ত। ইন্টারপোল ও অনেক দেশের পুলিশের চোখ এড়িয়ে এই হিরোইন দেশদেশান্তরের, বিশেষ করে ধনীদেশে আমদানি হচ্ছে। হিরোইন-এর ক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি হয় বলে সব দেশের পয়সাওয়ালা কিশোর ও তরুণদের কাছে হিরোইন খুবই প্রিয়। রাগমোচনের (Orgaism) উত্তেজনা অনুভূতির সংগে হিরোইন সেবনের অনুভূতিকে অনেকে তুলনা করেছেন; আবার কোনো কোনো হিরোইন-সেবী বলেন। এ আনন্দ কেবলমাত্র ব্রহ্মোপলব্ধির আনন্দের সংগেই তুলনীয়। মরফিন, হিরোইন কোডিন—ইত্যাদি আফিমজাতীয় মাদক ও অন্যান্য যে সব 'ওষুধ' বা পদার্থ সেবন করে কিশোর তুরীয়ানন্দ লাভ করে, তাদের আমরা মোটামুটি গুণানুসারে নিম্নলিখিত কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করতে পারি : (ক) মানসিক রোগচিকিৎসায় যে-সব ওষুধ ব্যবহার হয়; যাকে এককথায় বলা হয় 'সাইকোথেরাপিউটিক' ড্রাগস -(খ) অমূল প্রত্যক্ষ বা অলীক দর্শন, অলীক শ্রবণদায়ক ওষুধ, যার ইংরেজি নাম হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ, (গ) স্নায়ু উত্তেজক ওষুধ, যার ইংরিজি নাম স্টিমুল্যান্টস্, (ঘ) যন্ত্রণা বা অস্থিরতা নাশক ওষুধ (সেডেটিভ্), (ঙ) আচ্ছন্ন বা চেতনানাশক ওষুধ নারকোটিক। 'সাইকোথেরাপিউটিক' ওষুধ প্রধানত দুই শ্রেণীর—একশ্রেণী উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা দূর করে মনে শান্তি আনে (ট্রাংকুই-লাইজার), মিলটাউণ্ড, কামপোজ্, নাইট্রোসান, লারগাকটিল ইত্যাদি; অন্য শ্রেণীর নাম বিষণ্ণতানাশক (অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট)—ডেপ্রসোনিল, স্যারোটেনা ইত্যাদি। অমূলপ্রত্যক্ষ উদ্রেককারী বস্তুর মধ্যে পড়ে এল, এস, ডি ও গঞ্জিকাশ্রেণীর দ্রব্য—মারিজুয়ানা, হাশিস, ভাঙ ইত্যাদি। উত্তেজক বা স্টিমুল্যান্ট জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে ডেক্সেড্রিন, মেথেড্রিন, কোকেন, ম্যানড্রেক্স প্রভৃতি। 'সেডেটিভ'-এর মধ্যে লুমিনাল, গার্ডিনাল, ফেনোবার-

বিটন, আফিম, কোডিনই প্রধান ; আর নারকোটিকের মধ্যে পড়ে আফিম, মরফিন, হিরোইন পেথিডিন।

এক এক দেশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মাদকের প্রচলন। আমাদের কিশোররা সাধারণত নিস্তেজক (সিডেটিভ, নারকোটিক) দ্রব্যের মধ্যে ফেনোবারবিটোন, আফিম, কামপোজ, উত্তেজক স্টিমুল্যান্ট দ্রব্যের মধ্যে রিটালিন, ম্যানড্রেক্স ; অমূলপ্রত্যক্ষ ও অলীকদর্শনদায়ক এল, এস্, ডি, গাঁজা প্রভৃতি ব্যবহার করে। মর্ফিন, পেথিডিন্ - ডাক্তারী ছাত্রদের মধ্যে বেশি চালু, কেননা এগুলো ইনজেক্সনরূপে ব্যবহৃত হয়। ইনজিনিয়ারিং কলেজের ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর কিশোরকিশোরীরা বিড়ি অথবা সিগারেটের তামাকটা বের করে নিয়ে তার মধ্যে গাঁজা ভরে ধূম পান করে ; গাঁজার বিড়িও কিনতে পাওয়া যায়। মারিজুয়ানা ও এল. এস, ডি পশ্চিমী কিশোরদের মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয়, আমাদের দেশে গাঁজার বিড়ি—চলতি নাম—'গ্রাস' খুবই চালু। কোন দ্রব্য সেবনে নেশা করা হচ্ছে, সেটা জানা চিকিৎসকদের পক্ষে খুবই দরকারী। কিছু কিছু দ্রব্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হবার পর সেগুলো ছাড়া ব্যবহারকারীর আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও শক্ত ; কারণ প্রত্যাহরণ বা অভ্যাস থেকে অপসরণের দরুণ যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গের সৃষ্টি হয়। তখন অভ্যাস বা আসক্তি প্রত্যাহরণকালে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন চিকিৎসক।

কিশোরদের মাদকাসক্তি সমস্যা খুবই জটিল। এর ব্যাপকতা বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গত দুই দশকে। আমাদের ছাত্রদের মাদকসেবন যে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেচে, এবিষয়ে সমীক্ষকরা ও গবেষকরা আজ একমত। চিকিৎসকরা, বিশেষ করে মনোরোগ চিকিৎসকরাও সেই রকম মনে করছেন। নিজেদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করার আগে কিছু সমীক্ষালব্ধ তথ্য পেশ করছি। সমীক্ষা ও ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা কিন্তু খুবই সীমাবদ্ধ—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ (১৯৭৭), ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (১৯৭৯), এর মত দুটি প্রখ্যাত সংস্থা এবং আগরওয়াল (১৯৭৫), পুলিয়েল ও অন্যান্যদের (১৯৮১) যে-সব সমীক্ষার ফলাফল নাগ-এর (Adolescents in India) পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্য এবং গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু তথ্যগুলি কোনো সিদ্ধান্তে আসা বা সামান্যীকরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরো ব্যাপক ও বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা এঁরা বা অন্যরা ভবিষ্যতে চালাবেন আশা করছি।

আমাদের সামান্য অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত অপ্রকাশিত তথ্য ওদের সংগে অনেকাংশে মিলছে কিন্তু কোনোও চিকিৎসকের ও বন্ধুচিকিৎসকের অভিজ্ঞতার বিনিময় বা যোগফল থেকে আমরা শুধু অনুমান করতে পারি যে কিশোরদের মধ্যে মাদকাসক্তি বাড়ছে—এই মাত্র। যে-সব সমীক্ষার উল্লেখ করেছি তাতে পূর্বের কোনো সমীক্ষার সংগে তুলনামূলক বিচার নেই। আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে কোলকাতার কোনো এক মেডিকেল কলেজের হস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে আমরা দলবদ্ধ মাদকাসক্তের সন্ধান পেয়েছি; তাদের কয়েকজনকে চিকিৎসক হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করারও সুযোগ হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজন আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ, দু'একজন মৃত, দুএকজন বেঁচে থাকলেও আসক্তির জন্য, বলা চলে, অর্ধমৃত। এদের কাউকেও কিশোর বলা চলে না; তবে এদের ইতিহাস এবং প্রায় একই সময়ে আরো যে-সব কিশোর ও তরুণদের এই মাদকাসক্তির জন্যে সংস্পর্শে এসেছি ও জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ হয়েছে, তা থেকে আমাদের মনে হয়েছে তরুণ ও অন্তকিশোরদের (ছাত্রাবস্থায়) আসক্তির কারণ প্রায় একই রকমের ছিল। তার সংগে গত দশকের এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না। মনে হয়, ইয়োরোপ আমেরিকায় ছাত্র আন্দোলন, আমাদের দেশের নক্সাল-আন্দোলন, দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে কিশোর—বিশেষ করে ছাত্র-কিশোরদের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছে, তাই আসক্তিরও আপাত-পরিদৃশ্যমান কারণ বদলেছে। গাঁজার বিড়ি নতুন কিছু নয়; আমাদের ছাত্রাবস্থায়, তিরিশের দশকেও এর প্রচলন ছিল। মনে রাখা দরকার, ছাত্র-সংখ্যা বেড়েছে, স্কুল, কলেজ ও ছাত্রাবাসে স্থানাভাব ঘটেছে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, দুর্নীতি ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ নেই—পরীক্ষার মধ্যেও ঢুকেছে, কিশোরদের (বিশেষ করে অন্ত-কিশোরদের) মনে হতাশা বেড়েছে, ছাত্র-ইউনিয়নগুলির নির্বাচনকালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগের থেকে অনেক বেশি তীব্র ও মারমুখী হয়েছে। ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ছাত্র-কিশোরদের অস্থিরতা ও প্রক্ষোভ-পরায়ণতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। অভিভাবক ও শিক্ষকরা আর আগের মত শ্রদ্ধা ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারছেন না। ছেলেরা অনেক বেশি বেপরোয়া, সুরাসক্তি ও মাদকাসক্তির কারণ বদলেছে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কাজেই নেশায় আসক্ত মোট ছাত্র-কিশোরদের সংখ্যাও বেড়েছে। আনুপাতিক হার নির্ণয় করার

মত সমীক্ষা বেশি হয়নি, চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি ব্যক্তিগত ও স্থানিক—কাজেই বৃদ্ধির হার সম্পর্কে কোনো কিছু মন্তব্য করা চলে না। তবে সামাজিক গুরুত্বের দিক থেকে কিশোর অপরাধের সংগে তুলনীয়তা বটেই ; অনেকের মতে গুরুত্ব অনেক বেশি।

সমীক্ষাগুলি থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে (১) কোলকাতার মেডিক্যাল হস্টেলের ও আইন কলেজের ছাত্রদের স্থান আসক্তদের তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় ; উচ্চবিত্ত পরিবারের ছাত্রদের সংখ্যা এই তালিকায় বেশি, মাদক-খরচা ছাত্র পিছু ১০ থেকে ৭০ টাকা (Indian Institute of Social Welfare and Management, 1979) কতগুলি ছাত্র নিয়ে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে, বা তাদের বয়স কত—তার উল্লেখ উৎসে অনুপস্থিত, (২) আগরওয়াল ও সহকর্মীরা লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজের ১০২টি (৮৪ ছেলে, ১৮ মেয়ে) ছাত্র নিয়ে সমীক্ষা করেন, (random survey) তবে তাদের আর্থ-সামাজিক একই ধরনের। জানা গেছে এদের ৮২ জন মাদক 'কখনও সখনও' সেবন করেছে (abused drugs sometimes or other) ; এদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা কম (কত তা বলা নেই) ; সুরাপান বেশি ছেলে করেছে, মাদকের মধ্যে এদের বেশি প্রিয় 'ম্যানড্রেক্স' (Agarwal, Singh, Kohli, Ind. Prac, 28, 505, 1975) ; (৩) আই. সি. এম, আর (1977) এর সমীক্ষা থেকে জানা যায়, কোলকাতার অনেক ছাত্র, চণ্ডীগড়ের শতকরা ১৯ জন, বোম্বাইএর শতকরা ২০ জন কোনো না কোনো ধরনে মাদকে আসক্ত (কত জন ছাত্র নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, তার কোনো উল্লেখ নেই) ; দিল্লীতে এই সংখ্যা শতকরা ৩৩ জনের মত, এই সব ছাত্রদের বারো ভাগের একভাগের অবস্থা খুবই শোচনীয় এবং আরো কম বয়সী—স্কুলের ছেলেরাও মাদক সেবনে অভ্যস্ত হচ্ছে। (৪) বরোদার সমীক্ষাটি চালানো হয় ১৪১১ জন ১৪ থেকে ১৯ বছরের ছাত্র-কিশোরদের নিয়ে। শতকরা মোট ৩০ জন নেশা করে বলে জানা গেছে ; সংখ্যা কলেজে বেশি, স্কুলে কম। মেয়ে আসক্তরা সবই প্রায় কলেজের ছাত্রী। সিদ্ধি বা ভাং প্রধান নেশার জিনিষ ; মেয়েরা 'ড্রাগ' এর ভক্ত। নাগ প্রাধানত 'তামাক' নিয়ে কাজ করেছেন, নিকোটিনের ক্ষতিকারিতা সম্পর্কে ওঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। আমরা 'নিকোটিন-আসক্তি' নিয়ে বর্তমানে আলোচনা করছি না। বরোদার সমীক্ষা চালিয়েছেন Puliyel, Agarwal and Chausarea। ১৯৮১ সালে এর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

সমীক্ষকরা আরো বলেছেন এবং আমরাও দেখেছি যে নেশার বস্তু সব সময় এক থাকে না; অনেক সময় দুতিন রকমের নেশার দ্রব্য একসংগে সেবন করা হয়। মদ এবং ডায়েজাপাম জাতীয় শান্তিদায়ক ওষুধ (tranquiliser) একসংগে ব্যবহৃত হলে এবং একাধিক নেশার জিনিষ একসংগে সেবনের প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি ও বিশেষ ক্ষতিকর।

কেন কিশোররা মাদকাসক্ত হয়? সমাজের কোন শ্রেণীর কিশোরদের মধ্যে মদ ও মাদকদ্রব্যের আকর্ষণ বেশি? এই প্রশ্ন দুটির মীমাংসা না হলে প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। সমীক্ষকদের ও চিকিৎসকদের মতে অবস্থাপন্ন ঘরের কিশোরদের মধ্যে মাদকাসক্তি বা নেশা করার প্রবণতা বেশি। সমীক্ষকরা চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থী, আইনের ছাত্রছাত্রী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত কিশোরদের নিয়ে সমীক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে আবার অনেকেই হস্টেলের ছাত্র। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডাক্তার ও আইন পড়তে আসে, হস্টেলে থাকে যারা, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে যারা, ধরে নেওয়া যেতে পারে তারা অধিকাংশই বিত্তশালী পরিবার থেকে এসেছে। আর চিকিৎসকদের কাছে যে সব অভিভাবক মাদক ও মদে আসক্ত কিশোরদের নিয়ে আসেন; তারাও শতকরা নব্বইজন ছাত্র এবং মেডিকেল, ইনজিনিয়ারিং ইত্যাদি কলেজের ছাত্র। তাদের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল। স্বভাবতই সেই কারণে, এই দুই দলের অভিমত অভিন্ন। দরিদ্র কিশোরদের মাদকাসক্তি বেড়েছে কিনা তা নিয়ে কোনো কিছু বলার মত তথ্য আমাদের হাতে নেই। আমরা জানি চাষী ও শ্রমিকদের ঘরে তামাকের নেশাতে কিশোররা অভিভাবকদের সমর্থন পায়। অন্য সস্তা নেশা গরীব খেটে-খাওয়া ঘরের কিশোররা নিষিদ্ধ বলে মনে করে না। নেশায় অভ্যস্ত হলেই অপরাধপ্রবণ হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু আসক্তির খরচ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। আজ যে-পরিমাণ মদ ও মাদকে নেশা হচ্ছে, আসক্তির নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী কিছুদিনের মধ্যেই তার পরিমাণ বাড়াতে হয়, না হলে নেশার অনুভূতি হয় না। নেশার খরচও বাড়তে থাকে; তখন টাকা জোগাড় করতে তারাও চুরি ছ্যাঁচড়ামি করতে বাধ্য হয়; অবশ্য অপরাধ বাড়ীর মধ্যেই প্রায়শ সীমাবদ্ধ থাকে। তবে উগ্র হিংস্র কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়তে এদের দেখা যায় না। 'ডিলিন্‌কোয়েনসির' আলোচনায় আমরা এক দলের কথা উল্লেখ করেছিলাম, (যারা মারপিটের মধ্যে যায় না,

নেশা ও অবৈধ যৌনকার্যে ব্যাপৃত থাকে) সেই দলে যোগদান করতে বাধ্য হয় অনেক কিশোর, বিশেষ করে যখন স্কুল-কলেজে যাওয়া আর সম্ভব হয় না।

কেন এরা নেশা করে, এ নিয়ে নানা রকমের অভিমত আমাদের নজরে পড়েছে। পশ্চিমী সমীক্ষকদের একদল সব কিছুর জন্যে পরিবারকে দায়ী করেন। তাঁদের দেশের অভিভাবকরা আজকাল বেশির ভাগই অনুমতি-দায়ক (permissive) এবং সন্তানদের ব্যাপার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। তাই সমাজবিজ্ঞানী প্রজন্ম-পার্থক্য ও যোগাযোগের অভাবকে নেশা করার প্রধান কারণ বলে মনে করেছেন। অন্য একদল 'জেনারেশন ও কমিউনিকেশন গ্যাপ্'-এর চেয়ে 'প্রাচুর্য-অনীহা' বা তথাকথিত 'হিপি কালচার'-এর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের দেশের কিছু প্রতিবেদনেও এই রকম অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে (Mohon, and Arora J. of Indian Med. Asso.; 66, 2·8, 1976)। আমরা কিন্তু অতিমাত্রায় কড়া ও পুত্রের ভবিষ্যৎ দিয়ে রীতিমত ভাবিত এবং ছেলের পরীক্ষাফলের জন্য খুবই গর্বিত একাধিক পিতার কথা জানি, যাঁরা ইনজিনিয়ারিং কলেজের নীচুর ক্লাসের পুত্রের মাদকাসক্তির জন্য চিকিৎসকের কাছে এসেছেন এবং পুত্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন। একটি মেডিকেল ছাত্রের কথা জানি, যার বাড়ীর সকলেই খুব গোঁড়া। কড়া শাসনে থেকেছে, বাড়ী থেকে কলেজে যাতায়াত করেছে; পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে, সুশীল-সুবোধ বালক বলে প্রশংসিত হয়েছে। দুবছরের মধ্যেই পেথিডিনে আসক্ত হয়েছে, এবং পাশ করার পর আসক্তি চরমে ওঠায় বাড়ীর লোকের সংগে স্বেচ্ছায় আসক্তি ছাড়াবার জন্য চিকিৎসা করতে এসেছে। সমাজের মধ্যে, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ক্রম-রূপান্তর ঘটছে, বিচ্ছিন্নতাবোধ ক্রমশ ব্যাপক ও তীব্র হচ্ছে—এই একটি সামান্য কারণ সবক্ষেত্রে মোটামুটি প্রযোজ্য বলা যায়। আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অনেক জটিল কারণ থাকে যার বিবরণ-বিশ্লেষণ দেবার প্রয়োজন এখানে নেই। আসক্তদের চিকিৎসা নিশ্চয়ই দরকার কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি দরকার, প্রতিষেধক ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও প্রবর্তন। প্রতিষেধক ব্যবস্থার পরিকল্পনার জন্য আরো সমীক্ষা, আরো তথ্য সংগ্রহ দরকার, যা থেকে মৌল ও সামান্য কারণগুলি সম্পর্কে আমরা আরো বেশি জ্ঞান লাভ করতে পারি।

অনেকেই কিশোর দুষ্ক্রিয়তা ও কিশোরদের মাদকাসক্তির প্রতিষেধক

ব্যবস্থা হিসেবে কড়া আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতা ও নিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাঁদের সংগে আমরা একমত নই। মধ্যযুগে চুরির জন্য যে শাস্তি দেওয়া হত, সেই ভয়ংকর শাস্তির ভয়ে চুরি কমেনি। খুনীকে আইনানুগ ভাবে খুন করে কি সমাজে খুনের সংখ্যা কমেছে? চরমদণ্ড না দিলে খুনের সংখ্যা বৃদ্ধি হত, এর সপক্ষে যুক্তি দেখাতে গেলে 'স্বভাব দুর্বৃত্তবাদ' তত্ত্ব মেনে নিতে হয়। এ-যুগে তা সম্ভব নয়।

সমীক্ষকরা কলেজ হস্টেলে যে সব মাদক সেবীদের সন্ধান পেয়েছেন তাদের ঠিক 'এ্যাডিক্ট বলা চলে কিনা, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। শিশু ও আদিকিশোররা নানা কারণে কিছু কিছু কু-অভ্যাসে রত হয়, সেদিকে বেশি নজর না দিলে, সে সব বিষয়ে অভিভাবকরা উৎকণ্ঠিত না হলে, সেগুলোর অধিকাংশই আপনা থেকে চলে যায়। তেমনি আমাদের ধারণা স্কুল-কলেজের ছেলেদের বেশির ভাগই প্রাথমিক মজার পর, এই কু-অভ্যাস থেকে আপনা থেকে মুক্ত হতে পারে। অবশ্য, কিছু ক্ষেত্রে ঠিকমত উপদেশ দেবার প্রয়োজনও থাকে। তবে এদের মধ্যে অনেকে না হোক, কিছু ছেলে যে ভবিষ্যতে আসক্ত হয়, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভুল আচরণের জন্যে অনেক কিশোর আসক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমটায় অনেকেই নেশা করে বিনা প্রয়োজনে, মজা পাবার জন্যে, অন্যদের চাপে। মেডিকেল হস্টেলের ছেলেরা বিনামূল্যে নেশার জিনিস হাতে পায়, ওষুধ বিক্রেতাদের নমুনা (sample) বিতরণের দৌলতে। বিজ্ঞানের ছাত্ররা ল্যাবরেটরি থেকে অনেক সময় নেশার জিনিষ সংগ্রহ করে। প্রথমদিকে সংগ ও সহজে হাতের কাছে নেশার দ্রব্য পাওয়াটাই আসক্তির প্রাথমিক কারণ। পরে পরীক্ষা, বা যৌন-ব্যাপার সংক্রান্ত কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য ছেলে বা মেয়ে মাদক সেবনের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়। মাদক সেবনে দুঃখ কষ্ট ভোলা যায়—এই ধারণা থেকেই কিশোর মাদক সেবন আরম্ভ করে। "দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা থাকে না, সমস্যাগুলো আর সমস্যা মনে হয় না, দৃষ্টিভংগী বদলে যায়, সব কিছু স্নিগ্ধ ও শান্ত মনে হয়, সমস্যা-সমাধানের চিন্তা, সংগ্রামী মনোভাব দূর হয়ে যায়"— এই জন্যে মাদকের প্রতি আমার এত আসক্তি* কথা-

---

* You simply do not worry about things you worried before You look at them in a different way...Every-

গুলো একটি মেয়ের। এই সময়, কিশোরকিশোরীর এই মানসিক সংকটের মুহূর্তে অভিভাবক বা শিক্ষক যদি আন্তরিক সহানুভূতির সংগে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, তাহলে সবক্ষেত্রে না হোক, অনেক ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত হবার দুর্ভাগ্য থেকে সে রক্ষা পায়। আসক্ত হওয়া মানে মাদকের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলে, সংগ্রহের জন্য যে কোনো মূল্য দিতে বা ঝুঁকি নিতে আসক্ত প্রস্তুত। এ ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ক্রমশ চলে যায়। তার 'প্রিয়তম দ্রব্যটির' এমন কোনো কাজ নেই যে সে না করতে পারে। মাদকদ্রব্যের সংগে ব্যবহারকারীর সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড় হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মাদক সেবন বাধকারী অভ্যাসে পরিণত হয়। এই অবস্থায় দেহমন দুইই মাদক ছাড়া নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পাকাশয়, যকৃৎ, বৃক্ক, ফুসফুস সব যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপই মাদকনির্ভর হয়ে যায়। কারুর মতে, এই শারীরিক বিপর্যয়ের মূলে থাকে মানসিক নির্ভরতা। আবার অনেকে মনে করেন, আসক্তের শারীরবৃত্তিক ধর্ম মাদকের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় এবং মাদকক্রিয়া সামগ্রিক শারীরবৃত্তিক ক্রিয়ার শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। তবে মনে রাখা দরকার, আফিমজাতীয় (মর্ফিন, হিরোইন, কোডিন) ওষুধের ক্ষেত্রে এই শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন যতটা ঘটে, অন্যান্য নেশার দ্রব্যে ততটা ঘটে না। চা-কফি-সিগারেট ইত্যাদি শুধুই আভ্যাসিক ফাঁদ, নির্ভরতা এ-ক্ষেত্রে যতটা মনস্তাত্ত্বিক, ততটা শারীরবৃত্তিক নয়।

আমাদের সমাজে সুরাপায়ীর চেয়ে মাদকাসক্তকে বেশি অবজ্ঞা বা ঘৃণা করা হয়। অনেকের ধারণা মাদকাসক্তমাত্রেই চরিত্রহীন, উগ্র, উচ্ছৃংখল, যৌনাপরাধে অভ্যস্ত ও অকুণ্ঠ। এ ধারণা ঠিক নয়। অহিফেনজাতীয় মাদক স্নায়ুতন্ত্রে সর্বাত্মক নিস্তেজনা নিয়ে আসে, কাজেই আসক্তদের পক্ষে চণ্ড বিক্রম ও উগ্রতা প্রকাশ করা বেশির ভাগ সময়েই সম্ভব নয়। মাদকাসক্তের যৌনলিপ্সা ক্রমশ লোপ পায়, কাজেই যৌনাপরাধ এদের দ্বারা খুব কম ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। এদের বেশির ভাগই পুরুষত্বহীনতায় (impotency) ভোগে অথবা যৌনব্যাপারে আত্মরতিক্রিয়া পছন্দ করে।

---

thing is always cool, everything is alright. It makes you not feel like. fighting the world....I mean its that sort of a thing, you know, when you are not hooked—Edwin M. Schur, Ed Worsley – Problems of modern socity, Penguin, 1972 p. 417.

হার্বার্ট বার্জারের অভিজ্ঞতা অনেকটা অনুরূপ। (To dispel the nightmare of Narcotics—Principles of Sociology: Young & Mack, 2nd edition p 370)। তাঁর মতে মাদকসেবীরা খুব কমই সমাজ-দ্রোহী হয়। এমনকি, লোভের বশে ছিনতাই-এর মত কাজও তারা করে না। হিংস্রতা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। এর সেবনে ভয় কমে, অস্থিরতা-চঞ্চলতা থাকে না, সুনিদ্রা হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম। বার্জার বোধ হয় একটু অতিশয়োক্তি করেছেন। ভয় কমাবার জন্যে, অস্থিরতা দূর করার জন্যে মাদক সেবনে অভ্যস্ত হবার পর মাত্রা বাড়িয়েও দেখা যায়, ভয় কমছে না, অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। এরা প্রতিযোগিতায় কুণ্ঠিত, দুঃখ কষ্ট স্বীকারে অক্ষম, সিদ্ধান্ত নিতে অশক্ত, পরিবেশ থেকে পালিয়ে যেতে চায়। মাদক সংগ্রহের জন্যে মাঝে মাঝে দুষ্ক্রিয়া যে না করে, এমন নয়। যাঁরা বলেন যে মাদক সেবনে অস্বাভাবিকতা কমে এবং মাদকের দৌলতে সে কিছুটা সামাজিক হতে পারে, তাঁদের সংগে আমাদের অভিজ্ঞতা মেলে না। বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন তরুণ মাদকসেবীর সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। এদের মধ্যে একজনই মাত্র মাদক ত্যাগ করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন; দুজন আত্মঘাতী হয়েছেন আর দুজন কোটরাশ্রয়ী হয়ে সমাজসংস্পর্শরহিত জীবন যাপন করছেন।

সমাজদ্রোহী না হয়েও মাদকসেবীরা অসামাজিক। শেষের দিকে এরা সমাজের বাইরেই চলে যায়, এদের নিজেদের একটা স্বতন্ত্রসমাজ (Subculture) গড়ে ওঠে। অন্যান্য নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত তারা বাইরের সমাজের সকলকেই প্রায় শত্রু মনে করে এবং তার ফলে নিজেদের মাদক সেবনের সপক্ষে অনেক যুক্তি তৈরী করতে পারে। শেষে যে সব কথা লিখলাম সেগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের একজন সমাজতাত্ত্বিকের চিন্তাভাবনা। আমাদের দেশে এই সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রের মত অত বড়দরের সমস্যা নয়, 'হিপি কালচার' কিছু শিল্পী-সাহিত্যিকের নিজস্ব 'বোহেমিয়ানপানা' বাড়িয়ে সাময়িকভাবে ঘরছাড়া করেছিল, এখন তারা স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষেধক ব্যবস্থা যাঁরা নেবেন, তাঁদের কিছুটা সুবিধে হতে পারে ভেবে মাদকসেবীদের আচরণ ও মানসিকতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য পরিবেশন করলাম। আর একটা কথা বলা দরকার। মাদকসেবনের ব্যাপার কিশোররা গোপন করে, তাই অনেক সময় অভিভাবক ও চিকিৎসক কিশোরের গুটিয়ে নেওয়ার মনোবৃত্তি ও নিস্তেজনা প্রবণতা

দেখে মাদকসেবীকে স্কিজোফ্রেনিয়া অথবা ডিপ্রেসনের রোগী বলে ভুল করতে পারেন।

আর একটা এই অধ্যায় শেষ করার আগে জানানো দরকার যে, আমরা কৈশোরের শারীরিক রোগ বা যে সব মানসিক রোগ মনোরোগের চিকিৎসকদের সাহায্য বাধ্যতামূলক (যেমন, epilepsy, schizophenia, mental retardation, hyper kinesis ইত্যাদি) এবং কিছু ছোটখাটো অসুখের (stutering, encureus ইত্যাদি) আলোচনা এই পুস্তকের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে ধরে নিয়েছি। যে সব সমস্যার আমার মতে বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব আছে,—সেইগুলো সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

সারাংশ

কৈশোর সমস্যাকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ সদ্ভাবী ও অসদ্ভাবী। সদ্ভাবী ও সাধারণ সমস্যার মধ্যে পড়ে 'উপনাম' সমস্যা, দলানুগত্য সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা ও বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা। এই সমস্যার মধ্যে পারিবারিক সমস্যার গুরুত্ব অধিক সমস্যা সমাধানে অক্ষম পিতা অনেক সময় পারিবারিক সমস্যা পীড়িত কিশোরকে মনোরোগী সাব্যস্ত করে ডাক্তারের ওপর তার দায় দায়িত্ব অর্পণ করতে চান। দুরকম প্রতিক্রিয়া এর ফলে ঘটতে পারে। কিশোর নিজেকে সত্যিই রোগী মনে করে ও মাথা ঠান্ডা করার ও বিষণ্ণতা দূর করার ওষুধ সেবন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্রোহী কিশোর অসুস্থতা সত্ত্বেও চিকিৎসক ও পিতাকে অগ্রাহ্য করে তাকে ওষুধ খাওয়ানো বা ডাক্তারের কাছে নেওয়া সম্ভব হয় না। বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যার অনুগত পরিবর্তন ঘটেছে। এখনকার ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র বিদ্যার্জনকে জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মনে করে না। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং শিল্প উৎপাদনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন বাড়ছে, কিন্তু ঠিক কি ভাবে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিলে শিক্ষাপ্রাপ্তরা সমাজের ও উৎপাদনের উন্নয়নে সক্ষম হবে তার সঠিক পরিকল্পনা রাষ্ট্র পরিচালকরা এখনও করে উঠতে পারেননি। তাই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষার প্রতি কিশোরকিশোরীদের অনুরাগ কমছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যালয় থেকেই কিশোরকিশোরীরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। অন্তকিশোররা বিবাদমান গোষ্ঠীতে

বিভক্ত হয়ে লেখাপড়ার চেয়ে 'পাওয়ার পলিটিক্সকে' গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলেও নতুন ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটছে।

আজ উচ্চশিক্ষার সময় দীর্ঘ ও বিলম্বিত, উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যাও অগণিত। একদিকে তারা আর্থিক ব্যাপারে অভিভাবকদের ওপর নির্ভর করতে হয় বলে অনুগত থাকতে চায়, অন্যদিকে আবার স্বাধীনভাবে সমাজ পরিবর্তনের ভূমিকা নিতে চায়? এই সাইকলজিকাল উইনিং'-এর সময় অনেকখানি বেড়েছে ; বলা চলে বয়ঃসন্ধিকাল দীর্ঘায়িত হয়েছে। এই সমস্যা নিয়ে অজস্র আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। আমরা ক্ষুদ্রপরিসর এই অধ্যায়ে তার সামান্য মাত্র আভাস দিয়েছি।

আজ কিশোরের মন শুধু বিদ্যালয়ে ও খেলার মাঠে পড়ে থাকে না। সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যম কিশোরকে প্রভাবিত করে। এ-সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে। স্বভাবী ও সাধারণ এই সব সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে ভয়াবহ মনে হলেও—এর সমাধান সম্ভবঃ অবশ্য যদি অভিভাবকরা নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে গররাজী না হয়।

যৌন সমস্যাকেও স্বভাবী সমস্যা বলে পরিগণিত করা উচিত। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীর পাঠক্রমে কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট করা যায় কিনা—সেটা জ্ঞানীগুণীদের ভেবে দেখা উচিত। অবশ্য যৌন শিক্ষা দিলেই যৌন সমস্যা থাকবে না, একথা কেউই বলবেন না। তবে চিকিৎসক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু বলতে পারি যে সমস্যা সমাধান বোধ হয় সহজ হবে।

এর পর এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে 'অপরাধ' সমস্যা। পৃথিবী জুড়ে 'কিশোর অপরাধ' নিয়ে চিন্তাভাবনার অন্ত নেই। যুক্তরাষ্ট্রে 'Juvenile Delinquency' বোধ হয় অপরাধ বিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিকদের, ও মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। আমাদের দেশেও কিশোর দুষ্কৃতিয়তা ক্রমবর্ধমান। এ ছাড়া কিশোর সমাজে মাদকাসক্তি বৃদ্ধি সমাজপিতা ও রাষ্ট্রনায়কদের ভাবিয়ে তুলেছে। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে আমরা শুধু বিষয়টিকে ছুঁয়ে যেতে পেরেছি। তাই সংক্ষিপ্ত সার দেবার কথাই ওঠে না।

প্রশ্ন :—

(১) কিশোর সমস্যা সব দেশেই বেড়ে চলছে—কারণ কি ?

(২) পরিবর্ত্তিকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে কৈশোর সমস্যার সম্পর্ক নিরূপণ কর।

(৩) স্বভাবী ও অস্বভাবী—দুধরনের সমস্যার পার্থক্য বিচার কর।

(৪) কিশোর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ কর।

উৎস :

(1) Adler, Alexandra.—J. of Individual Psychology, 15 : 79, 1959.

(2) Stephens, Educational Psychology, New York, 1962.

(3) Symonds, P. M.—Inventory of themes in adolescent fantasy ; American J. of Orthopsychiatry, 1945, 15.

(4) Margarett, Cormach : She who rides a peacock, Asia Publishing, 1961.

(5) Mukherjee, Bandopadhyay, Chattopadhyay ;—Field Studies in the Sociology of education, 1965-66.

(6) Gangopadhyay, Bicchinatar Bhabisyat (Beng.) Calcutta, 1381 B. S.

(7) Wortis, Soviet Psychiatry, William Wilkins, Baltimore, 1950.

(8) (ed) Lindzey, G.—Handbook of Social psychology, Chap. 27, 1954. reported by Stephens ; O. P. Cit.

(9) Lewin, H. S., Facts and Fears about the Comics, 1953 and Hoult, T. F., Comic books and Juvenile delinquency, 1949, quoted by Stephens., OP. Cit.

(10) Kinsey, A. C., et al ; Sexual Behavior in Human male, Philadelphia, Saundens, 1948.

(11) Kinsey, A. C., et al ; Sexual Behavior in Human Female, 1953.

(12) Semmens, J. P., and Semmes J. H., Sex education of Adolescent Female, Ped clin, North America. 1972.

(13) Masters and Johnson, Human Sexual Response. 1966

(14) Hooker, E. The Homosexual Community—in the Proceedings of XIV International Congress of Applied Psychology—Personalitiy Research, Copenhagen, 1962.

(15) Jeffcoate. T. N., Principles of Gynaecology, 4th. edition Butterworth, London, 1975.

(16) Luckay and Nash, A Comparison of sexual attitude and behavior in an international sample —Journal of Marriage & Family, 31. 364, 1969.

(17) Manab Mon (Beng.) No. I 1976.

(18) Coleman, Abnormal Psychology and Modern Life, India, 1976.

(19) Wirt, R. B., Bridge, P. F. and Golden, J. : Delenquency Prone Personality. Minnesota Med, 1962.

(20) Stain and Sarbineta, Future time perspective : Its relation to the Socialisation process and the delinquent role, J. Cons. clin. Psychology 1968.

(21) Coleman, 1976.

(22) Marwell, G.—Adolescent Powerlessness and delinquent behavior, "Social Issue-spring."—1969.

(23) Coleman, 1976.

(24) Cloward and Ohlin, A Theory of delinquent gangs, New York, Free Press, 1963.

(25) Bandura. Principles of behavior modification, New York, 1969.

(26) Wolfgang, Violence in Human behavior in wertheimer (ed) confrontation : 'Psychology and the problems of to-day ; Glen.iew, 1970

(27) Jacobs, Brunton & Melville, Aggressive behavior, Mental subnormality, and xyy chromosom, 'Nature', 1965.

(28) Welch, Bargaonkar, Herr Psychopathy, Mental deficiency, Aggressiveness and the xyy syndronne, 'Nature', 1967.

(29) 'Hunter, chromatin positive and xyy,' Boys in approved schools, Lancet, 1968.

(30) National Institute of Mental Health. 1 1970.

(31) Unesco Report, 1955 (on Juvenile Delinquency)

(32) Wortis 1 1950, O P. Cit,

(33) Shenin, Crime prevention and law, Novostsi Press, 1981.

(34) Ibid.

(35) Jellnick. and McFarland. Analysis of psychological experiments on the effects of Alcohol ; Quart. J. stud, alcohol, 940 : reported by stiphens, O.P. Cit.

(36) Nag, O.P. Cit,

(37) Edwin, M. Schin—Problems of Modern Society (Ed Worsley) Penguin 1972.

(38) Young & Mack, Principles of sociology 2nd Edition.

পরিশিষ্ট

কৈশোর সমস্যায় একটি দিকে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটেছে। সেই নতুন আরোপিত দিকটি এখানে পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের ধারা ক্রমশ ত্বরিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন সর্বস্তরে ঘটেছে; এ-পরিবর্তন সর্বাত্মক। তাই পরিবর্তি-কালীন সংকট দেখা দিয়েছে সর্বত্র। রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার সব জায়গায় পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এ-ছাড়া সব কিছুই সম্প্রসারিত হচ্ছে, সবকিছুই বাড়ছে; শুধু বাড়ছে না, ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে জ্ঞান ও তথ্যসম্ভার, জটিলতর হচ্ছে, বিমূর্ত হচ্ছে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার। পরিণত মস্তিষ্কের পক্ষেও এই সব কিছুর সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বা পরিচয় স্থাপন সম্ভব হচ্ছে না। মানবশিশু কিন্তু সেই আগেকার মতই অসহায় ও নির্ভরশীল হয়ে পৃথিবীতে আসছে। তার মস্তিষ্কের কোষবিন্যাসে ও স্নায়ুসংস্থায় কোনো সম্প্রসারণ বা সংযোজন ঘটছে বলে এ-পর্যন্ত কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। বয়স্করা যখন চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করছে, তখনও কিন্তু নব-জাতককে সেই পুরনো দিনের মতই বসা, হাঁটা-চলা, কথাবলা শেখাতে হচ্ছে,—এই শিক্ষাসময় সংক্ষেপিত হয়েছে বলে মনে হয় না। আবার প্রাক্-কৈশোর ও কৈশোরের নির্দিষ্ট কয়েকটি বছরের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও তথ্যসম্ভার এবং জটিল বাস্তব-পরিস্থিতির সংগে এ-কালের ছাত্রদের প্রাথমিক পরিচয় ঘটাতে হচ্ছে। গত ৩০ বছরের মধ্যে কিশোরদের পাঠক্রমে সংযোজিত হয়েছে এমন অনেক কিছু যা তিরিশ বছর আগেকার বয়স্কদেরও জানা ছিল না। তথ্যসম্ভার ও জটিলতা-বৃদ্ধি ঘটেছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়, আর বিবিধ গণমাধ্যমের দৌলতে প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষায় কিশোরদের মস্তিষ্ক নিত্য অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে বিবিধ বিচিত্র সংবাদ, বৈপরীত্যে ভরা আদর্শের মডেল, ও নানাধরনের রোমাঞ্চকর উত্তেজক কাহিনী। তাই অভিভাবকরা স্বভাবতই বিচলিত ও চিন্তিত, ছাত্র-কিশোরদের কিছু অংশ বিষণ্ন, বিমূঢ়, কিছু অংশ সংগীসাথী ও পঠনপাঠন থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত, অপকেন্দ্রিক। ক্রমবর্ধিত জ্ঞানের ও তথ্যের সম্ভার—'ইমফর-

মেশন-ইনপুট' তাদের মস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট করানো তাদের শিক্ষকদের পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা এবং এই তথ্যসম্ভার মগজে সংরক্ষিত করা ও নানা ধরনের জটিলতা ছাত্র-কিশোরদের পক্ষে আরো দুরূহ সমস্যার আকারে দেখা দিচ্ছে। এ-সমস্যার সমাধান কি?

সোভিয়েত রাশিয়ার 'ইনস্টিটিউট অব্ চিলড্রেনস্ এ্যাণ্ড টিন-এজার্স হাইজিনে'র (Institute of Children's and Teen-agers' Hygiene) মুখ্য অধিকর্ত্রীর সংগে মস্কো নিউজ (Weekly: No 33, 1982) এর একজন প্রতিবেদকের আলোচনার কিছু অংশ এই প্রসংগে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি। অধিকর্তা. এ্যাকাডেমিসিয়ান সেরদিউকোভাস্কায়া মনে করেন যে সমস্যাটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সমাধান অসাধ্য নয়। পাঠ্য-বস্তু একসংগে অপরিকল্পিত ভাবে মগজে ঠুসে না দিয়ে যদি পরিকল্পিত ভাবে মস্তিষ্কে পরিবেশিত হয়, যাতে তথ্যবস্তু গৃহীত ও মগজে মুদ্রিত হবার সময় পায়, তাহলে আর মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হয় না। কি ভাবে শিক্ষণীয় বিষয় মস্তিষ্ককে পীড়িত ও ভারাক্রান্ত না করে ছাত্রের কাছে সহজগ্রাহ্য ও সহজপাচ্য হতে পারে—এই নিয়েই গবেষণায় রত এই সংস্থার কর্মীরা। খেলাধুলো, আমোদপ্রমোদের মাধ্যমে জটিল বস্তুকে সরল, সরস ও খণ্ডিত করে কিশোর মস্তিষ্কে অনায়াসেই অনুপ্রবিষ্ট করা যায়—বিশ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এবং সেই অনুযায়ী পদ্ধতিও প্রণয়ন করেছেন। গবেষণার ফলে আরো জানা গেছে যে বড়দের মতই অন্তর্নিহিত জৈব ছন্দ (bio-rhythm) অনুযায়ী স্কুলের কিশোরকিশোরীদের কর্মতৎপরতা একই দিনের মধ্যে কমবেশি হয়। জৈবছন্দের এই হ্রাসবৃদ্ধি বড়দের থেকে ছোটদের মধ্যে অনেক বেশী। এর ওপর সামাজিক ছন্দ (social rhythm)—ক্লাসের পড়াশুনো, খেলাধুলো, অবসর, সংগীতশিক্ষা, ইত্যাদি চাপানো হয়। এই দুই ছন্দের (bio-rhythm and social rhythm) সামঞ্জস্য-পূর্ণ মিশ্রণের ওপর কৈশোরের শিক্ষালাভ ও দক্ষতার উন্মেষ নির্ভরশীল। কৈশোরের দৈনন্দিন কাজকর্মের রুটিন তৈরীর ব্যাপারে এই দুই ছন্দসম্পর্কে জ্ঞান ও এদের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোজন বিশেষ গুরুত্ববহ।

শারীরবৃত্তিক দিক থেকে সব ছেলেমেয়ে যে-কোনো কাজের উপযুক্ত নয়। এ কথাটি অনেককাল থেকেই জানা। অভিভাবক ও ছাত্রদের নিজেদের পছন্দমত শিক্ষাক্রম বা বৃত্তি গ্রহণ তাদের পক্ষে সব সময় উপযুক্ত

নাও হতে পারে। শারীরবৃত্তিক কারণে দক্ষতা উন্মেষের পক্ষে সহায়ক নয়, এমন অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করে উত্তরজীবনে অসাফল্যের দরুণ হীনমন্যতায় ভোগেন,—এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম নয়। প্রবণতা পরীক্ষা (apptitude test) সব সময়ে সঠিক ভাবে দক্ষতার নির্দেশক নাও হতে পারে। সমাজের সম্মানজনক পেশার দিকে ঝোঁক নানা কারণেই অভিভাবক বা ছাত্রদের মনে আসতে পারে এবং এই সব শিক্ষায়তনে প্রবিষ্ট হবার প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও তারা সাফল্যলাভ করতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তিক ও মানসিক সংগঠন না থাকার ফলে কিছু পেশা বা বৃত্তিতে তাদের দক্ষতা অর্জনের সম্ভাবনা কম। মস্তিষ্কের বাম ও দক্ষিণ অর্ধের বৃদ্ধি ও বিকাশের তারতম্য এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের কোষবিন্যাসের হেরফেরের দরুণ শারীরবৃত্তিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ঘটে; এবং তার ওপর নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ ধরনের দক্ষতা। শুধু প্রবণতা নয়, শারীরবৃত্তিক ও মানসিক উপযোগিতাও বৃত্তি ও পেশা গ্রহণের বিবেচ্য শর্ত হওয়া উচিত। মেধা ও দক্ষতা খুব কম ক্ষেত্রেই সর্বাত্মক। এই সংস্থার অধিকর্ত্রী অন্তত চারশো পেশার ও বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শারীর-মানসিক গুণাবলীর মান নির্ধারণ করেছেন। ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে এই মান অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করলে বিফল হবার সম্ভাবনা অনেকখানি কমবে।

এই সর্বাত্মক সম্প্রসারণের যুগে আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা সমাজবিজ্ঞানীদের মনে আসছে—যা কৈশোরে শিক্ষাদানের সংগে অন্তত পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। হিরোশিমা নাগাসাকি ধ্বংসের পর প্রজন্মদের ওপর তেজস্ক্রিয়াজনিত প্রভাব লক্ষ করে তাঁদের অনেকেই প্রজাতির অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনায় আতংকিত। পারমাণবিক যুদ্ধের ভীষণতা ও সর্বনাশা পরিণাম সম্পর্কিত জ্ঞান কিশোরদের পাঠক্রমে সংযোজিত হলে তাদের মধ্যে সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের জন্য আগ্রহ জাগতে পারে। উত্তরপুরুষদের মধ্যে প্রজাতি-সংরক্ষণ প্রবৃত্তি আরো সক্রিয় ও শক্তিশালী না হলে মানব প্রজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভবিষ্যতে নবজাতকের মস্তিষ্কের-ওজন ও ভাঁজগুলো বৃদ্ধি পাবে কিনা জানা নেই, কিন্তু পৃথিবীর নতুন কর্মযজ্ঞের ভাবী ঋত্বিক ও যজমান জন্মকালেই আগের তুলনায় গড়পরতা ৬ সেঃ মিঃ (৫০-৫৬) বেশি লম্বা হচ্ছে; এবং পরিণত বয়সের উচ্চতাও প্রায় গড়পড়তা ২১ সেঃ মিঃ বাড়ছে।

সব দেশের কথা জানা নেই ; এটা সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের পরিসংখ্যান লব্ধ তথ্য। কৈশোরেই এই উচ্চতা বাড়ে এবং তখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে ত্বরণজনিত কিছু উপসর্গ (মাথা ধরা, বুক ধড়পড় করা, দুর্বলতা, ইত্যাদি) দেখা দিয়ে থাকে ; এগুলিকে রোগলক্ষণ মনে করে চিকিৎসকরা যেন এই সময় বিশ্রামের নির্দেশ না দিয়ে বরং আরো বেশি শ্রম করার উপদেশ দেন—এই কথা জানিয়েছেন উপরে উক্ত অধিকর্ত্রী। তাহলেই তার পেশী ও আন্তর যন্ত্রগুলো বয়স ও বৃদ্ধির অনুপাতে ঠিকমত সতেজ ও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

কয়েকটি বিশেষ সহায়ক পুস্তক :

(1) Speransky, A. D. A Basis for the Theory of Medicine (New York International Publisher, 1943.

(2) Bykov, K. M., Development of the Ideas of I. R. Pavlov., Moscow, 1951.

(3) Ivanov Smolensky, A. G. Pathophysiology of Higher Nervous Activity, Moscow 1954.

(4) Engels, Frederick, Socialism, Utopian and Scientific,. New York, International Publisher, 1935.

(5) Castro. J. des, The Geography of Hunger, Boston, 1952.

(6) Briffault. : The Mothers (New York, Macmillan. 1927)

(7) Deutsch Helene, Psychology of Women, New York, 1946.

(8) Horney Karen, New Ways in Psychoanalysis, New York, 1939.

কৈশোর সমস্যা নিয়ে কিছু তথ্যমূলক লেখা সাময়িক পত্রিকাতে বেরিয়েছে, কিন্তু এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোনো বই বোধহয় বাংলা ভাষায় এখনও প্রকাশিত হয় নি। কৈশোর সম্পর্কে প্রখ্যাত মনোবিদদের গবেষণাপ্রসূত অভিমত বিশেষ করে সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন ও প্রতিবিধানের নির্দেশ, সামাজিক পরিবেশ ও কিশোরমনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহজভাবে বইটিতে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে লেখক মনোরোগ চিকিৎসক হিসেবে সমস্যা সমাধানে কিছু কিশোর কিশোরীদের সহায়তা করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ তথ্য বইটিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছে কিনা পাঠকরা সেটা বিচার করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের সহায়ক পুস্তকে সাধারণের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বর্ধনের চেষ্টা করেছেন লেখক। মনে হয় তাঁর চেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে। 'বংশগতি', 'পরিবেশ' ইত্যাদি দুতিনটি অধ্যায়ে লেখক তাঁর অপর এক পুস্তক 'পাভলভ পরিচিতি হ'তে সাহায্য নিয়েছেন।

ষোল টাকা